ষান্মাসিক পত্রিকা

অবসর জীবন

জানুয়ারি-জুন ২০১৮

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

বাড়ি নং- ৭৫/এ, রোড নং- ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

অবসর জীবন

ষান্মাসিক পত্রিকা
৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারি-জুন, ২০১৮

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	- সভাপতি
এ কে এম শফিকুল ইসলাম	- সদস্য
এম এ লতিফ	- সদস্য
প্রফেসর অরুণ প্রকাশ সিকদার	- সদস্য
ড. মোহাম্মদ আলী খান	- সদস্য

সম্পাদক

মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর

প্রকাশক

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
"অবসর ভবন"
বাড়ী নং ৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
এর পক্ষে মহাসচিব কর্তৃক প্রকাশিত

সর্বসত্ব সংরক্ষিত

দূরালাপনী : ৯১১-৪৮৫৮, ৯১১-৯২০৮
E-mail : brgewa@gmail.com
website : www.brgewa.com

প্রচ্ছদ ভাবনা

মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর

মুদ্রণ ও ডিজাইন

দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭১৪-৩৮৮৫৪৩
E-mail : goodluckprint@yahoo.com

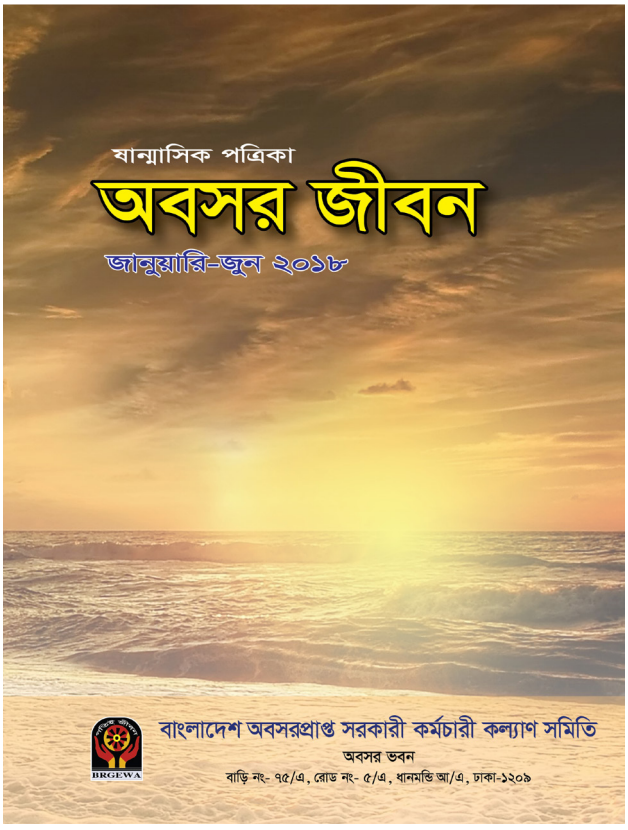

অবসর জীবন

ষান্মাসিক পত্রিকা

৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

জানুয়ারি-জুন, ২০১৮

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

(২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসবই তোমরা জান।

সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২১-২২

জানুয়ারী-জুন, ২০১৮ সময়ে প্রাপ্ত পরলোকগত সদস্যদের তালিকা

ক্রমিক নং	পরলোকগত সদস্যদের নাম	জেলার নাম	সদস্য নং	পরলোকগমনের তারিখ
১.	জনাব জয়নাল আবেদীন	কেন্দ্রীয় সমিতি	আ-১৩২৮	১২/০৪/২০১৮
২.	জনাব এ টি এম গিয়াস উদ্দীন	”	আ-১৬৪৮	২০/০৪/২০১৮
৩.	আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান সিকদার	নড়াইল	-	১/০৩/২০১৮
৪.	আলহাজ্ব মোঃ আতিউর রহমান	”	সহ সভাপতি	২/৫/২০১৮
৫.	ডাঃ নাসির উদ্দিন	ময়মনসিংহ	আ-২৮২	০৭/০১/২০১৭
৬.	জনাব কল্যাণ কুমার ঘোষ	”	আ-৪৪৪	২২/০৩/২০৭
৭.	জনাব সামার আলী	”	আ-৪৭৫	২৫/০৩/২০১৭
৮.	জনাব গোলাম রফিক	”	আ-৩১১	২০/০৬/২০১৭
৯.	জনাব শাহ রফিকুল হক	”	আ-২৪	২৫/০৬/২০১৭
১০.	জনাব আব্দুর রহমান	”	সা-২৪১৩	১৫/০৮/২০১৭
১১.	জনাব আব্দুল মাজেদ	”	আ-৪৪৯	৩০/০৮/২০১৭
১২.	জনাব ইসমাইল হোসেন	”	সা-২৩৬৫	৩০/০৬/২০১৭
১৩.	জনাব আলমগীর হাসান	”	আ-১০৩	২৮/০৯/২০১৭
১৪.	জনাব আব্দুল আজীজ	”	সা-১৩৫০	৩০/০৯/২০১৭
১৫.	জনাব মুন্সী আব্দুস সাত্তার	ফরিদপুর	সাবেক সাধারণ সম্পাদক	০৭/০২/২০১৮
১৬.	জনাব আব্দুল হাই হাওলাদার	শরীয়তপুর	সহ-সভাপতি	১৫/১২/২০১৭
১৭.	জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন	সিলেট	৩২৪	১৬/০৩/২০১৮
১৮.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম	নোয়াখালী	আ-৬	২৪/০৪/২০১৮
১৯.	জনাব মোঃ আলী আকবর	নোয়াখালী	আ-১১৮	১৩/০৪/২০১৮
২০.	জনাব আজিজ খান	লালমনিরহাট	৩১	১০/০৪/২০০৪
২১.	জনাব তোজাম্মেলহক	”	৩২	১৯/১১/২০০৪
২২.	জনাব নরেন্দ্র নাথ বর্মন	”	২০	১১/১০/২০০৬

জানুয়ারী-জুন, ২০১৮ সময়ে প্রাপ্ত পরলোকগত সদস্যদের নাম

ক্রমিক নং	পরলোকগত সদস্যদের নাম	জেলার নাম	সদস্য নং	পরলোকগমনের তারিখ
২৩.	জনাব আহসানুল্লাহ	লালমনিরহাট	১২৯	০৩/০৮/২০০৭
২৪.	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন	লালমনির হাট	৭	১৩/০৯/২০০৭
২৫.	মোসাঃ মেহের জান	”	১০	৯/০৭/২০০৮
২৬.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	”	৮২	২৮/০৩/২০০৯
২৭.	জনাব আব্দুল মান্নান	”	১২৯	১৭/০৮/২০০৯
২৮.	জনাব নীল কান্ত বর্মন	”	৪	১৫/১২/২০১০
২৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	”	৮	১৯/০২/২০১১
৩০.	জনাব খন্দকার আবুল কাসেম	”	১২	২৭/০৮/২০১১
৩১.	জনাব সাইদুর রহমান	”	৯	১৩/০৯/২০১২
৩২.	জনাব নুরুন্নবী খোকন	”	৩	২৯/০১/২০১৪
৩৩.	জনাব মোঃ নবিয়ার রহমান	”	১১৯	১৯/০৩/২০১৬
৩৪.	জনাব অরুন চন্দ্র রায়	”	৩১৫	২০/০১/২০১৭
৩৫.	জনাব আলিম উদ্দিন	”	৩৫৫	১৯/০২/২০১৮
৩৬.	জনাব মছদ্দর আলী	সুনামগঞ্জ	৩৫৩	০৪/০২/২০১৮
৩৭.	জনাব আবুল হাসেম	কক্সবাজার	৭৫	০২/০১/২০১৮
৩৮.	জনাব সত্যব্রত চৌং	কক্সবাজার	৩৭	০৫/০১/২০১৮
৩৯.	জনাব মুহাম্মদ তাহের কুতুলী	”	০৫	১৪/০১/২০১৮
৪০.	জনাব কবির আহমদ	”	৭০	০৩/০২/২০১৮
৪১.	জনাব সাজেদা বেগম	”	১৮৮	০৩/০২/২০১৮
৪২.	জনাব মোঃ মহব্বত আলী মল্লিক	পিরোজপুর	--	২২/০২/২০১৮
৪৩.	জনাব মোঃ সোহরাব আলী	সিরাজগঞ্জ	১৮	১৭/১২/২০১৭

সভাপতির বাণী

'অবসর জীবন' সমিতির নিয়মিত ষান্মাসিক পত্রিকা। ছয়মাস পর পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় এবং জেলা সমিতির সদস্যগণ তাদের জীবনের অনেক দুর্লভ ঘটনা লেখার মাধ্যমে এ পত্রিকায় তুলে ধরেন। কোন কোন লেখা এত তথ্যবহুল থাকে যে তা আমাদের অনেকের বাকী জীবনকে প্রভাবিত করে এবং আনন্দ দেয়। কিছু লেখা থাকে গবেষণামূলক। হাদিসে আছে 'জ্ঞান সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র' (The ink of the scholar is holier than the blood of the martyr)। সুতরাং লেখালেখির মাধ্যমে যারা জ্ঞানের সাধনা করে যাচ্ছেন আমি সমিতির সে সকল সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমাদের বর্তমান কমিটি নির্বাচিত হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০১৮। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি ২৫ মার্চ, ২০১৮। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা সদস্যদের সুবিধার্থে HBAIC এবং PSA এর মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার (annual check up) অন্তর্ভুক্ত করেছি। সদস্যদের স্ত্রী/স্বামীগণও বৎসরে একবার এ সুবিধা পাবেন। তাছাড়া ফিজিকেল মেডিসিন ও নাক-কান-গলার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ফি নেয়া হতো তা রহিত করা হয়েছে। আগামীতে আমাদের মেয়াদকালে আমরা সদস্যদের জন্য নতুন কিছু করতে আশা রাখি। ইতোমধ্যে X-Ray unit স্থাপনের জন্য আর্থিক/অন্যান্য সংশ্লেষসহ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের রির্পোট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নেফ্রোলজি বিভাগ খোলার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি website খোলারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

'অবসর জীবন' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সংখ্যা। প্রকাশনা উপ-কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি দক্ষ সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে পত্রিকাটির সম্পাদনাসহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি পত্রিকার সফল প্রকাশনা কামনা করি।

আব্দুল্লাহ্ হারুন পাশা
সভাপতি

প্রবীণরা সমাজের বোঝা নহে,
পরিবার, সমাজ ও জাতির বাতিঘর।

সম্পাদকীয়

২০১৮ সালের ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত সমিতির নির্বাচনে কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৮-২০১৯ মেয়াদের নতুন নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। "অবসর জীবন" পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি নতুন কমিটির প্রথম সংখ্যা। 'অবসর জীবন' পত্রিকা ছাপানারে জন্য প্রতি বছরই নতুন প্রিন্টার্স নিয়োগ করতে হয়। নতুন প্রিন্টার্স নিয়োগ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা বের করতে সঙ্গত কারনেই দেরী হয়ে গেল। এজন্য আমরা দুঃখিত।

অবসর জীবন পত্রিকা ছাপানারে জন্য আমরা যে সমস্ত লেখা পাই সেগুলো বাছাই করতে বেশ সময় লেগে যায়। যারা হাতে লিখে পাঠান তাদের অনেকের লেখা এত দুর্বোধ্য যা পড়তে আমাদের হিমসিম খেতে হয়। অনেক লেখক তাদের ঠিকানা, অবসর পূর্ব পদবী, সদস্য নম্বর এবং ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্যসমূহ উল্লেখ না করায় তাদের সাথে যোগাযোগও করা যায় না। তাছাড়া সব লেখা সময়মত পাওয়া যায় না। অনেক লেখার উপর নতুন করে কলম চালাতে হয়। প্রেস থেকে যে প্রিন্ট আসে তাতেও থাকে অনেক ভুল। এইসব ঠিকঠাক করতে স্বাভাবিকভাবেই অনকে সময় লেগে যায়। পরিশ্রমও করতে হয় প্রচুর। তারপরও পত্রিকাটি যথাসম্ভব সুন্দর করে তুলে ধরতে আমাদের চেষ্টার কোন অবহেলা থাকে না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে সদস্যদের অনেকেই মান সম্পন্ন ও তথ্যবহুল লেখা পাঠান। তাদের ধন্যবাদ।

জেলা সমিতিসমূহ থেকে যে সব ছবি পাঠানো হয় তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন্ অনুষ্ঠানের ছবি তা লেখা না থাকায় ছবির নীচে বর্ণনা দিতে খুবই বেগ পেতে হয়। সংশ্লিষ্ট সবাই ভবিষতে এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন, আশা করি।

পত্রিকা ছাপার কাজে সম্পাদনা পরিষদ যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন । প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্যগণ দিয়েছেন পরামর্শ ও উৎসাহ। তাঁদের জন্য রইল অজস্র ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলে বাধিত হবো। এ পত্রিকাটি পাঠকদের সামান্য আনন্দ দিতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর
মহাসচিব ও সম্পাদক

অবসর জীবন অলস জীবন নয়,
বরং স্বাধীন জীবনের দ্বার খুলে দেয়।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

বাড়ি নং ৭৫/এ,সড়ক নং-৫/এ,ধানমন্ডি আ/এ,ঢাকা-১২০৯।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ছবি	পদবী
১.	**জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা** আ- ১১৬৫ ''ন্যাম ভিলা'' এ্যাপার্টমেন্ট # ৩-এ১ বাড়ি # ১/২, রোড # ৬ গুলশান # ১, ঢাকা-১২১২। ফোন # ৯৮৮০৫১৪/০১৭১১৫৪৭১৮১		সভাপতি
২.	**জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান** আ-২৬২৪ ফ্ল্যাট নং এন -১৩, এন এইচ এ টাওয়ার (১৬-১৭) লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৭১৩৩৬৩৬৭০		সহ-সভাপতি
৩.	**জনাব ইকরাম আহমেদ** আ-২২৪৬ ফ্ল্যাট নং এ/৪, বাসা ২৪/এ রোড-০৩, ধানমন্ডি আ/এ, নিউমার্কেট ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। ফোন- ০১৫৫২-৩৯৭৬৯৬		সহ-সভাপতি
৪.	**জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর** আ- ১১২৮ এপার্টমেন্ট সান গ্লোরিয়া এ/১, বাড়ী-১১/এ, (নতুন) রোড নং- ১৩ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৭। ফোন- ৯১৪৪০৭৯/০১৭১০৮২৬৩৪২		মহাসচিব
৫.	**জনাব এ,কে, শামসুল হক** আ-১৩২০ 'হক ভিলা' বাড়ী নং ২১,রোড নং- ২ লতিফ রিয়েল এস্টেট, কাটাসুর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা ১২০৭ ফোন নং ৫৮১৫৬১১০ (বাসা)/ ০১৬৭১১৩৬৬২৫		কোষাধ্যক্ষ

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)			
ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ছবি	পদবী
৬.	**জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান** আ-১৯৩৮ এন এইচ বি- ১, ফ্ল্যাট নং এ/৪ লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট আসাদগেট নিউ কলোনী, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৯১৮২৩৪১১৮/৮১৪১৩৬১		যুগ্ম মহাসচিব
৭.	**জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক)** আ-১৯৪৬ বাড়ি নং ৬, ফ্লাট ৪/এ, ৪র্থ তলা রোড ৩/৩, চাঁদ হাউজিং মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৭১৫০৭৮৯১১		যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ
৮.	**জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ** আ-১৮৫১ ২২/১৩-এ, ব্লক -বি, খিলজী রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৮১৪৩৩৭০/০১৭১২১২০৯৪৭		সহকারী মহাসচিব
৯.	**জনাব এম মিজানুর রহমান** আ-৯৪০ ফ্ল্যাট নং বি/৫, বাড়ী নং ৪৯/১, রোড নং ১২/এ, ধানমন্ডি আ/এ ঢাকা। ফোন ঃ ৫৮১৫৩১৯৬/০১৮১৯৪৩৬৯২১		সদস্য
১০.	**জনাব মোঃ আমান উল্লাহ** আ-১৯৬৮ ''সাগরিকা'' -৫, ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার, রমনা, ঢাকা। ফোন ঃ ০১৭১১৩১৬৮১৮		সদস্য

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)			
ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ছবি	পদবী
১১.	**জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন** আ - ১২১০ এ্যাপার্টমেন্ট - এ/৩, র‍্যাংগস তরুনিমা বাড়ী নং ১৯/২, রোড নং- ১৫ (নতুন) ২৮ (পুরাতন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯। ফোন ঃ ৯১২৯৪৬৫/০১৭৩২৬১১৫৯৪		সদস্য
১২.	**জনাব মোঃ আব্দুল হাই** আ - ১২৯৯ ফ্ল্যাট নং- ২/৪০৪, ইষ্টার্ণ রোকেয়া টাওয়ার ৯৮, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোনঃ ৮৩৫৫৯৮২/০১৮১৯৮১০৮৭৭		সদস্য
১৩.	**জনাব ফেরদৌস পারভীন** আ- ১৬২৮ ফ্ল্যাট নং ৫,এস/ই পার্ল, বাড়ী নং ১৬ রোড, ১০, গুলশান, ঢাকা । ফোন-৮৮৫৩৪৯৩/০১৫৫২৩৩৫২৪২		সদস্য
১৪.	**জনাব ম. হামিদ** আ-২৫৫৬ ১২১/৩, নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ০১৭১১৬৬৩২৩৩		সদস্য
১৫.	**জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন** আ-১৬৭২ ফ্লাট নং সি-২, বাড়ি নং ৩৫/এ সড়ক নং ১৬ (পুরাতন ২৭) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ফোন ঃ ০১৯৫২৭৯৭৮২৮		সদস্য

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)			
ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ছবি	পদবী
১৬.	**জনাব সামসাদ বেগম** আ-২৬৩৪ নগর কৃষ্ণচূড়া, ফ্ল্যাট -এ-৫ ৭৬, বশিরউদ্দীন রোড কলাবাগান, ঢাকা। ফোন ঃ ০১৯৫৭৪৭৯৮১৮		সদস্য
১৭.	**জনাব মোঃ ফজলুল হক** আ-১৭৬২ ২৩/১০, খিলজী রোড, ফ্ল্যাট এ-৩ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৭২০৬৩৪৬৬৬		সদস্য
১৮.	**ড. দীপক কান্তি চৌধুরী** আ-১০৫৭ বাড়ী ১১৯ এপার্টমেন্ট নং ৫/এ, টিউলিপ এপার্টমেন্টস মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। ফোন- ৮১৫১১৫০ , মোবাইল: ০১৯১১৩৪১৩৫৭		সদস্য
১৯.	**জনাব সুলতানা মুজাদ্দিদা** আ-১৭৮৯ ২৯৪, পুলপার, জাফরাবাদ, শংকর মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ৮১৫৯০৬৯/০১৭১১৪৬৫৯৪৯		সদস্য
২০.	**জনাব মোঃ মাহে আলম** আ-১৩১৫ ''আরবান অলিভ'' বাড়ি নং ৪৬/১, রোড নং-৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৫৫১৬৬৬৪৭ (বাসা) ০১৮১৯২৭১৩৩৮		সদস্য

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)			
ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	ছবি	পদবী
২১.	**জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, আ-১৪৪৭** বাসা নং-২১, রোড নং ৫, ব্লক-খ পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লিঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১৩২৩৭১/৮১১৬৬৩২/০১৯১৩০৩০০৬৬		সহযোজিত সদস্য
২২.	**জনাব শেখ হাসিবুর রহমান, আ-১৪২৭** ফ্ল্যাট নং-বি-৬, সপ্তক হক হেরিটেজ ১৬৯/১, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬৭২১৫৫/ ০১৭২৭৮৪২৪২৯৬		সহযোজিত সদস্য

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

বিভাগীয় প্রতিনিধিগণের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	ছবি
১.	ঢাকা-১	**জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার শেখ** সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি গাজীপুর জেলা শাখা এফ-১৪৮, উত্তর ছায়াবীথি, জয়দেবপুর, গাজীপুর। ফোন ঃ ০১৭১১২২২১৫৯	
২.	ঢাকা-২	**অধ্যাপক মোঃ ফজলুল হক** চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, মানিকগঞ্জ জেলা শাখা ১২৩, বেউথা রোড (ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন) পোঃ ও জেলা ঃ মানিকগঞ্জ। ফোন ঃ ০১৭৪৭২২০০৬১	
৩.	ময়মনসিংহ	**আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রাজ্জাক** চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, জামালপুর জেলা শাখা কালেক্টরেট ক্যাম্পাস (ডিসি অফিস), পোঃ ও জেলা - জামালপুর। ফোন ঃ ০১৯১১-০৬২৩২২	
৪.	চট্টগ্রাম-১	**জনাব আরফান আলী** সাবেক সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা কাঁঠালতলী সড়ক, রাংগামাটি-৪৫০০ রাংগামাটি পাবর্তজেলা। ফোন/মোবাইল-০৩৫১-৬১৭৩৩/০১৯৩১০৬৯৮৬৬	

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

বিভাগীয় প্রতিনিধিগণের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	ছবি
৫.	চট্টগ্রাম-২	**অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মুহাম্মদ রফিকউল্লাহ** চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, নোয়াখালী জেলা শাখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, প্রশাসনিক ভবন নং -২ (নীচ তলা পশ্চিম) জেলা ঃ নোয়াখালী-৩৮০০। ফোন ঃ ০১৭১৫৬৯২৮৫৩	
৬.	খুলনা	**খন্দকার মিজানুর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা)** সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঝিনাইদহ জেলা শাখা ''খন্দকার ম্যানর্শন'' ৫, কবি সুকান্ত সড়ক, বাসা নং ৪৫ পোঃ ও জেলা ঃ ঝিনাইদহ ফোন ঃ ০১৯৬১১৩৮৮৮৬/০১৭১২৮৬২২৫১	
৭.	রাজশাহী	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলী** (হিসাব রক্ষণ অফিসার অবঃ, মাউশি, রাজশাহী) সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, রাজশাহী জেলা শাখা ই-৬০১/উপল, হেমেত খা, জেলাঃ রাজশাহী ডাকঘর ঃ জিপিও-৬০০০ ফোন ঃ ০১৭২৫৪৩৫২৫২/৭৭৩২১৭	
৮.	বরিশাল	**জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন খান** সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, পিরোজপুর জেলা শাখা জেলা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যালয়, সদর রোড, পোঃ ও জেলা ঃ পিরোজপুর। ফোন ঃ ০১৭১৩৯৫২০২৯/০৪৬১৬২৮০০	

কার্যনির্বাহী কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

বিভাগীয় প্রতিনিধিগণের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	ছবি
৯.	সিলেট	**অধ্যাপক মোঃ আব্দুল্লাহ** সাবেক চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, হবিগঞ্জ জেলা শাখা ১৮, মাষ্টার কোয়ার্টার, হবিগঞ্জ পোঃ ও জেলা ঃ হবিগঞ্জ। ফোন ঃ ০১৭১১৯৮৫৩১৯	
১০.	রংপুর	**জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন** সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, রংপুর জেলা শাখা সাতগাড়া, ১৪ মিস্ত্রী পাড়া, পোঃ রংপুর-৫৪০০ উপজেলা ও জেলা ঃ রংপুর। ফোন ঃ ০১৭১৭১৫১৯৮২	

প্রকাশনা উপ-কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

ক্রমিক নং	নাম	ছবি	পদবী
১.	**জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর** এপার্টমেন্ট সান গ্লোরিয়া এ/১, বাড়ি - ১১/এ, (নতুন) রোড নং- ১৩ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৭। ৯১৪৪০৭৯/০১৭১০৮২৬৩৪২		চেয়ারম্যান
২.	**জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ** ২২/১৩-এ, ব্লক বি, খিলজী রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৮১৪৩৩৭০/০১৭১২১২০৯৪৭	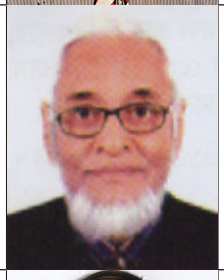	সদস্য
৩.	**জনাব ম. হামিদ,** ১২১/৩, নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ০১৭১১৬৬৩২৩৩	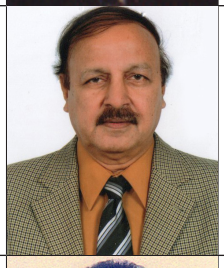	সদস্য
৪.	**জনাব এম,এ লতিফ** বাড়ি নং-৩৮ (৩য় তলা), রোড নং -৭, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি ব্লক -খ, আদাবর, ঢাকা -১২০৭। ফোন ঃ ০১৭১১১৬৬২৯৩।		সদস্য
৫.	**প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান** "স্কয়ার টাওয়ার", ফ্ল্যাট নং ৬/ডি ৩৬/৬, মিরপুর রোড (প্রিয়াঙ্গন মার্কেটের পাশের গলি) ঢাকা ১২০৫। ফোন নং ৯৬৩৪৩১৭/০১৮১৯২৬০৬০০		সদস্য

প্রকাশনা উপ-কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

ক্রমিক নং	নাম	ছবি	পদবী
৬.	**জনাব এ,কে,এম,শফিকুল ইসলাম** ৩ নং পিসিকালচার রোড শেকের টেক, ২৪/১, প্রমিনেন্ট হাউজিং আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা - ১২০৭। ফোন/মোবাইল- ০১৯১৪৭৩০২২০/৫৮১৫৫১১০		সদস্য
৭.	**প্রফেসর মোহা আবদুল মজিদ** ফ্ল্যাট নং এ/৩, (চারতলা) ৭৬, পশ্চিম ধানমন্ডি, শংকর ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৭১৬১৫৯০৬০/০১৯১১৫৩৭৫৩৫		সদস্য
৮.	**প্রফেসর অরুণ প্রকাশ শিকদার,** ২৬ মিতালী রোড, অপটিমিজম (ই/৩) জিগাতলা, ঢাকা -১২০৯। ফোন ঃ ০১৬৭৬৯৯৭৬৪৭/০১৫৫২৩০০২৮০		সদস্য
৯.	**গাজী মিজানুর রহমান,** ফ্ল্যাট নং জি/৩, এন এইচ এ টাওয়ার ১৬-১৭, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট লালমাটিয়া, ঢাকা। ফোন ঃ ০১৫৫০১৫০৬০৬		সদস্য
১০.	**কাজী আব্দুল কাদের** ৯/৫, রিং রোড, ফ্ল্যাট - অনুপম- এ-২ শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১১৯৯০৫৮৭৩৬/০১৭৪৫২৪১৭৭৫		সদস্য

প্রকাশনা উপ-কমিটি (২০১৮ ও ২০১৯)

ক্রমিক নং	নাম	ছবি	পদবী
১১.	**জনাব মোঃ আবুল হাসেম** বাড়ি নং ৭১২/২১, রোড নং ১০ আদাবর, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ০১৭১৫৩৩০৫৭৭		সদস্য
১২.	**ড. মোহাম্মদ আলী খান** কামিনী-৩ (১২ তলা ভবন) আজিমপুর সরকারী কলোনী ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ০১৭৪৩৮৪১৪৮৩		সদস্য
১৩.	**জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, আ-১৬১৯** ফ্ল্যাট সি/২, র‍্যাংগস ওমর টাওয়ার, ১০৮, কাজী অফিসের গলি, বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭। মোবাইল ঃ ০১৯১৪-৭৩৯ ৯৬২		সদস্য

মহাসচিবের ষান্মাষিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি - জুন, ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

১। ১৯ মার্চ, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির নির্বাচনে ২০১৮-২০১৯ মেয়াদের নুতন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। আমাদেরকে নুতন করে নির্বাচিত করার জন্য আপনাদের কাছে আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।

২। বিগত ছয় মাসে (জানুয়ারী-জুন, ২০১৮) সমিতির কার্যাবলীর বিবরণ উপস্থাপনের পূর্বে কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখাসমূহের যে সকল সদস্য আলোচ্য সময়ে আমাদের ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনায় মহান আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করছি এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩। আলোচ্য সময়ে সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ও জনাব ইকরাম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ এ. কে. শামসুল হক এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া সমিতির পরিচালকদ্বয়, অফিসের সহকর্মী ও চিকিৎসকবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মচারীগণ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে অজস্র ধন্যবাদ।

৪। আমি এখন সমিতির জানুয়ারি-জুন, ২০১৮ সময়ের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি ঃ-

(১) কেন্দ্রীয় সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে। কার্যনির্বাহী কমিটির কাজের সুবিধার জন্য ১৩ টি উপ-কমিটি রয়েছে। এছাড়া পিপিআর (PPR) অনুযায়ী ২টি আইনানুগ (Statutory) কমিটি রয়েছে। আলোচ্য সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটির ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নবাগত ও বিদায়ী নির্বাহী কমিটির ১টি সৌজন্যমুলক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপ-কমিটির সভা হয়েছে ২৩টি।

(২) চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ আলোচ্য ৬ মাসে বিদ্যমান চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) ১৯ মার্চ, ২০১৮ সালে নির্বাচনে নির্বাচিত নতুন নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা হয়েছে ০৮ এপ্রিল ২০১৮। ০৮ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে (২মাস ২২ দিন) নতুন উপ-কমটি গঠন করতেই সময় চলে গেছে। সুতরাং এ স্বল্প সময়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নুতন কিছু করা সম্ভব হয় নি। তবে ইতোমধ্যে সদস্যদের সুবিধার জন্য HBA1c (তিন মাসের ব্লাড সুগার এর গড় পরীক্ষা) এবং PSA (প্রোষ্টেট পরীক্ষা) এর মত গুরুত্বপূর্ণ টেষ্ট দু'টো বার্ষিক ফ্রি চেক আপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাক-কান-গলা ও ফিজিক্যাল মেডিসিন চিকিৎসকের ক্ষেত্রে যে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা **Consultation fee** ধার্য ছিল তা বাতিল করা হয়েছে।

(খ) একটি ঢ-জধু মেশিন বসানোর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রয়োজনীয় লোকবলের ক্ষেত্রে কি পরিমান খরচ হতে পারে তাঁর একটি সম্ভাব্য ধারনা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ফিজিওথেরাপি বিভাগের প্রধান ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামানকে আহবায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন পওয়ার পর এ ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(গ) ১০/২০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছোট হাসপাতাল সমিতির বর্তমান ভবনে চালু করার চিন্তা আছে। সে ব্যাপারেও সম্ভাব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঐ একই কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) চিকিৎসা বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম দন্ত, চক্ষু, হৃদরোগ, নাক-কান-গলা, ফিজিক্যাল মেডিসিন, জেনারেল মেডিসিন, গাইনী, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ডায়াবেটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যথারীতি চলছে। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক কালার ডপলার মেশিনের সাহায্যে ইকো-কার্ডিও গ্রাফী করা হয়। বার্ধক্যে প্রয়োজন

এমন প্রায় সব ধরনের টেষ্টই আমাদের প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরীতে যত্নের সাথে সম্পন্ন করা হয়।

(৩) এখন বিগত ৬ মাসের (জানুয়ারী - জুন, ২০১৮) প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ এবং উক্ত খাতে আয় সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক নং	চিকিৎসা বিবরনী	রোগীর সংখ্যা	আয়
১.	বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৯৮৭	ফ্রি
২.	সাধারন চিকিৎসা (মেডিসিন)	১,১১২	৩৩,৪৫০
৩.	গাইনী (মেডিসিন)	৭৫৩	১১,৯০০
৪.	হৃদরোগ চিকিৎসা (কার্ডিওলজি)	১,৩৭৯	১১,২০০
৫.	দন্ত চিকিৎসা	৭৮৩	২,৩৮,৪৫০
৬.	চক্ষু চিকিৎসা	৭১১	৪১,৮০০
৭.	ডায়াবেটিক চিকিৎসা	৫৮৭	৬.৯০০
৮.	ইসিজি	৭৫৪	২৫,০৫০
৯.	প্যাথলজি পরীক্ষা (ল্যাব)	৩২,১৮৮	১১,৬৬,৬১৫
১০.	ফিজিওথেরাপী	৮৫২	২,৪৪,১৫০
১১.	আল্ট্রাসনোগ্রাফী	৮৪	৯১,৯৪০
১২.	ফিজিক্যাল মেডিসিন	৪১৯	৬৫,৯৫০
১৩.	ই এন টি	৪০২	৩৬৬৫০
১৪.	ইকো কার্ডিওগ্রাম	৮৫	১,৩৪,৬২০
১৫.	হোমিও চিকিৎসা	১২১	১৩০০
	মোট =	৪১,২১৭	২১,০৯,৯৭৫

(৪) (ক) ২০১৮ সনে আলোচ্য সময়ে শিক্ষা বৃত্তি, দুঃস্থ সদস্যদের এককালীন অনুদান এবং কন্যার বিবাহ ও জরুরী চিকিৎসা খাতে নিম্নোক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জেলা সমূহে পাঠানো হয়েছে।

খাতসমূহ	জেলার সংখ্যা	উপকৃতের সংখ্যা	টাকার পরিমান
শিক্ষাবৃত্তি	৩	৩৬	১,৭৪,০০০.০০
এককালীন অনুদান	৩	১১৫	২,৪০,৭০০.০০
জরুরী চিকিৎসা ও কন্যার বিবাহ	৩	৫১	২,৪০,৭০০.০০

(খ) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিলম্বে পাওয়ার কারনে শিক্ষাবৃত্তি/জরুরী চিকিৎসা/কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত খাতের সকল আবেদন প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাই করা সম্ভব হয়নি। এগুলো যাচাই বাছাই করার কাজ চলছে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কল্যাণ উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে যথাসময়ে বিতরণ করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশী বিলম্ব করা হবে না।

(গ) ২০১৮ সনে আলোচ্য সময়ে জেলা শাখার অফিস খরচ, চিকিৎসকের সম্মানী, অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/মেরামত ও কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি খাতে নিম্নোক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জেলা সমূহে পাঠানো হয়েছে।

খাতসমূহ	জেলার সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমান
জেলা শাখার অফিস খরচ	৬৩	৪১,৬০,০০০.০০
জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী	-	১৩,৪৬,৪০০.০০
অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/ মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়	-	-
কম্পিউটার ক্রয় (প্রিন্টারসহ)	৪	১,৬০,০০০.০০
পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়	-	৩৫,০০০.০০
জেলা পর্যায়ের বিনোদন খাত	-	-
বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অফিস পরিচালনা খরচ	-	-

জেলা প্রতিনিধি ও বিভাগীয় প্রতিনিধিদের ঢাকায় আসা যাওয়ার খরচ ৩৩% বাড়ানো হয়েছে। কয়েকটি জেলায় Medical equipment হিসাবে পাঠানো হয়েছে First Aid Box ।

(৫) **শহীদ দিবস ঃ** ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে মহাসচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

(৬) **জেলা সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা ঃ** বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখ সকালে অবসর ভবনে জেলা শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের অসুবিধা সমূহ তুলে ধরেন।

(৭) এ বছর নির্বাচনের কারনে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখ অপরাহ্নে সমিতি ভবনে প্রার্থী পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮) ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখ সন্ধ্যায় একই জায়গায় সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সুরকার ও সমিতির সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমানের পরিচালনায় দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সকলের কাছে উপভোগ্য হয়।

(৯) **বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ** বিগত ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সকাল ৯.৩০ মিঃ অবসর ভবন প্রাঙ্গনে সমিতির ২০১৭ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু হয় এবং যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এ দিন অপরাহ্ন ৩.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়।

(১০) **শ্রেষ্ঠ লেখক ঃ** ২০১৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৭ সালের 'অবসর জীবন' পত্রিকার ২টি সংখ্যার প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন বিভাগে যারা শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো। লেখকগণের প্রত্যেককে একটি সনদ এবং তিন হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

জানুয়ারী -জুন ২০১৭ সংখ্যা ঃ

বিভাগ	লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম
(ক) প্রবন্ধ	মানব সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	প্রফেসর ড. আজফার আহমেদ
(খ) গল্প	মায়ের চিঠি	মুহাম্মদ সেরাজুল হক (মরহুম)
(গ) কবিতা	প্রার্থনা একটাই	অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন
(ঘ) ভ্রমণ কাহিনী	মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ	প্রফেসর যোগেন্দ্র কুমার মন্ডল
(ঙ) রম্য রচনা	দাঁত নিয়ে দন্তাদন্তি	মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
(চ) স্মৃতিচারণ	লেখা পাওয়া যায় নাই।	

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা ঃ

বিভাগ	লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম
(ক) প্রবন্ধ	বংলাদেশের ব্রাত্যজনের ভাগ্যোন্নয়নের প্রথম প্রয়াস	প্রফেসর ড. এম. এ. জলিল
(খ) গল্প	মাতৃত্ব	মীর আব্দুল আউয়াল
(গ) কবিতা	চাঁদের দু'চোখ দিয়ে	আ.শ.ম বাবর আলী
(ঘ) ভ্রমণ কাহিনী	কোয়ামবাটুর-উটি-তামিলনাড়ু	আব্দুল কাদির মাহমুদ
(ঙ) স্মৃতিকথা	কুঞ্জ কবিরাজ	এস. এম ইদরিস

(১১) <u>শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতি ঃ</u> ২০১৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৭ সালে যে সকল জেলা সমিতি শ্রেষ্ঠ হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতিকে একটি করে ক্রেষ্ট, একটি সনদপত্র এবং পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

বিভাগ	সমিতির নাম
ঢাকা -১	টাঙ্গাইল জেলা শাখা সমিতি
ঢাকা-২	মাদারীপুর জেলা শাখা সমিতি
চট্টগ্রাম -১	রাঙ্গামাটি জেলা শাখা সমিতি
চট্টগ্রাম-২	কুমিল্লা জেলা শাখা সমিতি
রাজশাহী	বগুড়া জেলা শাখা সমিতি
রংপুর	দিনাজপুর জেলা শাখা সমিতি

বিভাগ	সমিতির নাম
খুলনা	যশোর জেলা শাখা সমিতি বিশেষ বিবেচনায় মেহেরপুর জেলা শাখা সমিতি
বরিশাল	পটুয়াখালী জেলা শাখা সমিতি
সিলেট	সুনামগঞ্জ জেলা শাখা সমিতি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ জেলা শাখা সমিতি

(১২) **স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন ঃ** বিগত ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ সকাল ৭.০০ ঘটিকায় সমিতি ভবনে সদস্যদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ও ইকরাম আহমেদ, মহাসচিব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ জনাব এ কে শামসুল হক, যুগ্ম মহাসচিব জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

(১৩) **বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ ঃ** বিগত ১১ বৈশাখ ১৪২৫ (২৪ এপ্রিল ২০১৮) বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক ও বিনোদন উপ-কমিটির সভাপতি জনাব আজাদ রহমানের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য শিল্পীগণ অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

(১৪) **সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** ২০১৮ সালের জানুয়ারী - জুন পর্যন্ত সময়ে মোট ২৩৩ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন, তন্মধ্যে আজীবন ১৯৮ জন এবং সাধারণ ৩৫ জন। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

(১৫) **সমিতির লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয় ঃ** আলোচ্য সময় লাইব্রেরীর জন্য ৭৭ খানা বই ক্রয় করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৫,০০০/- টাকা।

(১৬) ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমরা সংসদের অর্থ বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদের দাবিসমূহ তাঁর কাছে তুলে ধরি। তিনি আমাদের দাবীসমূহ সরকারের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন।

উক্ত টিমে নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা	- সভাপতি
(২) জনাব ইকরাম আহমেদ	- সহ-সভাপতি
(৩) জনাব আবদুল কাইউম ঠাকুর	- মহাসচিব

(৪)	জনাব এ কে শামসুল হক	- কোষাধ্যক্ষ
(৫)	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	- যুগ্ম-মহাসচিব
(৬)	জনাব ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	- সহকারী মহাসচিব

(১৭) ২০১৮ সালের ২০ মে তারিখে আমরা সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার নেতৃত্বে একটি টিম মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করি। টিমের সদস্যরা হলেন ঃ

(১)	জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা	- সভাপতি
(২)	জনাব আব্দুল মান্নান	- সহ-সভাপতি
(৩)	জনাব ইকরাম আহমেদ	- সহ-সভাপতি
(৪)	জনাব আবদুল কাইউম ঠাকুর	- মহাসচিব
(৫)	জনাব এ কে শামসুল হক	- কোষাধ্যক্ষ
(৬)	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	- যুগ্ম-মহাসচিব
(৭)	জনাব ফজলে ইলাহী	- পরিচালক (প্রশাসন)
(৮)	জনাব এস এম কামরুজ্জামান	- পরিচালক (কার্যক্রম)

মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ কালে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ তাঁর কাছে তুলে ধরা হয় ঃ

(১) যারা পূর্বে অবসরে গিয়েছেন এবং যারা বর্তমানে পেনশনে যাচ্ছেন তাদের মধ্যকার পেনশন বৈষম্য দূর করা।

(২) যারা শতভাগ পেনশন সমর্পন করেছেন তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় পরে পুনরায় পেনশন দেয়ার ব্যাবস্থা করা।

(৩) বর্তমানে যে চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় তা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়ের তুলনায় বিশেষ করে প্রবীণ/জ্যেষ্ঠ পেনশনারদের জন্য খুবই অপ্রতুল। ডাক্তার ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি এবং ঔষধপত্রের সাম্প্রতিক উর্ধ্ব মূল্য বিবেচনা করে পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা নিম্নরূপ নির্ধারণের জন্য আমরা আবেদন জানাই ঃ

(ক) ৬৫ বছর বয়সী পেনশনারদের জন্য ন্যূনতম ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা

(খ) ৬৫-৭৫ বৎসর বয়সী পেনশনারদের জন্য অনূন্য ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা

(গ) ৭৫ বৎসর উর্ধ পেনশনারদের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।

মন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং আমাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি আমাদের দাবীসমূহ সহানুভূতির সাথে বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।

(১৮) ৩০ মে ২০১৮ তারিখে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বরাবরের মত এবারও সমিতিকে ১৩ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেননের কাছ থেকে উক্ত চেক গ্রহণ করেন। চেক গ্রহণকালে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলে ইলাহী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন।

(১৯) সভাপতি দেশের বাইরে থাকায় ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে মহাসচিবের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম অর্থ সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে সমিতির দাবী-দাওয়াসমূহ পূনর্ব্যক্ত করেন।

(২০) উত্তরার জমিতে একটি বাউন্ডারী -দেয়াল দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক সরেজমিনে জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার পরই দেয়াল নির্মানের কাজে হাত দেয়া হবে।

সম্মানিত সদস্য/সদস্যা

জানুয়ারী - জুন, ২০১৮ কার্যকালের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আপনাদের কাছে পেশ করা হলো। আমরা সমিতির সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সমিতির ক্রমাগত উন্নয়ন এবং সদস্যদের অধিকতর সেবাদান ও কল্যাণই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা যাতে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারি সেজন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

আমি আপনাদের সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। পরিবারের সকলকে নিয়ে আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। মহান আল্লাহ সকল কাজে আমাদের সহায় হোন।

আবদুল কাইউম ঠাকুর
মহাসচিব

অবসর জীবন

৩৬ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন, ২০১৮)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
	প্রবন্ধ		
০১	ডক্টর সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন:	জয়নাল হোসেন	৩৫
০২	বর্ষবরণ ইতিবৃত্ত	কৃষিবিদ এ.কে. এম এনামুল হক	৪১
০৩	যুদ্ধ শিশু হস্তান্তরে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত	গাজী মোছাঃ আমিনা বেগম	৪৪
০৪	ইতিহাসের আলোকে অমর-২১ ফেব্রুয়ারি	মুহাম্মদ আবুল বাতেন	৪৭
০৫	শহীদ তিতুমীর	রফিক আলম বিশ্বাস	৫২
০৬	শরীরের জন্য দইয়ের স্বাস্থ্য বান্ধব ভূমিকা :	মোঃ এ. কে. ফজলুল হক	৫৫
০৭	পাঠাভ্যাস	মোহাম্মদ আবদুল খালিক	৫৭
০৮	যার জন্মে আলোকিত বিশ্ব জাহান	এস, এম ইদরিস	৬০
০৯	অবসর জীবন এবাদতের শ্রেষ্ঠ সময়”	আলহাজ্ব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা	৬৩
১০	জীবনযুদ্ধ	মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ	৬৬
১১	স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষা	প্রফেসর মুহম্মদ মোকাররম হোসায়েন	৭১
১২	বার্ধক্যের বিড়ম্বনা	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	৭৮
১৩	মানবতার সেবায় ইসলাম	রওশন আরা কবির	৮০
১৪	বয়স্কদের নিয়ে কিছু ভাবনা	কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	৮৩
১৫	পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের স্মৃতিচারণ	ড. মোহাম্মদ আলী খান	৮৮
	গল্প		
০১	জীবন সায়াহ্নে সমুদ্র সৈকত	মোঃ সাজ্জাদ আলী	৯৩

নং	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
০২	মায়ার সংসার	মীর আব্দুল আউয়াল	৯৭
০৩	পিতার স্বপ্ন	মো: মুস্তাফিজুর রহমান	১০২
০৪	ছোবল	পরেশ কান্তি সাহা।	১০৬
০৫	অবসরে যাওয়া হলো না	মোঃ লুৎফর রহমান জোয়ার্দার	১১০
০৬	বুদ্ধিজীবী	প্রফেসর মোঃ নাসিম উদ্দিন প্রামাণিক	১১৪
০৭	অবসর জীবনের বিড়ম্বনা!	এম. শফীউল্লাহ	১২০
০৮	সেলিব্রিটির অটোগ্রাফ	প্রকৌশলী নাসিম আহমেদ	১২৪
	কবিতা		
০১	সঞ্চারিত সন্তান-বাৎসল্য	ডা: মোঃ ইমাম হোসেন	১২৯
০২	বিজয় দিবস	মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদার।	১৩০
০৩	বিকিকিনি	মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার	১৩১
০৪	ডুবুরী মন	মুহাম্মদ হারুন চৌধুরী	১৩২
০৫	দুটো সনেট	কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ।	১৩৫
০৬	বাংলাদেশের স্বাধীনতা	মোঃ সাইদূর রহমান	১৩৬
০৭	সময় গেলে সাধন হবে না	আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী	১৩৮
০৮	সক্রেটিসের জবানবন্দি	কাজী নাসিরুল ইসলাম	১৩৯
০৯	প্রবীণের বেদন	মকবুল হোসেন শওকত	১৪৩
১০	বন্ধন	কাজী নুসরাত সুলতানা	১৪৪
১১	নির্বাক প্রকৃতির সবাক ছন্দ	মোঃ বদিউজ্জামান ভূঁইয়া	১৪৬
১২	স্বাধীনতা-১৮	প্রফেসর অরুণ প্রকাশ শিকদার	১৪৭
১৩	বিশ্বজয়	এম এ লতিফ	১৪৯
১৪	অবসর এসে গেল	গাজী মিজান	১৫১
১৫	আনন্দ ভ্রমন	খন্দকার রাইছা আমজাদ (লিলি)	১৫২
১৬	বিড়ম্বনা	এ, কে, এম শফিকুল ইসলাম	১৫৪
১৭	মা	হাবীবুর রহমান আহমদ	১৫৫

নং	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১৮	স্বাধীনতা মোর	আ,ক,ম এরশাদুন নবী আনছারী	১৫৬
	স্মৃতিকথা		
০১	মসজিদে নববী (নবীর মসজিদ)	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ সামসুজ্জামান চৌধুরী	১৬১
০২	স্মৃতিও কাঁদায়	নিত্য গোলাপ বিশ্বাস	১৬৫
০৩	সুখের স্মৃতি অমলিন	নাজিবুল্লাহ সুজন	১৬৭
	ভ্রমণ কাহিনী		
০১	হিমালয়ের কন্যা "নেপাল"	অধ্যাপক মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক	১৭৭
০২	দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া	নির্মল কুমার বর্মণ	১৮১
০৩	সিঙ্গাপুরে এক চক্কর	প্রফেসর খোন্দকার ইনামুল কবীর	১৮৮
০৪	আমার দেখা আমেরিকা	ইঞ্জিনিয়ার বজলুর রহমান	১৯৫
০৫	ঘুরে এলাম দিল্লি শহর	মো: আনোয়ার হোসেন	২০০
	রম্য রচনা		
০১	হাসতে মানা	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম	২১১
	প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য		
০১	কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রমের ছবি		২১৫
০২	জেলা শাখা সমিতির কার্যক্রমের ছবি		২১৯
০৩	সরকার কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ		২২২
০৪	লেখার নীতিমালা		২২৯

প্রবন্ধ

যুগের ধর্ম নেই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে
পীড়া দিবে তোমাকেই।

ডক্টর সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন: স্বাধীনতা আন্দোলনে বহির্বিশ্বে ভারতের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

জয়নাল হোসেন
সদস্য নং-আ-২৮০৯
কেন্দ্রীয় সমিতি

ডক্টর সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন ছিলেন বর্তমান কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার থোল্লার প্রখ্যাত জমিদার মীর আশরাফ আলী খানের (১৭৫৫-১৮২৯) উত্তরপুরুষ। তিনি ছিলেন একাধারে জার্নালিস্ট, আইনবিদ, বাগ্মী, রাজনৈতিক, কুটনৈতিক ও লেখক। বহির্বিশ্বে একক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন। প্রচলিত অর্থে তিনি জননেতা ছিলেন না। সে কারণে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল কম। আর তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় স্বেচ্ছানির্বাসনে কেটেছে ভারতের বাহিরে। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর প্রভাব ছিল সমীহ করার মত। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া আলোচিত এ মনীষীকে বলা হত, আমেরিকায় ভারতের অধীকৃত রাষ্ট্রদূত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে বহির্বিশ্বে ভারতের কণ্ঠস্বর।

জন্ম: সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ খান বাহাদূর (১৮৫০-১৯১৬) ছিলেন প্রখ্যাত স্যার ও বাঙলার রেজিস্ট্রার জেনারেল। কুমিল্লার বরদাখাত পরগনার জমিদার (সদর দপ্তর বোলা) মীর আশরাফ আলী খানের পৌত্র সৈয়দ আসাদ উল্লাহ খান ছিলেন তাঁর পিতামহ আর মাতামহ ছিলেন বাঙলার শিক্ষা সংস্কারক ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদূর (১৮২৮-৯৩)। বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল, ড. শহীদুলাহ হল, কার্জন হল ও এশিয়াটিক সোসাইটিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের ঢাকার আবাসবাড়ি। বাঙলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম ঈসা খানের বংশধরদের ঢাকার এই আবাস বাড়িটির বৈবাহিক সূত্রে পরবর্তীকালে মালিক হয়েছিলেন মীর আশরাফ আলী খান (মীর আশরাফ আলী খান কার্জন হল প্রাঙ্গণেই ১৮২৯সালে সমাহিত হন)। সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনেরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও দু'বোন। ভাইয়েরা হলেন নবাবজাদা সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী মেহদী, সৈয়দ আলী হাসান, সৈয়দ আলী আহমদ ও ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন। আর বোন দু'জন হলেন, খুরশীদ তালাত বেগম, স্বামী শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ও সেহর বানু বেগম, স্বামী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মামা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য (১৯৩০-৩৪) স্যার ডা, হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৮৪-১৯৪৬)। স্যার ডা. হাসান সাহেরাওয়ার্দী ছিলেন ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মহসিনিয়া মাদ্রাসার (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা সুপারিনটেনডেন্ট মেদেনীপুরের কৃতিসন্তান বাহারুল উলুম উবায়দুল্লাহ আল উবায়দী সোহেরাওয়ার্দীর (১৮৩৪-১৮৮৫) ছেলে এবং "সেয়িংস অব মোহাম্মদ" পুস্তক খ্যাত আল্লামা স্যার ড. আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দীর (১৮৭৭-১৯৩৫) ছোট ভাই।

শিক্ষা ও কর্মজীবন: সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন কলকাতা ও আলীগড়ে লেখাপড়া করেন। তিনি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন গমন করেন এবং লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী লিঙ্কন'স ইন-এ যোগদান করেন। লন্ডনে অবস্থান কালে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও অনুষ্ঠানে বিতর্ক ও আলোচনা সভায় যোগদান করে লন্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের মাঝে বাগ্মী হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। লন্ডনের লিঙ্কন'স ইন থেকে লেখাপড়া শেষ করে ডক্টর সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন। তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে তখনকার দৈনিক বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার খুব নাম ডাক। সে পত্রিকার এডিটর ছিলেন ব্রিটিশ বংশভূত কিংবদন্তি জার্নালিস্ট ভারতবন্ধু হিসাবে খ্যাত বেনজামিন জি, হরনিম্যান(১৮৭৩-১৯৪৮)। বি.জি.হরনিম্যান কর্মজীবনের শুরুতে ইংল্যান্ডের সাউদার্ন ডেইলি মেল অব পোর্টসমাউথ পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের মর্নিং লিডার, দি এক্সপ্রেস, দি ডেইলি ক্রনিকল, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় কাজ করেছেন। ১৯০৬ সালে তিনি লন্ডন থেকে ভারতের রাজধানী শহর কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে স্টেটসম্যান পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। তিনি স্টেটসম্যানে নিউজ এডিটর ও সহকারী এডিটর হিসাবে কাজ করেন। কলকাতা থেকে তিনি চলে যান দিল্লী। তারপর দিল্লী থেকে চলে যান বোম্বে। তিনি বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার এডিটরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে পত্রিকায় সমোলাচনামূলক অনেক রিপার্টে প্রকাশ করেন। এ কারণে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। ভারতের অনেক বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আপত্তি উপেক্ষা করে সরকার কর্তৃক তাঁকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লন্ডনে। লন্ডনে গিয়েও তিনি অনুরূপভাবে ভারত সরকারের ন্যায়সঙ্গত সমোলাচনায় তাঁর লেখা অব্যাহত রাখেন। তিনি কয়েক বছর পরে লন্ডন থেকে আবার ভারতে ফিরে আসেন। Benjamin G. Horniman ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নিজেই ভারতে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হেরাল্ড ও সাপ্তাহিক হেরাল্ড পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বোম্বে ক্রনিকলে আবার যোগদান করেন। বোম্বে ক্রনিকল ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন সান্ধ্য পত্রিকা বোম্বে সেনটিনেল (The Bombay Sentinel, Eveninger)। ভারতীয় জার্নালিজমে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁকে বলা হয়ে থাকে ভারতীয় জার্নালিজমের মেন্টর (বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা)।

ডক্টর সাইয়ুদ হোসেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে The Daily Bombay Chronicle পত্রিকায় বি. জি. হরনিম্যানের অধীনে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ডক্টর হোসেন পত্রিকায় রাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর আগুনঝরা সম্পাদকীয় ও চমকপ্রদ সংবাদ শিরোনাম দেয়ার সুবাদে তিনি সারা ভারতে ব্যাপক পরিচিতি পান এবং বহির্বিশ্বেও অচিরেই খ্যাতি অর্জন করেন। মতিলাল নেহরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত The Daily Allahabad Independent পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে বোম্বে থেকে তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে চলে আসেন। দৈনিক এলাহাবাদ ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকাতেও বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার মত তাঁর খুরধার লেখনী অব্যাহত রাখেন। পত্রিকায় চমকপ্রদ হেডিং আর আগুনঝরা সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লেখার কারণে সারা ভারতের সংবাদপত্র জগতে ও রাজনৈতিক মহলে তাঁর নাম থাকতো সবার মুখে মুখে।

বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের সাথে প্রেম ও বিয়েঃ এলাহাবাদে গিয়ে দৈনিক এলোহাবাদ ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার এডিটর হিসাবে কাজ করার সুবাদে মতিলাল নেহেরুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বরূপকুমারী নেহেরুর (১৯০০-৯০) সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বরূপকুমারী নেহেরু ছিলেন কাশ্মীরী মেয়েদের মত অনিন্দ সুন্দরী (অবশ্য নেহেরু

পরিবার কাশ্মীর থেকেই দিল্লি এসেছিল)। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সুপুরুষ ডক্টর সাইয়ুদ হোসেন কে ভালবেসে স্বরূপকুমারী নেহেরু তাঁর পরিবারের সবার অমতে বিয়ে করে ফেলেন। নেহেরু পরিবার ছাড়াও ডক্টর সাইয়ুদ হোসেনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা গান্ধীও এ বিয়ে মেনে নেননি, এ বিয়ে নিয়ে সারা ভারতে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এ বিয়ে নিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে উত্তেজনা চরমে গিয়ে পৌছে। দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার উপক্রম হয়। তখন মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপে বিষয়টির উত্তেজনা প্রশমন হয়। নির্মল প্রেমের আলোচিত এ বিয়েটি অহিংসবাদী নেতা, হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত, মহাত্মা গান্ধী অবশেষে ভেঙ্গে দেয়ায় সম্মতি দেন। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইর ঘটকালীতে কংগ্রেসকর্মী গুজরাটের সন্তান ব্যারিস্টার রণজিৎ সীতারামর সাথে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে স্বরূপকুমারীর নেহেরুর আবার বিয়ে হয়। তখন স্বরূপকুমারী নেহেরুর পরিবর্তিত নাম হয় বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত (১৯০০-৯০)। ড. সাইয়ুদ হোসেন বাকী জীবনে আর বিয়ে করেননি। জানা যায় স্বরূপকুমারী নেহেরু তথা বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের গর্ভে ড. সাইয়ুদ হোসেনের একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। ড. সাইয়ুদ হোসেনের কন্যাটির কোন তথ্য পরে আর জানা যায়নি।

সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ: ড. সাইয়ুদ হোসেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দেই তিনি স্বরাজ পার্টির লন্ডন প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারী মনোনীত হন। ভারতের অন্যতম মুসলিম প্রবক্তা ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে লন্ডন গমন করেন। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের অফিসিয়াল মুখপাত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের তিন সদস্যের একজন হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি প্যারিস গমন করেন। ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন লন্ডনে থাকাকালেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আর্মস কনফারেন্সের সংবাদ কভার করার উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে আমেরিকায় গমন করেন। আর তখন থেকেই শুরু হয় ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন।

তিনি আমেরিকার প্রচার মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে প্রিয়পাত্র হিসাবে প্রতিপন্ন হন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তাঁকেই সে সময় পর্যন্ত আমেরিকায় ভ্রমণকারী সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রভাবশালী ভারতীয় অতিথি হিসাবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস সাময়িকী বর্ণনা করে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিদেশনীতি সমিতি মন্তব্য করে যে, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বের শত শত লোক এসে আমেরিকায় বিভিন্ন কনফারেন্সে বক্তৃতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভারতের ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের চেয়ে অধিকতর মেধাবী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না।

আমেরিকায় ব্রিটিশদের মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ ছিলেন ড, সাইয়ুদ হোসেন। ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন আর স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক ক্লাব, আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠান ও বক্তৃতায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে অংশগ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক শহরের টাউন হলে বক্তৃতায় তাঁকে সামলাতে ব্রিটিশরা হিমশিম খেতো। ইংরেজি ভাষার ওপর ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। ব্রিটিশদের শত বেড়াজাল সৃষ্টি সত্বেও ড. সাইয়ুদ হোসেনের প্রাঞ্জল, মোহনীয় ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শোনার জন্য শ্রোতারা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১৫ তারিখে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত Is British Rule in India a failure? বিতর্কে তুখাড়ে ব্রিটিশ বক্তা জর্জ ইয়ং (George

Young) উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ ড. সাইয়ুদ হোসেনের যুক্তির সামনে তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে। ড. সাইয়ুদ হোসেনের বাগ্মীতার ভয়ে আমেরিকান ব্রিটিশরা সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। ভারতীয় বাগ্মী ড. সাইয়ুদ হোসেনকে আমেরিকায় মোকাবেলার জন্য ব্রিটিশরা সব সময় তুখোড় বক্তার সন্ধান করেই বেড়াতে হত।

ড.সাইয়ুদ হোসেন বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের বিষয়ে ছিলেন প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী। তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন। দর্শনেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর নিখুঁত আচার ব্যবহার, বংশগত আভিজাত্যের ঐতিহ্য আর নিজের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা মানুষকে মোহিত করার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। আমেরিকার সুন্দরী মহলে ছিল তাঁর অপরিমেয় প্রভাব, প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা। জনৈক ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের আমেরিকান স্ত্রী কমলা ভি.নিম্বকার ছিলেন ড. সাইয়ুদ হোসেনের সেক্রেটারী। সেক্রেটারী মিসেস কমলা বলেন যে, আমেরিকার সুন্দরীদের মন্তব্য ছিল, যদি ড.সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের মত চমৎকার ব্যক্তির জন্ম ভারতে হয়ে থাকে, তাহলে সে দেশ কখনো পশ্চাদপদ হতে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ব্যারিস্টার আসফ আলী (১৮৮৮-১৯৫৩) ছিলেন লন্ডনের লিঙ্কন'স ইন-এ ড. সাইয়ুদ হোসেনের সহপাঠি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি উত্তর প্রদেশের দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীতে লেখাপড়া শেষে লন্ডন গমন করেন। বাংলাদেশের বরিশাল শহরের আমানতগঞ্জ এলাকার সন্তান উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কন্যা (হরিয়ানায় জন্ম) কংগ্রেস নেত্রী অরুণা গাঙ্গুলীকে (১৯০৮-৯৬) তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর উত্তর প্রদেশে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ছিল। তাঁর কনিষ্ট ভাই কৃষিবিদ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মীরা দেবীর স্বামী। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কন্যা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অরুণা গাঙ্গুলী ব্যারিস্টার আসফ আলীকে ভালবেসে পরিবারের অমতে বিয়ে করেন। অরুণা আসফ আলী ছিলেন দিল্লীর প্রথম নির্বাচিত মেয়র। স্বাধীনতার পর আসফ আলী আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের গভর্নর মনোনীত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। আসফ আলীর মৃত্যুর পর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে অশ্বিনীকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত Dr.Syud Hossain: A glimpse of his life, speeches and writings শিরোনামের পুস্তকে ড. হোসেন সম্পর্কে আসফ আলীর প্রবন্ধে বলা হয়েছিল,''He was handsome in appearance and even more handsome in his relationship with his friends and adversaries. His command over English was of outstanding distinction and his general love of literature, Persian and Urdu particularly, was of the nature of a deep passion."

ড. সাইয়ুদ হোসেন আমেরিকার সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের World Affairs বিষয়ে বিশেষ লেকচারার ছিলেন। তা ছাড়া তিনি নিউইয়র্কের The New Orient Magazine-এর এডিটর ছিলেন। তিনি দীর্ঘ চার বছর দক্ষতার সাথে বিখ্যাত ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত World Fellowship of Faiths সম্মেলনে তিনি অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি দেশ-বিদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাদর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রয়েছেন। তিনি H.G.Wells এর তিন ঘন্টার একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তাঁর অন্যতম হিতাকাংখী ও বন্ধু। গান্ধীর প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা। মহাত্মা গান্ধীর ওপর ড, সৈয়দ সাইয়ুদ হাসেন প্রণীত পুস্তক Gandhi:The

Saint as Statesman, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারত, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বইটির প্রচুর কপি বিক্রি হয়। বইটি জার্মান, হিন্দুস্থানী ও কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকঃ তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতি স্ট্যাডি করার জন্য বিশ্বের নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইতালি কর্তৃক জোরপূর্বক ইথিওপিয়াকে সংযুক্তির কারণে ইথিওপিয়ার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে সেখানে গমন করেন। তিনি মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকৃত দেশের মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্যালেস্টাইনের গ্র্যান্ড মুফতি এবং আরব নেতাদের অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ইসরাইলের তেল আবিব শহরের মেয়র তাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। সেখানে তাঁর সাথে অনেক ইহুদি নেতার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁদের সাথে তিনি মত বিনিময় করেন। কলকাতা ও রেঙ্গুনে তাঁর পাবলিক লেকচারগুলোতে যথাক্রমে বাঙলা ও বার্মার প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি স্টাডি করার উদ্দেশে তিনি দূরপ্রাচ্যে গমন করেন। তিনি চীনে গিয়ে ক্যান্টনে বোমাবর্ষণ পরিস্থিতি ও সাংহাইয়ের ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি প্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ ব্রিটিশ ন্যাভাল বেস পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে সিঙ্গাপুর গমন করেন।

ব্রিটিশ সরকার একবার তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্বল্প সময়ের জন্য লন্ডন হয়ে ভারতে আসা ছাড়া ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছরে আর ভারতে আসেননি। স্বেচ্ছানির্বাসন কালে সান্ধ্য দৈনিক বোম্বে সেন্টিনেল তাকে আমেরিকায় ভারতের অধীকৃত রাষ্ট্রদূত হিসাবে অভিহিত করে।

জওহরলাল নেহেরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের (১৯০০-৯০) স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যারিস্টার রণজিৎ সীতারাম (?-১৯৪৪) ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে কারাবরণ করেন। তিনি লক্ষ্মৌ জেলে আটক থাকা অবস্থায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। রণজিৎ সীতারাম পন্ডিতের মৃত্যুর পর আমেরিকার নানা স্থানে ড, সাইয়ুদ হোসেন ও বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতকে একসাথে ঘোরাফেরা করতে অনেকেই দেখেছেন বলে আমেরিকায় অবস্থানকারী অনেক ভারতীয় চিঠিতে মহাত্মা গান্ধীকে জানিয়েছেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী এম.ও মাথাই মারফত মহাত্মা গান্ধীর কাছেও অনুরূপ খবর আসে। ড. সাইয়ুদ হোসেন আমেরিকায় সর্বদা বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতকে অনুসরণ করে চলেছেন বলে ব্যাপক গুঞ্জন ছিলো।

সারা বিশ্বে ব্যাপক ভ্রমণ করে ও আমেরিকায় দেওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেকচারের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন অবসানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ড. সাইয়ুদ হোসেন আমেরিকানদের চোখ খুলে দিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতে হিন্দু মুসলিম মিলনের জন্য স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে ফিরে তাঁর দেশে এসে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ভারতে আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ড. সাইয়ুদ হোসেন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সে উদ্দেশে তাঁর অভিমত অবহিত করেন। জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) বিজয়লক্ষী পন্ডিতের স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে ড. হোসেনের বন্ধু ও সহপাঠি আসফ আলী (১৮৮৮-১৯৫৩) ও মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯১৯৪৮) সাথে পরামর্শ করেন।

ড. সাইয়ুদ হোসেন ভারতে ফিরে আসার পর আবারো কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার অবতারণা হতে পারে সন্দেহে মহাত্মা গান্ধী আপাততঃ ড, হেসেনের ভারতে ফেরার বিষয়ে অনীহা পোষণ করেন। তখন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমেরিকায় ড, সাইয়ুদ হোসেনের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেন, মহাত্মা গান্ধী মনে করেন ড. হোসেন আমেরিকায় অবস্থান করেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে

পারেন। প্রকৃতপক্ষে ড. হোসেনকে ভারতে সে সময়ে ফিরে আসতে না দেয়ার এটা ছিল মহাত্মা গান্ধীর একটি চাতুর্যপূর্ণ পরামর্শ।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ড, সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনকে ভারত সরকার মিশরে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়াগে করে আবার বিদেশে পাঠিয়ে দেন। সফলতার সাথে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন কালে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কায়রোর বিখ্যাত শেফার্ড হোটেলের নিজ কক্ষে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর বন্ধুদের ধারণা, তিনি নিঃস্বঙ্গ অবস্থায় ভগ্ন হৃদয়ের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬১ বছর। মিশর সরকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কায়রোতে তাকে সমাহিত করেন। ভারতবর্ষের বিস্মৃত মুসলিম মনীষী, বাঙলার কৃতীপুরুষ ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের নামে মিশর সরকার রাজধানী শহর কায়রোর একটি প্রধান সড়কের নামকরণ করে তাঁকে সম্মানিত করেন ও স্মরণীয় করে রাখেন।

ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের কনিষ্ট বোন সেহর বানু বেগম ও স্যার ডা. হাসান সোহরাওয়ার্দী দম্পতির কন্যা ডক্টর শাইস্তা সোহরাওয়াদীর (১৯১৫-২০০০) স্বামী ছিলেন ভূপালের সন্তান মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহ (১৯০৩-৬৩) আইসিএস। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠজন মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহ নিয়োজিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব। মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহর ছোট ভাই হলেন ভারতের প্রথম মুসলমান চিফ জাস্টিস (১৯৬৮-৭০), ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি(১৯৬৯) ও উপ-রাষ্ট্রপতি (১৯৭৯-৮৪) মোহাম্মদ হেদায়েতুলাহ (১৯০৫-৯২)। মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহ ও ড. শাইস্তা সোহরাওয়াদী ইকরামুল্লাহ দম্পতির চার সন্তান। তাঁরা হলেন ইনাম ইকরামুল্লাহ, সালমা সোবহান (রেহমান সোবহানের স্ত্রী সালমা রাশিদা আক্তার বানু ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম নারী ব্যারিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও আইন ও শালিস কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা), নাজ ইকরামুল্লাহ ও সারবাত ইকরামুল্লাহ (জর্ডানের প্রিন্স হাসান বিন তালাল তাঁর স্বামী)। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহর স্ত্রী ড. শাইস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ ছিলেন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতা এবং তাঁর কণিষ্ট মামা ড. সাইয়ুদ হোসেনের প্রেমিকা ও সাবেক স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত ছিলেন জাতিসংঘের একই অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতা। দু,দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক বিরাজমান না থাকলেও ডক্টর শাইস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামুল্লাহ ও বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত আগ্রহ সহকারে উভয়ে উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন। মামা ড. সৈয়দ সাইয়ুদ হোসেনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ে উভয়ের সাক্ষাতের সময় আবেগঘন পরিবেশের অবতারণার বিষয় প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল বলে জানা যায়।

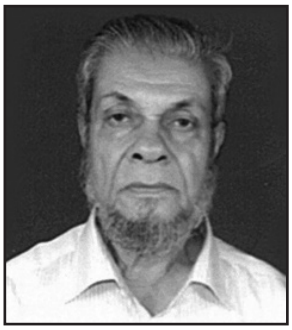

বর্ষবরণ ইতিবৃত্ত

কৃষিবিদ এ.কে. এম এনামুল হক
আ-১৫৭২
কেন্দ্রীয় সমিতি

পৃথিবীর দেশে দেশে সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে, সকল সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদযাপনের ধারা প্রচলিত আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে। উদযাপনের রীতি, প্রকৃতি ও পদ্ধতি প্রকরণর মধ্যে ভিন্নতা আছে, তবুও সর্বক্ষেত্রে একটি মৌলিক মিল চোখে পড়ে। তা হচ্ছে পুনরুজ্জীবনের ধারণা। পুরানো, জীর্ণ এক অস্থিত্বকে বিদায় বলে সতেজ, সজীব, নবীন এক নতুন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভুতি। নববর্ষে আমরা সদ্য সমাপ্ত বছরের বিদায় এবং আগত বছরের আবির্ভাবে মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। যে বছরটি আমাদের জীবনধারা থেকে বিদায় নিল, একদিকে সে বছরের সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতি মাখা সাফল্য ও ব্যর্থতার চিত্র বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে যে বছরটিকে আমরা স্বাগত জানাই সে বছরটি প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তাঁর অনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে। মানুষের মনোরাজ্যের এ অবস্থানটি অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

প্রকৃতির রাজ্যে এক ঋতুর বিদায়ও পরবর্তী ঋতুর আগমনে যে পরিবর্তন গড়ে উঠে তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা যায়। শুধু এ দেশের নয়, অন্যান্য দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতেও ঘটে পরিবর্তন। আমাদের মনে ও চোখে তার ছোঁয়া লাগে। আর তা নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। এ অনুষ্ঠানগুলোর ঢং আর রং সর্বত্র এক নয়। আদিতে আদি মানুষ নববর্ষ পালন করতে সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নে ঋতু পরিবর্তন দেখে। প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষের আর্য জাতির নববর্ষ পালনের সময় ও পদ্ধতি প্রায় একই রূপ ছিল। এরা সৌরমাস-সমন্বিত চান্দ্র মাসের হিসেবে নববর্ষের উৎসব পালন করতেন। ইরানে ছয় দিন ধরে "নওরোজ" এবং ভারতে তিন দিন ধরে "দোল উৎসব" নববর্ষ উদযাপন উৎসব। "দোল" ফাল্গুনী পূর্নিমায় অনুষ্ঠিত হয়। "নওরোজ" ও ফাল্গুন মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। "নওরোজ" ও "দোল" এর মত পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলো বিশিষ্ট নামও দেখা যায়; যেমন তিব্বতীয়রা নববর্ষের উৎসবকে "লাগেসের", শ্যামবাসীরা "ত্রাত", ভিয়েতনামীরা " তেত", খৃষ্টানরা "ক্রিষ্টমাস" (নিউ ইয়ার), ইহুদিরা "বুস হাশামা" এবং মুসলমানরা "আশুরা" নামে চিহ্নিত করে থাকেন।

দেশে দেশে নববর্ষের অনুষ্ঠানাদিও রকমারি। দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড়দের (বলা বাহুল্য এ দ্রবিড়দের রক্ত বাঙ্গালির মধ্যেও পর্যাপ্ত) "নববর্ষ" একটু ভিন্নরূপে পালিত হয়। তাঁরা তিন দিন ধরে এ উৎসব পালন করে, তখন সর্বত্র একটা আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। তারা প্রথম দিনে নতুন চালে "নবান্ন" রান্না করে খাওয়াকে "নববর্ষের" জন্য একটা সৌভাগ্যসূচক কাজ বলে মনে করে।

অধিকন্তু এ সময় গবাদি পশুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে এগুলোকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে বেড়ায় ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে উপহার বিনিময় করে। এদের নববর্ষ যে মূলে কৃষি ভিত্তিক উৎসব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষি কাজের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১০ই মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তা কার্যকর হয় ১৬ই মার্চ ১৫৫৬ সালে তাঁর সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকে। হিজরি চন্দ্র মাস ও বাংলা সৌর সনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। এ বাংলা সন প্রথমে "ফসলী সন" বলে পরিচিত ছিল। পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি পায়। মুঘল আমলে "নববর্ষ" পালিত হত বাংলার রাজস্ব বার্ষিক বন্দোবস্তের একটি উৎসব হিসেবে। যার নাম "পূন্যাহ"। চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার ও অন্যান্য ভূস্বামীকে কর পরিশোধ করত। বৈশাখের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হত "পূন্যাহ" অনুষ্ঠান। এ দিন ভূস্বামীগণ তাদের বাংলোয় প্রজা সাধারণকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং পান পাতা দিয়ে বরণ করে নিতেন। এর পর মিষ্টান্ন ভোজের পালা। এ উপলক্ষ্যে ভূস্বামীগণ আয়োজন করতেন নাচ, গান, যাত্রা, মেলা, গবাদিপশুর দৌড় প্রতিযোগিতা, মোরগ লড়াই এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হলে "পূন্যাহ" অনুষ্ঠানও বিলুপ্ত হয়। আবির্ভূত হয় "হালখাতা" অনুষ্ঠান। যা "পূন্যাহ" অনুষ্ঠানেরই এক ভিন্নরূপ এবং জমিদারগণ এ দিনকে কেন্দ্র করে বিনোদনের যে আয়োজন করতেন তা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং তা ক্রমেই হয়ে উঠে বর্ষবরণের অনিবার্য অংশ এবং নববর্ষ হয়ে উঠে উৎসবমুখর এক আনন্দ অনুষ্ঠানের দিন। এক সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ দিনটিকে সমান তাৎপর্যে পালন করতে শুরু করে এবং দিনটি সমানভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠে। বহুধাবিভক্ত বাঙ্গালী জীবনের সবগুলো পথ এ দিনে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় আর সে বিন্দুটি হলো "বর্ষবরণ অনুষ্ঠান"।

এক সময় নববর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল "হালখাতা"। পহেলা বৈশাখের পূর্বেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশ সমাপ্তি টানতেন। এ উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীগণ নতুন/পুরাতন সকল খরিদ্দারকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং মিষ্টি মুখ করাতেন। হিসাব-নিকাশ মিটমাট করে নতুন খাতা খুলতেন যে খাতার নাম "খেরো খাতা"। পহেলা বৈশাখের পূর্বেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলার তাড়া থাকলেও কখনোই বাধ্যবাধকতা ছিলনা। অনুষ্ঠান ব্যবসায়ী ব্যতীত সাধারণ মানুষের জন্যও উন্মুক্ত থাকতো ফলে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠতো ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এক মিলন মেলা। এক সময় বৃষ্টি প্রার্থনাও ছিল বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অংশ। কেননা বৃষ্টিই ছিল চাষাবাদের একমাত্র সেচ ব্যবস্থা। চৈত্র মাসে যতই বৃষ্টি হোক না কেন কৃষক জমিতে লাঙ্গল দিত বৈশাখে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নববর্ষের মত বাঙ্গালী জীবনেও নববর্ষ মঙ্গল আর কল্যাণের প্রতীক। এ দিনে ঘর বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিস পরিপাট করে তোলা হয়। এ দিনে মেয়েরা নতুন শাড়ী আর ছেলেরা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিধান করতো। ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং ভাল থাকতে পারাকে ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করা হয়। আর ঘরে ঘরে আদর আপ্যায়ন। লোকজ পিঠা পায়েস ও নানা ধরণের মিষ্টান্ন মুড়ি মুড়কি, কদমা মুরুলি দিয়ে চলতো আপ্যায়ন। আনন্দচিত্তে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় হত। নববর্ষের আরেকটি বর্ণাঢ্য আকর্ষণ ছিল গ্রাম্য মেলা। মেলায় পাওয়া যেত স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী ইত্যাদি। শিশু বিনোদনের জন্য শোলা, মাটির দ্বারা তৈরি বাহারি পণ্য সামগ্রী। বাঁশের বাঁশী, ঘুড়ি, চুড়ি সহ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য যেমন চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা, গজা, জিলাপী ও নানা রকমের মিষ্টান্ন। বেলুন,

বাঁশীর আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কসরতে মেলা হয়ে উঠতো মুখরিত, উপভোগ্য। কতিপয় আঞ্চলিক অনুষ্ঠান নববর্ষকে সমৃদ্ধ করেছে বহুগুণে তম্মধ্যে বলি খেলা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলীখেলাঃ এটির প্রচলন কেবল চট্টগ্রাম জেলায় সীমাবদ্ধ। পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে সারা মাস ধরে চট্টগ্রামের নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে বলীখেলার আয়োজন করা হয়, তবে প্রধান ও সমাপনী বলীখেলা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের লাল দিঘির মাঠে। এই দিন লোকজ মেলারও আয়োজন হয়ে থাকে। এ খেলায় স্থানীয় ও দূর দূরান্তরের কুস্তিগিরেরা নেঁচে, কুঁদে, কুস্তি লড়ে শারীরিক শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে। আব্দুল জব্বারের বলীখেলাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বর্তমান সময়ে সমগ্র বাংলাদেশেই গ্রামীন মেলার মাধ্যমে এ দিনটি পালন করা হয়। রমনা বটমূল থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রত্যুষেই শুরু হয়ে যায় পান্তা-ইলিশ, আলুভর্তা আর বেগুনভর্তার বাহারি খানাপিনা। এ দিনে ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকে সজ্জিত হয় নানা বয়সের নারী পুরুষ। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে যুবতীরা পরে লাল পেড়ে সাদা জমিনের শাড়ী, হাতে পরে নানা রঙের চুড়ি, খোপায় ঝুলায় ফুল, গলায় ফুলের মালা, কপালে বিচিত্র রং ও গড়নের টিপ।

১৬৬৫ সাল থেকে ছায়ানট রমনা বটমূলে আয়োজন করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। কবিগুরুর আগমনী গান "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো" পরিবেশনার মাধ্যমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষকে বরণ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুল তলায় আয়োজন করা হয় প্রভাতী অনুষ্ঠান এবং এখান থেকে শুরু হয় মনোমুগ্ধকর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে বর্ষবরণ ঐতিহ্যবাহী এক ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ উৎসব পালন করে। চাকমাগণ "বিজু", মারমাগণ "সাংগ্রাই" ও ত্রিপুরাগণ "বৈসুক" নামে নববর্ষ উৎসব আয়োজন করে। কিন্তু সমগ্র পার্বত্য এলাকায় এর নাম হলো "বৈশাবি"। চাকমাদের কাছে এ উৎসব তিন পর্যায়ে হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের নাম "ফুলবিজু। এদিনে কিশোর কিশোরীরা বিজু ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। সাদা রঙের লম্বাটে ফুলটি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম "মরুবিজু" আর এটাই হলো বর্ষবরণের মূল আকর্ষণ। এ দিনে অনেক পদের সবজি সমন্বয়ে রান্না করা হয় "নিরামিশ" যার নাম "পাজন"। এ ছাড়া সাত রকমের খাদ্যশস্য ও চালভাজা মিশিয়ে তৈরি করা হয় "আটকড়ৈয়া" যা অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয়। এ সব খাদ্য ও মিষ্টান্ন সহকারে ঘরে ঘরে চলে অতিথি আপ্যায়ন। এ উৎসব পহেলা বৈশাখে শেষ হয়। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে মারমা সম্প্রদায়ের ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল বা পানি খেলা ঐতিহ্যবাহী এক উৎসব। পানি তাদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক। নববর্ষে তাই তারা পরস্পরের মধ্যে পানি ছিটিয়ে নিজেদের পবিত্র করে নেয়।

ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে আমরা সবাই সেদিন ফিরে যাই শিকড়ের সন্ধানে, ভুলে যাই হিংসা, বিদ্বেশে, ঘৃণা। সবাই মিলে একসাথে উদযাপন করি নববর্ষ। বৈশাখ এ ভাবেই বাজায় মিলনের বাঁশি, ডাক দেয় বিকাশের।

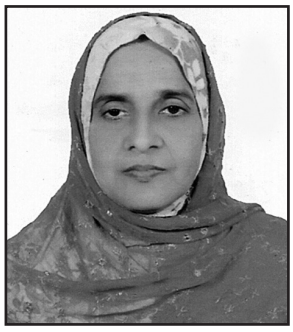

যুদ্ধ শিশু হস্তান্তরে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত

গাজী মোছাঃ আমিনা বেগম
সদস্য, সিরাজগঞ্জ
জেলা সমিতি

ডিসেম্বর/৭১-মাস অফিস বাড়ী ঘর রাস্তা ব্রীজ সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আছে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ, যে সময় বাঙ্গালী জাতি এক মহাসামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিবাহিতা অবিবাহিত বিধবা বিভিন্ন বয়সের হাজার হাজার নারী পাক হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনে অন্তসত্ত্বা হয়েছে, মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে, কেহবা অসুস্থ অবস্থায় কাতরাচ্ছে।

দুই লক্ষ শহীদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ৫২-এর ডাকা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের অর্জন মাতৃভাষা। শহীদের আত্মত্যাগ আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করি, তাদের সালাম জানাই। কিন্তু দুই লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের আত্মত্যাগের করুন কথা ও ব্যথা, সেইভাবে গর্বের সাথে স্বীকার করি না। আমরা লজ্জা বোধ করি। সম্ভম হারানো মা-বোনের করুন আর্তনাদে ব্যথিত হয়ে তাদের আবাসিক রেখে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বীরমাতা, শহীদ পরিবারের বিধবা মা ও শিশুর কান্না যখন আমাদের কষ্টের কারণ হয়েছিল তখন প্রয়াত মন্ত্রী শহীদ এম মনসুর আলীর চাচা প্রয়াত মোতাহার হোসেন ও মোঃ আনোয়ার হোসেন -এর উপস্থিতিতে এক মিটিং এ নারী পুনর্বাসন বোর্ডের সম্পর্কে বলা হলো। আমরা যেন অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেলাম। সিরাজগঞ্জ জেলা নয়, মহকুমা শহর হয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্তএলাকা বিবেচনা করে উনাদের একান্ত প্রচেষ্টায় সিরাজগঞ্জ ও ঈশ্বরদীতে নারী পুনর্বাসন বের্ডের শাখা খোলা হয়। প্রয়াত সখিনা হোসেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রয়াত সৈয়দা ঈশাবেলা সিরাজী, ছবি আপা প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও অন্যান্য সমাজ কর্মী মহিলাদের নিয়ে সিরাজগঞ্জে নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয়।

আমি তখন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী, এই কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পরে সহ সম্পাদক, সমন্বয়কারী ও প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি। শহর গ্রাম ঘুরে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব মেয়েরা ঘুরে বেড়াতো, গাড়ির শব্দে পালিয়ে যেত, আবারও ধরে নিয়ে যাবে এই ভয়ে। আমরা গাড়ি রেখে পায়ে হেটে তাদের কাছে যেতাম, সান্ত্বনার কথা,

চিকিৎসার কথা বলতাম। তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। দিনে আসতো না, রাতে তাদের অভিভাবক আমাদের বোর্ডে পৌছে দিতেন। নাম রিজিয়া খালা ডাক্তর না হলেও প্রাথমিক চিকিৎসা ও গর্ভপাত উনি করিয়েছেন। মাতৃসদন ও সদর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে। যেগুলো সম্ভব নয়, পাবনা ও ঢাকা পাঠিয়ে সন্তান প্রসব ও চিকিৎসা করানো হয়েছে। বাংলা মায়ের এমন ১৯ জন যুদ্ধ শিশুকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন, এস.ডি.ও ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড কর্তৃ পক্ষের মাধ্যমে বিদেশীদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। বীরমাতা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষন দান ও উৎপাদন কেন্দ্র চালু করে তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মহত কাজ গুলো সম্পন্ন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত নারী পুনর্বাসনের বোর্ডের মাধ্যমে। সেই নারী পুনর্বাসন বোর্ড উন্নয়নের ধারায় আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

সিরাজগঞ্জ নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র হতে চিকিৎসা ও সন্তান প্রসব করানোর জন্য যাদের পাবনা ও ঢাকা পাঠানো হয়েছিল তাদের সঙ্গে চিকিৎসার জন্য আছিয়া, আবুল ও সুখিরনকে পাঠানো হয়েছিল। আছিয়ার শরীর এখনো পাক সেনাদের গুলি বহন করছে। পাকিস্তানের সময় পরিবার পরিকল্পনায় কাজ করার কারণে আছিয়া বেশ কিছুদিন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সঙ্গে অবস্থান করেছে। সন্তান প্রসবের পর মায়েরা নিজের সন্তানকে দেখতে চাইতেন, কোলে নিতে চাইতেন, মায়েরা অনেক কান্না করেছেন। মাতৃসুলভ মায়ার কারণে বিশেষ পরিস্থিতি এড়ানারে জন্য বেশীর ভাগ সময়ই তাদের সন্তানকে দেখতে অথবা কোলে নিতে দেয়া হতো না। আছিয়ার কাছে ওইসব অভাগা মেয়েদের কথা শুনে আমরা কষ্ট পেয়েছিলাম। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ১৯ জন যুদ্ধ শিশু বিদেশীদের হাতে হস্তান্তরের ব্যবস্থাপনায় সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও এস. মালিক ও নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি ছিলাম। ওই সব অভাগা মা মেয়েদের কথা ভেবে যুদ্ধ শিশু হস্তান্তরের বিষয়টি আমি না বুঝে ভালো ভাবে মানতে পারছিলাম না। স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর পর আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, যুদ্ধ শিশুদের বিদেশীদের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত কতটা নির্ভুল ও সঠিক ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে গণহারে ধর্ষণ করেছে যাতে ঘরে ঘরে পাকিস্তানী শিশু জন্মাবে এবং বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য থেকে যাবে। বঙ্গবন্ধু এই ক্ষতিগ্রস্তনারীদের নিজের কন্যা বলে সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আদর করে "বীরাঙ্গনা" উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বীরাঙ্গনা মেয়েদের সব দায়িত্ব আমার। কিন্তু একটিও যুদ্ধ শিশু বাংলাদেশে থাকবে না। যুদ্ধ শিশুদের বাংলার মাটিতে রাখা হয় নাই। ঠাকুরগাঁ জেলার রাণী শংবেলের টেপরী রানী হিন্দু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ন না হতেই মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ধর্ষিতা হন। নিজের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন সমাজ থেকে অনেক দূরে চলে যান। পালিয়ে থেকে মানুষের বাড়ী কাজ করে তাঁর সন্তান সুবীরকে বড় করেছেন। মা আর বিয়ে করেননি। সুধীর মায়ের ত্যাগকে অনেক বড় করে দেখেন। গত ১৩ ডিসেম্বর/১৪ তে প্রেস ক্লাবে বীরাঙ্গনা মুক্তি যোদ্ধা সম্মাননা সভায় প্রবাসী গাফফার চৌধুরী ছিলেন। সুধীরকে মঞ্চে ডাকা হয়, সুধীর বিমর্ষ ঠান্ডা গলায় বলে- সবার বাবা আছে, আমার বাবা নেই। সবার

পরিচয় আছে আমার পরিচয় নেই। কিছু করার নেই। আমি এভাবে এ কষ্ট নিয়েই বড় হয়েছি। মায়ের মত আমিও নিজের সমাজ থেকে দূরে থাকি, দূরে কাজ করি। তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমাকে কাঁদিয়েছে। কুমিল্লার আরেক মেয়ে যুদ্ধ শিশু, মা তাকে রেখে পালিয়ে গেলে সে খালার কাছে বড় হয়। নাবালিকা বয়সে খালুর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয় এবং বিবাহিত জীবন শুরু হয় (তথ্য। শামসুন্নাহার কোহিনুর)। যুদ্ধ শিশুরা আমাদের দেশে থাকলে সামাজিক অবস্থার আরও অবক্ষয় হতো।

অপশক্তির প্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিকে পুনরায় যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেদিনের শিশু আজ ৪৩ বৎসরের যুবক। তারা বাংলাদেশে থাকলে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি আরও শক্তিশালী হতো। স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির আরও বিপর্যয় অবস্থা হতো। আজ ২০১৫ সালে, ৭১ সালের মতো পাকিস্তানী কায়দায় মানুষ হত্যা আর জ্বালাও পোড়াও দেখে ধারণা করা হয় কিছু কিছু পাকিস্তানী শিশু কোন ভাবে এখনো বাংলাদেশে রয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সেদিনের সে দূরদর্শী সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ সালাম।

ইতিহাসের আলোকে অমর-২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মুহাম্মদ আবুল বাতেন
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

অমর ২১ ফেব্রুয়ারি "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষাভাষী ৩০ কোটি মানুষসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি গোষ্ঠীর মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতিসংঘে এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বহুভাষায় শিক্ষা" (Towards sustainable future through Multilingual Education) যা অত্যন্ত যুগোপযোগী। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহু ভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অমর একুশে চেতনায় এগুতে হবে আমাদেরকে চির মহিমায়।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে তথা ব্রিটিশ আমলে পাকভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ইংরেজি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১১০০ মাইলের ব্যবধানের দুই অংশ নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ পরিষদের ১ম অধিবেশনে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজিকে নির্ধারণ করা হয়। কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান কংগ্রেস দলীয় গণপরিষদ সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের ৫৬.৪০ শতাংশ লোকের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করলে তা পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ও গণ পরিষদের সহ সভাপতি মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান- এর বিরোধিতায় অগ্রাহ্য হয়, ফলে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলন। শুরু হয় প্রতিবাদী বিক্ষোভ ও ১১ মার্চ দেশব্যাপী পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। বাংলাভাষার দাবীতে এ ভাবেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত। ঐদিন মিছিল শেষে গ্রেফতার হন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক,অলি আহাদ প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ-র পূর্ব বাংলা সফরের তারিখ নির্ধারিত হয়। সফরের পূর্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তীব্রতা অনুধাবন করে অনিচ্ছা সত্বেও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সথে আলোচনায় সম্মত হন এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ সরকার ও 'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ- এর পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ- এর মধ্যে ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হবার আগে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে

শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহাবুব প্রমুখ বন্দী ছাত্র নেতাকে চুক্তিপত্রটি দেখিয়ে তাঁদের সম্মতি নিয়ে আসেন। চুক্তির প্রধান বিষয় ছিল গণ-পরিষদে বাংলাকে উর্দুর সম মর্যাদা দানে বিশেষ প্রস্তাব ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক সফরে আসেন। তিনি ২১ মার্চ ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় উর্দুতে বক্তৃতা করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন "Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan"। তিনি আরোও উল্লেখ করেন যারা বিরোধিতা করবে তারা পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ "Students Role in Nation Building" শিরোনামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখানে ক্যাটাগরিক্যালী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবী নাকচ করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটি এবং সেটি উর্দু। উর্দুর বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের পাকিস্তানের দুশমন বলে আখ্যায়িত করেন। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ছাত্রদের "No No"ধ্বনিতে কার্জন হল এলাকা প্রকম্পিত হয়।

ইতোমধ্যে ২৭ মার্চ ১৯৫১ গণ পরিষদে বাংলা ভাষায় আরবি বর্ণমালা প্রবর্তন ও আরবি বর্ণমালায় বাংলা লেখার তথা কুরআন শরীফের হরফ প্রচারের নামে বাংলাভাষায় আরবি-উর্দু বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা করা হয়। তা বাংলার গণ-পরিষদের সদস্যদের প্রতিবাদে প্রত্যাহার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের ২য় পর্ব শুরু হয় ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দীন, পুর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রি নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পল্টন ময়দানে জিন্নার অনুকরণে ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। তিনি এ বক্তব্যে আন্দোলনের মুখে অগ্নিতে ঘি ঢালেন। সাথে সাথে সমাবেশস্থলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শ্লোগান উঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনকে তীব্র গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় ছাত্রদের পাশাপাশি তারাও ভাষা আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ ভাসানীর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবীদের এক সম্মেলন হয় এবং সম্মেলনে কাজী গোলাম মাহবুবকে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্যের "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দি মুক্তির দাবীতে ১৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন কারাগারে অনশন শুরু করেন যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে।।

ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এইচ. কোরেশী সি.এস.পি ঢাকা সি.আর.পিসি'র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ঢাকা শহরের সমগ্র এলাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে রাত ৮ঘটিকা থেকে পরবর্তী

৩০ দিনের লিখিত অনুমতি ব্যতীত শোভাযাত্রা, জনসভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

এ সংবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে ছাত্র সমাজ প্রবল বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। সলিমুলাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সভা হয়। সভায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা শহরের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জমায়েত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সকাল ১০.৩০ টায় কলা ভবনের আমতলায় সুঠামদেহী ছাত্র গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশাল সভা হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র আহ্বায়ক ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা বক্তব্যে ছাত্র/ছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আহ্বান জানান। উজ্জীবিত ছাত্র জনতার প্রত্যয়ী প্রত্যুত্তর "১৪৪ ধারা মানিনা, মানবোনা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, চলো চলো, অ্যাসেম্বলিতে চলো" (ভেঙ্গে পড়া পুরাতন জগন্নাথ হলের মিলনায়তন)। সভায় ৫ জন ৫ জন করে ১০ জনের এক-একটি দল নিয়ে ১৪৪-ধারা ভঙ্গ করে আইন সভার দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমে মেয়েদের একটি দল অলি আহাদ, মুহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুস সামাদ প্রমুখের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। পুলিশ তাদেরকে লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মেডিকেল কলেজের গেটের নিকট এলে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের সামনে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সমবেত ছাত্র/জনতার উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরাইশীর নির্দেশে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল সময় বিকেল ৩:২০ মিনিট। গুলিতে একুশের প্রথম শহীদ হন রফিক সহ আবুল বরকত, আবুদল জব্বার, সফিউর রহমান সালাম, ওয়াজিউল্লাহ সহ আরো অনেকে। এরা ভাষা শহীদ হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরাই প্রথম মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছেন।

সরকার কর্তৃক শহীদদের শেষকৃত্য ছাত্রদের করতে না দেয়ায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্র বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দারের শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় দু'বাকের নকশায়, ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ছিল, তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সাদামাটা একটা স্থাপত্য পরিকল্পনা ১০ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট চওড়া ভিত্তির উপর বরকত শহীদ হওয়ার স্থানে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ একটি স্মৃতিস্মম্ভ নির্মাণ করা হয় শহীদদের স্মরণে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ শহীদ সফিউর রহমানের পিতা মতিউর রহমানকে দিয়ে 'শহীদস্মৃতি স্তম্ভ'- টির ফলক উন্মোচন করা হয়। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ -টি ২৬ ফেব্রুয়ারি পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উল্লেখ্য, এ দিন সন্ধ্যায় পুলিশ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি একই স্থানে কাগজের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও ছুটি ঘোষণা

করে। এরপর নতুন শহীদ মিনার তৈরির ঘোষণা আসে। ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে পূর্ববঙ্গ সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মাওলানা ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। পাকিস্তানের গণপরিষদ সংবিধানে ২১৪-ধারা বলে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ বাংলা ভাষা পাকিস্তানের উর্দুর সাথে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়।

স্থপতি হামিদূর রহমানের পরিকল্পনা ও নকশায় ১৯৫৭ সালের নভেম্বর থেকে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত লোকজন এই অসম্পূর্ণ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী মুল নকশা পরিবর্তন করে আরেকটি নকশা করা হয়। এরপর দ্রুত মিনারের কাজ শেষ হয়। মূল বেদির উপর অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো ৫টি স্তম্ভের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মা তাঁর শহীদ সন্তানদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এর উদ্বোধন করেন শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। এ মিনারই পরে একুশের চেতনার প্রতীক হয়ে উঠে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান বাহিনী মিনারটি ভেঙ্গে সেখানে 'মসজিদ' লিখে দেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়। সংবিধান যেদিন প্রণীত হয় সেদিন থেকে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হয় বাংলা। ১৯৭২ সালে নতুন করে শহীদ মিনার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়, ১৯৬৩ সালের নকশার ভিত্তিতে। ১৯৭৬ সালে নতুন নকশা হলেও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ১৯৮৩ সালে মিনার চত্বর কিছুটা বিস্তার করে শহীদ মিনারটিকে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়। সেই থেকে জাতি এখানেই শ্রদ্ধা জানায়।

১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবস হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেন। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে "International Mother Language Lover of the world" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের মোট ১০ জন সদস্যের ৬ জন সদস্যই ছিল নারী। ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট Anna Maria Mailofএর অক্লান্ত চেষ্টা, হাঙ্গেরীর ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইউনেস্কো জাতিয় কমিশন, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে যথাসময়ে পেশ হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের কুটনৈতিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা যথেষ্ট পরিমান ভূমিকা রাখে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০ তম সাধারণ সভায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস' হিসেবে মনোনীত করার জন্যে উত্থাপিত হয়। ইউনেস্কোর ২৮টি সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব সমর্থন করে। প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে খসড়া প্রস্তাব৩৫ (Draft Resolution-35) হিসেবে উত্থাপিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১২ এবং ১৬ নভেম্বর এ প্রস্তাব কমিশন-২ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পাশ হয় এবং সাধারণ সম্মেলনে উত্থাপনের জন্যে সুপারিশ করা হয়। ১৭ নভেম্বর সাধারণ সম্মেলনে সকল

সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর ইউনেস্কোর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রসহ ইউনেস্কো সদর দপ্তরে দিনটি যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে পালিত হচ্ছে। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত দান ও আত্মত্যাগের ইতিহাস উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ হয়। উল্লেখ্য জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য যাঁরা শহীদ হয়ে ছিলেন তাঁদের স্মরণে পরবর্তী ১৯৫৩ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়ে আসছে। এ দিবসে প্রভাতফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি কর্মকান্ডে মাধ্যমে গর্বভরে বাঙালি জাতি দিনটি পালন করে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২১ চেতনা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। এর সুদূর প্রসারি ফলাফল হচ্ছে বাঙালি জাতিয়তাবাদ। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতিয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম সোপান। ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভূত্থান, ৭০-এর নির্বাচন তথা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্ত ভেজা সিঁড়ি বেয়ে অর্জিত হয়েছে লাল সবুজের পতাকা, সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আমরা এই দিনে সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী বাংলা সহ আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও অন্যসব ভাষাভাষির মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নত জাতিগুলোর ভাষার সঠিক বোধগম্যতা নিয়ে টেকসই ভবিষ্যৎ উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় এগিয়ে যাবো এবং প্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হবো আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষার মহান চেতনায়।

সহায়ক গ্রন্থ পুঞ্জি

১. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: মুনতাসীর মামুন ও অন্যান্য, সুবর্ণ প্রকাশনী পৃ:১৯৭।
২. স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস: ড. এ. এম রফিকুর রহমান-২০১৪।
৩. পূর্ব বাংলার ও তৎকালীন রাজনীতি: বদরুদ্দিন উমর, ১ম খন্ড-১৯৯৫।
৪. বঙ্গবন্ধুর কারা সঙ্গী, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি: ঢাকা ১৯৯৯। মহিউদ্দিন আহমেদ।
৫. ভাষা আন্দোলন ইতিহাসে ও উত্তর প্রভাব: আহম্মদ রফিক, ঢাকা-২০০২।
৬. আমার দেখার রাজনীতির৫০বছর: আবুল মনসুর আহমদ, খোকরোজ কিতাব মহল, ঢাকা-২০১০।
৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: ড. মোহাম্মদ হান্নান, ঢাকা ১৯৯২ পৃ: ৮৮।
৮. দৈনিক আজাদ ১৩৫৪, ১২ই শ্রাবণ
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি: মোনোয়ম সরকার সম্পাদিত।

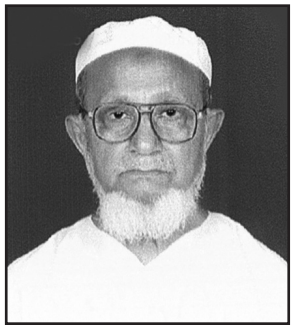

শহীদ তিতুমীর

রফিক আলম বিশ্বাস
সদস্য নং আ: ৪০৭

আজ হতে অনেকদিন আগে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিগের কথা। বাংলার প্রজাকুলের উপর স্থানীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার-অবিচার প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার। মুসলিম সমাজ ছিল অবহেলিত এবং নিন্দনীয়। শীরক এবং বেদআত এর অনুশীলন বন্ধ করার জন্য এবং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশাসন অনুসারে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

১৪ই মাঘ, ১১৮৮ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭৮২ খ্রী:) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মীর ইমাম আলী এবং মায়ের নাম ছিল আবিদা রুকাইয়া খাতুন। কথিত আছে যে, তিক্ত ঔষধের প্রতি তাঁর আসক্তি বেশী ছিল বলিয়া তাঁকে 'তিতা' মিয়া ডাকা হত, এই তিতা মিয়াই পরবর্তীকালে তিতুমীর হন।

তিতুমীরের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর। তাঁরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব দেশ হতে বাংলাদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশ হতে আগত তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন সায়িদ শাহাদত আলী। তাঁরা পুত্র আব্দুলাহ দিল্লীর শাহি দরবারে প্রধান বিচারপতি নিয়োজিত হয়ে 'মীর ইনসাফ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সে হতে শাহাদাত আলীর বংশধররা মীর-সায়িদ উভয় উপাধি ব্যবহার করতেন।

তিনি বাল্যকালে গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। পরে ইসলামিক এক মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন কোরআনের হাফিজ, বাংলা, আরবি এবং ফরাসি ভাষায় দক্ষ এবং আরবি ও ফারসি সাহিত্যের প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী। তিনি ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে, আইন শাস্ত্রে, তাসাউফ বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিতুমীর একজন শক্তিশালী কুস্তিগীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি ১৮২২ সালে পবিত্র কাবা শরীফে গমন করেন এবং সেখানে তিনি বিখ্যাত চিন্তাবিদ, ধর্ম সংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা সয়্যিদ আহমেদ বেরেলভীর গভীর ধর্মীয় সান্নিধ্য লাভ করেন। সাইয়েদ আহমেদ বাংলার মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতি-নীতির অনুশীলন এবং বিদেশী শক্তির পরাধীনতা

থেকে মুক্ত করার জন্য সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে তিতুমীর চব্বিশপরগনা ও নদীয়া জেলার মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলামী অনুশাসন প্রচার করার কাজ শুরু করেন। তিনি মুসলিম জনগণের শিরিক ও বেদআত অনুশীলন থেকে বিরত থেকে ইসলামী নিয়মনীতি মান্য করে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করেন।

বিশেষ করে তিনি তাঁতী ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কাজ চালনা করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক কর আরোপের জন্য পুরোনো হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীর এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়েন। কৃষককুলের উপর জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে অপরাপর জমিদারদের সঙ্গেও তিতুমীর সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এসব অত্যাচারী জমিদারেরা ছিলেন গোবরডাঙ্গার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাশিয়ার রাজনারায়ণ, নাগপুরের গৌরপ্রশা চৌধুরী এবং গোবরা- গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়।

এ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা এবং কৃষক কুলের নিরাপত্তাদানের জন্য তিতুমীর মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। তাদের লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনি শিষ্য ও ভাগিনে গোলাম মাসুমকে বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন।

তিতুমীরে দেশীয় অস্ত্রের সুনিপুণ প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তাঁর শক্তি ও বুদ্ধিতে তারা আতঙ্কিত হয়। জামিদারেরা তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। গোবরডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির ইংরেজ কুঠিয়াল ডেভিড তাঁর বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান করে পরাজয় বরণ করেন। তিতুমীরের সঙ্গে এক সংঘর্ষে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার নিহত হন। বারাসাতের কালেক্টর আলেকজান্ডার ও বশিরহাটের দারোগাকে নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এ যুদ্ধেও জমিদাররা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এসময়ে তিতুমীর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সম্পৃক্ততার প্রচেষ্টা চালায়। গোবরডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির ডেভিড তাঁর বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকরে পরাজিত হলে তারা ভিন্ন মত পোষণ করতে থাকে। এ সময়ে তিতুমীর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের নিকট জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

বাধ্য হয়ে মুসলিম মুজাহিদগণ তিতুমীরের ভক্ত ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধী মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীর ইংরেজ রাজত্বের বিলুপ্তি এবং মুসলিম রাজত্বের পুন:প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। চব্বিশপরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলা তিতুমীরের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল চার-পাঁচ হাজার। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিতুমীর নিজেকে "বাদশাহ" বলে ঘোষণা করেন। এই সময়ে হিন্দু জমিদার ছিল কৃষ্ণদেব রায় জমিদারেরা মুসলমানদের দাঁড়ি, গোঁফ, মসজিদ ও মুসলমান নামের উপর কর আরোপ করলে তিতুমীর তা দিতে অস্বীকার করেন। এটিকে কেন্দ্র করে তিতুমীর ও জমিদারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাদের আক্রমনে তিতুমীরের কয়েকজন ভক্ত শহীদ

হন। বাধ্য হয়ে মুসলিম মুজাহিদগণ তিতুমীরের ভক্ত ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধী মুজাহিদ দল গঠন করেন।

এ সময় জমিদারেরা নিরুপায় হয়ে বৃটিশদের স্মরণাপন্ন হয়। তিতুমীর জেহাদে অবতীর্ণ হবার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। কলকাতা থেকে একটি ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক, লেফটন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ১০০ জন অশ্বারোহী, ৩০০ জন স্থানীয় পদাতিক বাহিনী এবং দু'টি কামানসহ গোলন্দাজ সৈন্যের এক নিয়মিত বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। সেদিন ছিল ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর। ইংরেজ বাহিনী মুজাহিদদের উপর আক্রমন করে। মুজাহিদগণ সাবেক দেশীয় অস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে তিতুমীর বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজরা কামানের গোলা বর্ষণ করে বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ আত্মোৎসর্গ করেন। বহু সংখ্যক অমুসলিসহ তিতুমীর যুদ্ধে শহীদ হন ১৯শে নভেম্বর, ১৮৩১ ইং সাল। মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক গোলাম মাসুমসহ ৩৫০ মুজাহিদ ইংরেজ সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। গোলাম মাসুম-এর মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়। ১৪০ জন বন্দীদের বিভিন্ন দন্ডে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। তিতুমীর ধর্মীয় জেহাদী আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করলেও তিনি শহীদ উপাধিতে ভূষিত হন। আজও বাংলার জনগণ তাঁর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তিনি 'শহীদ' তিতুমীর হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

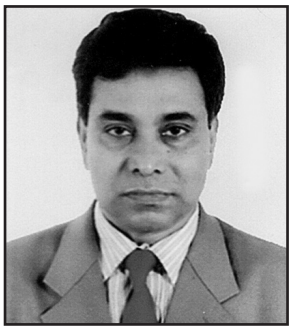

শরীরের জন্য দইয়ের স্বাস্থ্য বান্ধব ভূমিকা :

মোঃ এ. কে. ফজলুল হক
আজীবন সদস্য - ২৭৯৭
কেন্দ্রীয় সমিতি।

দই নিয়ে হইচই এই বঙ্গদেশে কম হয়নি, বগুড়ার দইয়ের কথা সবাই জানেন। কিন্তু দেশের অন্য অঞ্চলেও যে খাঁটি দই হয় সে কথা মানেন ক'জন? মানলেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনা। গরুর দুধ, নাকি মহিষের দুধের দই ভালো? টকদই নাকি মিষ্টি দই উপকারী? ঘরে পাতা দইও অনেকের প্রিয়। সেক্ষেত্রে অনেক গৃহিনীর আক্ষেপের শেষ নেই,শত চেষ্টা করেও দই জমছেনা কেন? এজন্য রয়েছে অবশ্য শত পরামর্শ। আসুন জেনে নেই দইয়ের গুণঃ

- দই হজমে সহায়তা করে। এর ল্যাকটোবিসিলিসের মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া, যেগুলো প্রোবায়টিক ব্যাকটেরিয়া নামে পরিচিত, তারা পেটের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বিতাড়িত করে। উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো হজমের সমস্যা দূর করে ও শরীরের জন্য ভিটামিন 'কে' তৈরী করে।
- প্রতিদিন দই খেলে হৃদরোগ প্রতিরোধ হবে। কারণ দই শরীরের কোলেষ্টরল দূর করে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিহত করে। উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও দই সহায়ক।
- দইয়ে অনেক পুষ্টি উপাদান থাকে। ভিটামিন 'বি'-টুয়েলভ, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্কসহ বেশ কিছু ভিটামিন ও মিনারেল থাকে। ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদানের অভাবে যারা ভোগেন তাদের জন্য দই চমৎকার ঔষধ।
- দই শরীরের বাড়তি ওজন কমিয়ে দেয়। পেট ও হৃদপিন্ডে চর্বি জমার জন্য দায়ী হরমোন কোরটিসোল কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। শরীর থেকে জাংক ফুডের ক্ষতিকর উপাদানও বের করে দেয় দই।
- হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে দইয়ের ভূমিকা আছে। এতে প্রচুর ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস আছে যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। জাপানে এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন দই খাওয়ার ফলে মানুষের মুখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। মুখে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর করে দই। এতে দন্তক্ষয় ও মাড়ির রোগ হওয়ার আশংকা কমে।
- প্রতিদিন দই খেলে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে। গবেষকরা বলেছেন ৪ মাস ধরে প্রতিদিন দুই কাপ করে দই খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৫গুণ বেড়ে যায়।

- দই যৌন জীবনের জন্যও উপকারী। নিয়মিত দই খেলে দৈহিক মিলনে নিজেকে পুরোপুরি খুঁজে পাবেন। এমনকি পুরুষত্বহীনতা দূর করা ও বীর্য উৎপাদনেও দই ভূমিকা রাখে।
- চেহারার উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে দই। প্রতিদিন দই খেলে খুব সহজেই লাবণ্য সৌন্দর্য দেখা দেবে চেহারায়। এর কারণ হলো দইয়ে প্রচুর ভিটামিন- 'ই' জিংক, ফসফরাসসহ আরো কিছু মাইক্রো মিনারেল থাকে, যেগুলো ত্বক উজ্জ্বল করে ও মুখের ব্রন দূর করে। চেহারায় বয়সের ছাপও কমায়। এটি খুব ভাল একটি ময়শ্চারাইজার।
- রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া রোধ করে দই। এক্ষেত্রে এলোভেরা উপকারী হলেও তা সহজে পাওয়া যায়না, দামও বেশী। তাই হাতের কাছে থাকা দই শরীর রোদে পুড়ে যাওয়া অংশে লাগালে ভাল উপকার পাওয়া যায়।
- দই হতাশা নিরাময়কারী। কোরটিসোল হরমোনের কারণে যে হতাশা তৈরী হয়, দই তা কাটিয়ে তোলে। প্রতিদিন দই খেলে মাথা ঠান্ডা থাকে।
- আপনার মাঝে যদি ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, তাহলে দই খান। এতে খাওয়ার আগ্রহ ফিরে পাবেন।
- যদি শরীর থেকে রক্তপাত হয়, তাহলে দই খান। দইয়ের ভিটামিন 'কে' রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- মহিষের দুধের চেয়ে গরুর দুধ থেকে তৈরী দই তুলনামূলকভাবে উত্তম। কারণ মহিষের দুধে অতিরিক্ত ফ্যাট ও প্রোটিন থাকায় অনেকেই খেয়ে বদহজমের অভিযোগ করেন। বয়স্ক ও ছোটদের মহিষের দুধ বা সেই দুধের তৈরী দই না খাওয়াই উচিত।
- দই টাটকা খাওয়া উচিত। কারণ কয়েকদিনের সংরক্ষিত দইয়ে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠে। তাই দই তৈরীর ২৪ ঘন্টার মধ্যে খেয়ে ফেলা উচিত।
- যারা দুধ খেতে পারেন না, তারা দই খেতে পারবেন। দুধ খাওয়ার পর অনেকেই হজম করতে পারেন না, এতে ডায়রিয়া বা গ্যাসট্রিকের সমস্যা দেখা দেয়। আর দই খেলে এই ধরণের সমস্যা হয়না।

পাঠাভ্যাস

মোহাম্মদ আবদুল খালিক
আজীবন সদস্য, মৌলভীবাজার
জেলা সমিতি

পাঠাভ্যাস বলা যেতে পারে এক মহৎ অভ্যাস। একবার এই অভ্যাসটা কারো মধ্যে তৈরি হলে কিংবা পাঠবীজ-এর অঙ্কুর-উদ্গম ঘটাতে পারলে এবং নিয়মিত জল সিঞ্চন, যথাযথ পরিচর্জা ও লালন করা সম্ভব হলে তা সহজে কাউকে ছেড়ে যায় না, যেতে চায় না। এটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে পাঠাভ্যাস উপাসনা, বিদ্যার্জন, জ্ঞান আহরণ এবং বিনোদন এ সবের এক সমন্বিত কল্যাণী রূপ। হাদিসে উল্লেখ আছে-'বিদ্যা ভালোমন্দ বিবেচনা করবার শক্তি আনিয়া দেয়। বিদ্যা বেহেস্তের পথ আলোকিত করে। এটি নির্জনে সঙ্গী, মরুভূমিতে সহচর ও এটি আমাদের বিমলানন্দের দিকে নিয়ে যায়, শত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমাদিগকে অটুট রাখে, বিদ্যা সমাজের অলংকার স্বরূপ এবং শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অমোঘ কবচ। বলা যেতে পারে সেই একই কারণেই পড়' বা 'পাঠ কর' এই শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে পবিত্র গ্রন্থের প্রথম বাণী বা নির্দেশনা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর পড়া বা পাঠ করার আদেশটি নাযিল হয়েছে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই। এই দিক থেকে অবশ্যই বলা যায় পড়ার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর আমরাতো জানিই পড়া কিংবা বিদ্যার্জনের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে বই। সে হিসেবে বিশাল বস্তু সাম্রাজ্যে এটি একটি মূল্যবান এবং তুলনাহীন অদ্বিতীয় বস্তু। এর মাধ্যমেই মানবসমাজ শিক্ষার্জন ও জ্ঞান আহরণ করে থাকে। আর এই অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানের ফলেই মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় মানবিক হয়ে উঠে। সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ ও শান্তিময়তায় গতিশীল হয় যাপিত জীবন। সম্ভবত তাই মনীষীদের কেউ কেউ এরকমও বলে থাকেন- "জীবনে তিনটি জিনিসেরই প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে বই বই এবং বই"।

শেখা ও জানার লক্ষ্যে শৈশব থেকেই আমরা বইয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আছি এবং আরো ব্যাপকভাবে থাকা উচিৎ বলে মনে করি। হাদিসে বলা হয়েছে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানচর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করো'। মোটা দাগে বলতে গেলে এর ভাবার্থ দাঁড়ায়- আমৃত্যু নিজেদের জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত রাখা তথা বইয়ের সংস্পর্শে থেকে জ্ঞান আহরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া। অতএব জ্ঞানের সাধনায়, ভাল এবং পাঠযোগ্য বইয়ের একান্ত সান্নিধ্যে আজীবন বসবাস আমাদের জীবন যাপনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অবশ্যই মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার তাগিদ এখানে লক্ষ্যণীয়। এ প্রয়োজন বা কর্তব্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন, তেমনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক,

নৈতিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ও সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বটে। আমরা তো জানিই বন্ধু হিসেবে বই অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারে। এ সম্পর্কে অনেক মহাজনবাণীও রয়েছে। তাঁদের গভীর অন্তদৃষ্টি, মেধা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ে অর্জিত প্রজ্ঞার ফসল যা আমাদের আলোর পথ অনুসন্ধানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক। আব্রাহাম কাওলে যখন বলেন- আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমার গ্রন্থসমূহ, তোমরা আমার কাছেই থাকো এবং আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে চলো। তখন এ বন্ধুদের হাত ধরে 'আলোর রাজ্যে নির্বিঘ্নে বিচরণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগা আমাদের জন্য কী জরুরী নয়? যেহেতু আমরা এও জানি একটি ভালো বই হলো বর্তমান ও চিরকালের জন্য উৎকৃষ্ট বন্ধু। কাজেই উত্তম বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্যুত হলে- যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়লে পথের দিশা পাব কোথায়? অন্ধকার তো আরো ঘনীভূত হয়ে বেঁকে বসবে, তখন রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলার মসৃণ পথ।

মাসহুড যেভাবে উচ্চারণ করেন- 'আমি তাকে করুনা করি যে প্রতিদিন মাখন খায় অথচ বই পড়ে না। তখন এক ধরণের কষ্টবোধ কাজ করে, হৃদয় জুড়ে বেদনা জাগায়। আমাদের পারঙ্গমতা থাকা সত্ত্বেও কেন অন্যের করুনা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে? এই বেঁচে থাকা কী অবমাননাকর নয়? নিজেদের সম্মানজনক ভাবে নির্মাণ করার জন্য পাঠাভ্যাস তৈরি করা, পৃথিবী ও প্রকৃতির পাঠশালা থেকে যথার্থ সবক নেওয়া তাই খুবই জরুরী। এই জরুরী কর্ম, কর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি তো আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না যেভাবে অতিরিক্ত ঘি মাখন সেবন তথা অতিভোজন কখনো কখনো হৃদ (Heart) বিনাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিংবা দাঁড়াতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে- "আজ সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে।" সেই কবে উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বক্তব্যটি আজও তা কতটা অমলিন, প্রাসঙ্গিক এবং তীব্রতা নিয়ে টিকে আছে। চর্চাহীন, সাধনাহীন, চাতুর্যময় অহংকারী বাচালতায় আমরা এখনো পতিত, নিমজ্জিত। এই নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পেতে- নিজেদের আরো শাণিত করতে, সম্ভাবনার দশ দিগন্ত উন্মোচিত করার লক্ষ্যে আমাদের জ্ঞান আহরণের চর্চা, গভীর সাধনা, চরম সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পাঠাভ্যাসের ব্যাপক বিস্তৃতির মাধ্যমে চিন্তা চেতনাকে আরো উদার উন্মুক্ততায় প্রসারিত করতে হবে, লজ্জিত হওয়ার মাত্রা বাড়াতে হবে। কারণ আমরা যত বেশি পড়াশুনা করব, তত বেশি নিজের অজ্ঞতা আবিষ্কার করে লজ্জিত হব (জন অনকট)। তবে এ লজ্জা সুখের, আনন্দের মহৎ আবরণে আচ্ছাদিত, প্রশান্তির ছায়ায় বিস্তৃত এবং স্বস্তিদায়ক। অজ্ঞতার কঠিন পাথর কেটে শীতল জলের নরম প্রস্রবন প্রবাহিত করার লক্ষ্যে জ্ঞানসমুদ্রে আমাদের ঘন ঘন অবগাহন করা স্বীয় এবং জাতিয় প্রয়জোনে অবশ্যই জরুরী। তবেই না সামগ্রিক অজ্ঞতার লজ্জা আমাদের খসে পড়বে, বিজ্ঞতার আলোয় আমরা সাফ-সুতরো হবো।

বই সম্পর্কে জসীমউদদীন জানান- "বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে; খ্যাতি, মান, অর্থ, শক্তি কিছুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারে

নাই। কিন্তু বইয়ের পাতা ভরিয়া তাহারা তাদের তপস্যা, তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাদের নৈরাশ্য, কি হইতে চাহিয়া কি তাহারা হইতে পারে, সবকিছু তাহারা লিখিয়া গিয়াছে।"- পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে বইয়ের পাতা মন্থন করে আমরা জ্ঞানরূপ, আনন্দরূপ মণি-মুক্তা তুলে আনার চেষ্টা করতে পারি- যেখানে যুগে যুগে স্রষ্টারা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ও পাওয়া না পাওয়ার কাহিনী। লুকিয়ে রেখেছেন জগতের আরো অনেক সম্পদরাশি। বদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে অর্গল খুলে সেসব গুপ্তধনের খোঁজ নিতে এবং তা সংগ্রহ করতে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ। আর তাঁর উত্তম হাতিয়ার হিসেবে বই হোক নিত্য সঙ্গী।

যার জন্মে আলোকিত বিশ্ব জাহান

এস, এম ইদরিস
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

যার জন্মে সব দুনিয়া আলোকময় হয়েছে- পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব আকায়ে নামদার, তাজদারে মদিনা হয়রত মোহাম্মদ (সাঃ), আজ থেকে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে ৫৭০খ্রিঃ ২০ এপ্রিল, ১২ রবিউল আওয়াল রোজ সোমবার সুবহে সাদেকের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাধুর্যপূর্ণ চরিত্রে বিদ্যমান রয়েছে যার আমানতদারী, দানশীলতা, উদারতা, মহানুভবতা, বিনয়, নম্রতা, সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা; যার উছিলায় আরব ভূখন্ড থেকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অভিশাপ চিরতরে দূরীভুত হলো, অনুৎপাদনশীল জমি ফসল ফলাদিতে ভরপুর হয়ে উঠলো, দুগ্ধশূন্য উট ও বকরিগুলোর স্তন দুগ্ধে পুরিপুর্ণ হলো, সদা সত্যবাদি-আল আমিন যার উপাধি; যিনি আরব আজমিদের মধ্যে সমমর্যাদা প্রণয়নকারী; উম্মতের কষ্টে তিনি ব্যথিত, আনন্দে আনন্দিত, পরিবারের প্রতি যত্নবান, প্রতিবেশীদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা যার দুর্লভ আদর্শ, তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী তাজদারে মদিনা, মুক্তির দিশারী শান্তির অগ্রদুত হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুলাহ (সাঃ)।

মক্কা বিজয়ের পর তাঁর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনকারী ব্যক্তিগণ প্রাণের ভয়ে কাবা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তিনি তাদের সকলকে মাফ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (দঃ) এর পথে কাঁটা দেয়া বুড়ির ঘটনা আমরা সবাই জানি। এমনি আরও একটা ঘটনার কথা বলি, মক্কা বিজয়ের পর সব লোক হত্যা করা হবে- এই ভয়ে এক বুড়ি তাঁর ব্যবহার্য জিনিষ-পত্র একটি পোটলায় বেঁধে দূরে পালাচ্ছিলেন। বুড়ির পোটলাটি বহন করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমতাবস্থায় মহানবী (দঃ) বুড়িকে দেখতে পান এবং তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চান যে সে কোথায় যাচ্ছে। বুড়ি তাঁর ভয়ের কথা মহানবী (দঃ) কে বলেন। এ কথা শুনে মহানবী (দঃ) বুড়ির পোটলাটি নিজের কাঁধে বহন করে বুড়িকে তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেন। বুড়ি অবাক হয়ে সেদিন মহানবী (দঃ) এর পরিচয় জানতে চান। উত্তরে মহানবী (দঃ) বলেন যে, তিনিই মোহাম্মদ। বুড়ি তাঁর পরিচয় পেয়ে অবাক বিষয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন যে, তুমিই মোহাম্মদ, এই কথা বলে সেই বুড়ি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে বিপদজ্জনক জিনিষ হচ্ছে মাদক! সে সময় মক্কাবাসীর নিকট মদ ছিল অতি প্রিয় বস্তু। এই মদকে আল্লাহপাক সেদিন নিষিদ্ধ করে আয়াত নাজিল করেন। সেদিন মক্কার মুসলমানেরা তাদের কাছে রক্ষিত সব মদ রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। মক্কার রাস্তা সেদিন তরল মদের

দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল। মহানবী (দঃ) এর জীবনী আজকে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত। যার নুরে বিদীর্ণ হয়েছিল গোমরাহি ও জাহেলিয়াতের অবিচার অত্যাচারের লু-হাওয়া পরিণত হয়েছিল তওহিদের শীতল হাওয়ায়, খুশির বারতা পৌঁছে গিয়েছিল দিকদিগন্তে। বছরের পর বছর ধরে যে আরব ভুমি তথা সারা বিশ্বে মানবতা পিপাসায় হাহাকার করছিল, তাদের ওপর বয়ে যায় রহমতের বারিবর্ষণ। যার সততা, নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, ন্যায় ও সাম্য থেকে বঞ্চিত মানবতার রুক্ষভুমি পূর্ণ হয়ে উঠে শ্যামল শোভায়, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির জন্মের সেই শুভমুহূর্তে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সবখানে।

সে সময় আরব সমাজে চরিত্র নষ্টকারী সকল প্রকার রীতিনীতি ও ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু কোন প্রকার ভোগ বিলাস ও নোংরা মুহাম্মাদ (সা:) কে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং ২৫ বছরের যুবক মুহাম্মদ (স:) ৪০ বছরের প্রৌঢ়া খাদিজা (রা:) কে বিয়ে করে সমসাময়িক যুব সমাজে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তৎপূর্বে খাদিজার বিপুল ব্যবসায়ের কর্মচারী হিসেবে তিনি বিশ্বাসীর আদর্শ স্থাপন করেন।

আবু বকর (রা:) এবং সমবয়সী আরো কিছু যবুকদের নিয়ে তিনি "আল হিলফুল ফুজুল" নামক একটি যুব সংগঠনের মাধ্যমে হজ্বের মৌসুমে দূরাগত মানুষকে পানি পান করানোসহ নানাবিধ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছোট-খাট ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা, মারামারি, হানাহানি প্রতিরোধ করা ইত্যাদি সমাজ সংস্কারমূলক কাজের প্রবক্তা হয়েও তিনি মক্কার সমাজ নেতাদের কাছে মর্যাদার আসন লাভ করেন এবং 'আল-আমীন' নামে আখ্যায়িত হন। কাবাঘর মেরামত কালে 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপনা নিয়ে মক্কার বিবদমান নেতাদের মধ্যে উদ্ভুত বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা মাধ্যমে তিনি মক্কার নেতাদের ওপর নিজের নেতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করেন।

পরিণত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত হযরতের জীবনের প্রতিটি বিষয়ই মানুষের জন্য অনন্য উদাহরণ। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর যত অভ্যাস ছিল সব এতই সুন্দর ছিল যে, সে বিষয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করা যায় ততই তা অনুকরণ যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। অন্যের বিরাগ বা ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে, এমন কোন কাজের নমুনা তাঁর জীবনে নেই। রসুলে করিম (স:) সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর উৎপাদন হারাম করেছেন, হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ করে সমাজে অপবিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সুদ ব্যবস্থা, অধিক লোভের আশায় খাদ্য মওজুদ রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিলাসিতাকে ঘৃণা করা হয়েছে। অমিতব্যয়ীকে 'শয়তানের ভাই' বলে কুরআন মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে বৈধভাবে উপার্জনের পর উপার্জিত সম্পদ বৈধ পন্থায় পরিবার, নিকট আত্মীয় ও রাষ্ট্রের হক আদায়ে ব্যয় করার বিধান দেয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ফারাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু ব্যক্তির মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধ ও সন্ধি নীতি সম্পর্কে রসুল (স:) যে মদিনা সনদ পেশ করে গেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা অম্লান হয়ে রয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল বিপক্ষের

আক্রমণকারী সৈন্য ছাড়া অন্য কাউকে আক্রমন না করা। সাধারণ নাগরিক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ফসলি জমি, ফলবানবৃক্ষ ইত্যাদির প্রতি হামলা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। অপর পক্ষ কর্তৃক সন্ধি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেননি। আদর্শ বিজয়ী হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে তাঁর দৃষ্টিতে তিনিই বিশ্বনেতার একমাত্র আদর্শ। পবিত্র কুরআন মজিদে তাঁর এই শান্তিকামী সর্বোত্তম চরিত্রের ঘোষণা করেছেন আল্লাহ পাক, "সমগ্র বিশ্বের জন্য শুধু রহমত হিসেবেই আপনাক প্রেরণ করেছি।"

একটি মানুষের জীবনের সমগ্র কর্মকান্ড উৎকৃষ্ট উদাহরণ হবে চরিত্রে। এই দিক দিয়ে রসুলে করিম (সা:) এর চরিত্রকে অনুসরণ করা আমাদের উচিত। তাঁর জীবন-কথা সম্পূর্ণভাবে খোলামেলা, কোথাও এতটুকুও গোপনীয়তা নেই। তাই তাঁর চরিত্রকে সর্বদিক দিয়ে জানারও কোন অসুবিধা নেই। বিচার-বিশ্লেষনে আমরা বুঝতে পারি যে রসুলে করিম (স:) অসম্পূর্ণ বিশ্বের সম্পূর্নকারী, মানবতার উত্তম উদাহরণ, আলোকিত মহান বার্তাবহ এবং শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারক।

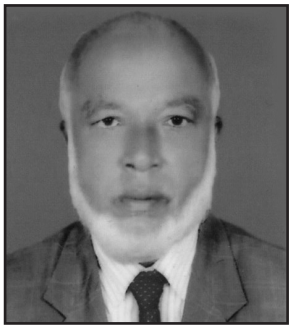

"অবসর জীবন এবাদতের শ্রেষ্ঠ সময়"

আলহাজ্ব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা
আ-২১০৬
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদত করার জন্য। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সমাজ, সংসার এবং সম্পদও দিয়েছেন। এর পরও আবার বলতে হয় আল্লাহ মানুষকে তাঁর এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমাজ, সংসার পালন করতে গিয়ে সম্পদের পিছনে ছুটতে গিয়ে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে, ক্ষমতাধর হওয়ার আশায় মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কর্মজীবনে/কর্মকালে/চাকুরীকালে বিভিন্ন কাজের চাপে প্রতিযোগিতার কারণে অনেক সময় ধর্ম-কর্ম স্মরণ থাকে না, সর্বক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরণ রাখতে পারেন না, যারা স্মরণ রাখে তারাই প্রকৃত মোমিন বান্দা।

কর্মকাল শেষে যখন গায়ের শক্তি কমে আসে তখন মানুষের মধ্যে মৃত্যু ভয় জাগ্রত হয়। চাকুরী হোক, ব্যবসা হোক, রাজনীতি হোক, সকল ক্ষেত্রেই একটা অবসর সময় আসে। বিশেষতঃ চাকুরীজীবীদের অবসরকালীন সময় বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং লক্ষনীয়। এই সময় কাজের চাপ থাকে না, লোভ লালসা কমে যায়; তাই মানুষ তখন আল্লাহর এবাদতের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে। চাকুরীকালে সব নামাজ সময়-মত পড়া যায় না, তাছাড়া মাথার মধ্যে সারাক্ষণ নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা খুরপাক খেতে থাকে। এসময় আল্লাহর এবাদত মনোযোগসহ খুব কম লোকই করতে পারে। কিন্তু অবসর জীবনে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর এবাদত করা যায়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় না। কারো কাছে কৈফিয়ত দেয়ার তেমন প্রয়োজন হয় না। মনে করা যায় যে আমার নির্দিষ্ট কর্মকাল শেষ হয়েছে সুতরাং এই অবসর কালটি আমার এবাদতের জন্যই আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই, সামনে ফাইলের স্তুপ নেই, বদলীর ভয় নেই, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ধমকের আশংকা নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ সময়টাই আমার এবং আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুমিন বান্দাদের শুধুমাত্র একটি ভয় যে কখন যেন আল্লাহর ডাক আসে, কখন যেন আযরাইল (আঃ) এসে বুকের উপর চেপে বসে এই আশংকা করে। তাই এ সময় আল্লাহর ইবাদত করতে কোন ঢাক ঢোল বাজনা দরকার নাই, দিলে আল্লাহকে স্মরণ করাই আল্লাহর এবাদত। আমার পীরকেবলাজান বলেছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে পবিত্র হওয়ার পরে নিজের বুকের বাম পাশে টিপলে বৃদ্ধাঙ্গুল ঠেকিয়ে যদি স্মরণ করা যায় যে আমার কলবে আল্লাহ আছে তাহলে আছেন। এর পর থেকে কলবে আল্লাহর জেকের চলতে থাকে।

জীবনের ৪টি বা ৫টি স্তরকে ভাগ করলে দেখা যায় যে শৈশব এবং কৈশরে মানুষ বা মানব শিশুরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানে না বা বোঝেনা। যৌবনে শরীরের শক্তি, সম্পদের লোভ ও ক্ষমতার মোহ মানুষকে পরকাল বা অনন্তকাল এর পরিণতি সম্বন্ধে জানতে বা উপলব্ধি করতে সুযোগ দেয় না। খুব কম সংখ্যক লোকই শুরু থেকে পরকাল সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে শেখে বা পারে। বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী মা এর গর্ভে থেকে কোরআন হেফজ করা শিখেছেন। আমার এক বন্ধু নবম শ্রেণি থেকে নামাজ পড়া শুরু করেছেন। জীবনে দাঁড়িতে ক্ষুর না লাগিয়ে দাঁড়ি রেখেছেন। আমি একজন সচিবের (ইরশাদুল হক) কাছে বসে দেখেছি তাঁর কাছে ১ ঘন্টা বসলে তিনি তার মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কর্মকথার মধ্যে ধর্মকথা নিয়ে আসতেন, পরকাল সম্বন্ধে জ্ঞান দিতেন। ভ্রমনকালেও কিভাবে নামাজ আদায় করা যায় তা তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এমন লোকের সংখ্যা কম। যৌবন পেরিয়ে গেলে বার্ধক্য যখন দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে, দুই একটা চুল পাকা শুরু করে, ঘরের গিন্নি স্বামীর যৌবনকে ধরে রাখার প্রয়োজনে রং দিয়ে চুল কালো করে দেয়। কিন্তু বার্ধক্য আসলে সব চুল সাদা হয়ে গেলে তখন পরকাল সম্বন্ধে কঠিন উপলব্ধি আসে। অর্থের মোহ কমে যায়, ক্ষমতার দাপট কমে যায়, সমাজ সংসারে নিজেকে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তখনই গভীর ভাবে উপলব্ধি আসে পরকাল সম্বন্ধে। মহানবী মোহাম্মদ (সঃ) মেরাজকালে বেহেশত ও দোযখ দেখার বা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ নেন। আমাদের মহানবীর সেই বর্ণনা হাদিস শরীফে যেভাবে এসেছে তা যারা শুনেছেন বা পড়েছেন, তারা পরকাল বা ঐ অনন্তকালের ভয়ে, আযাবের ভয়ে গভীরভাবে এবাদতে মশগুল হন, দিনের বেশীরভাগ সময় মসজিদে কাটাতে চেষ্টা করেন। চাকুরীকালে জামায়াত শুরুর দুই রাকাত পরে মসজিদে যাতায়াত করেছে। তারা এই অবসর সময়ে নামাজের বেশ আগেই মসজিদে গিয়ে নফল নামাজ বা দোয়া দরুদ পরে জেকের আসকার করে অনেক নেকী হাসিল করার চেষ্টা করে। যদি এর দ্বারা আল্লাহ অতীতের গুণাহগুলো মাফ করে দেন।

জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় যখন জানা গেল যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, কবর আযাব বা অন্ধকার কবর অবধারিত, সব বিচারকের বিচারক আল্লাহ তায়ালা নিজে সামনে আসবেন এবং মানুষের সামনে বসে বিচার করবেন। সেই বিচারে জান্নাত পাব এই আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে যেতে হবে এবং সেই তোহফা উপঢৌকন হল এবাদত।

ঠোঁট নাড়াতে হবে না, শব্দ করতে হবে না, শুধু কলবে খেয়াল রাখতে হবে। কোন হাকডাক নাই, শোর- গোল নাই সুতরাং কলবে আল্লাহকে স্মরণ করলেই যেকের হবে এবং এ যেকের নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে। হাদিস শরীফে আছে যেকের কলবকে পরিষ্কার করে এবং রাখে। পরিষ্কার কলবে শয়তান ভর করতে পারে না।

অন্য জায়গায় হাদিস শরীফে আছে একজন সাহাবা হুজুর পাককে জিজ্ঞাসা করলেন, গুণাহ কম হওয়ার উপায় কি? পেয়ারা নবী মোহাম্মদ (সঃ) জবাব দিলেন, সব সময় পবিত্র অবস্থায় থাকা। অবসর জীবনে মিথ্যা কথা বলা, মোনাফকী করা বা অসৎ কাজ করার সুযোগ কম এবং প্রয়োজনও কম, তাই দিলকে পবিত্র রাখা খুবই সহজ এবং পবিত্র দিলে যেকের চলতে থাকবে।

মসজিদে সময় কাটান, কোরআন তেলাওয়তে সময় কাটান মানুষকে এবাদতে মশগুল রাখুন। এ সময় কলব পরিষ্কার থাকে এবং ঐ কলবে আল্লাহ হাজির থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে, "জিন ও ইনছানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"। সুতরাং আমার এ দুনিয়ায় মূল দায়িত্ব আল্লাহর এবাদত করা।

চাকুরীকালে জামাতে নামাজ পড়া খুব কঠিন ব্যাপার। অফিসে কাজের চাপ, সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ভীড় এভাবে বিভিন্ন কারণে জামাতে নামাজ আদায় করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। হাদীস শরীফে আছে জামে মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করলে ৫০ গুণ সওয়াব এবং সাধারণ জামাতে পড়লে ২৭ গুণ সাওয়াব। সুতরাং কোন মানুষই বেশী উপার্জনের সুযোগ থাকলে কম উপার্জন করতে চায় না। তাই সবারই লক্ষ্য হওয়া উচিত জামে মসজিদে নামাজ আদায় করা। কিন্তু চাকুরীকালে এটা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই এটা পুষিয়ে নেয়ার সময় হল অবসর জীবন।

চাকুরীকালে কখনও এক রাকাত, কখনও দুই রাকাত বা চার রাকাত পুরো নামাজ জামাত পাওয়া খুব কঠিন। অবসর গ্রহণের পর পুরো সময়টাই নিজের। সুতরাং জামাতের দশ বিশ মিনিট আগে মসজিদে গিয়ে জীবনের বকেয়া কাজা নামাজগুলিও উমরি কাজা হিসাবে আদায় করা যায়। আমি মনে করি অবসরের পরে যে বাড়তি আয়ু আল্লাহ দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

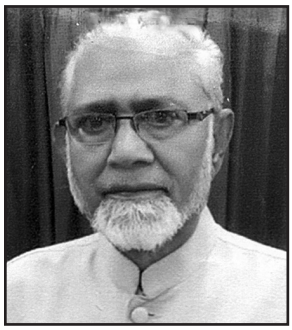

জীবনযুদ্ধ

মোঃ আব্দুর রশিদ আকন্দ
আজীবন সদস্য-৬১
ময়মনসিংহ জেলা সমীতি

-যুদ্ধে পরাজিত

কথায় কথায় সেদিন প্রসঙ্গ পাল্টাতে দুঃখ করে তারেক কথাটা বলছিল। অবসরপ্রাপ্ত তারেক আজকাল নদীর পাড়ে এসে প্রায়শঃই কেমন যেন আনমনা হাঁটে। বন্ধুবৎসল সামাজিক লোক বলে পরিচিত থ াকলেও ইদানিং কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। কথা বলে কম, মুখের হাসিটা চিনতে কেমন বেখাপ্পা ঠেকে। জীবন চলার পথে-তার নিজস্ব একটা দর্শন সামনে রেখে অতি সাদাসিধে ভাবে চলতে ভালবাসত। চলার পথে কোন কিছুতেই পিছনে যেতে চাইত না। পিছন মানে অতীত। সে অতীত উদাহরণ, কিন্তু বর্জনীয় নয়। সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মিলিয়েই জীবন। আর এই জীবন শুরু যুদ্ধের ময়দানে। মানব সৃষ্টির শুভলগ্ন দুটি প্রাণের মিলন যুদ্ধে। মায়ের অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে এল ডিম্বাশয়ের সঙ্গে শুক্রকীটের তুমুল যুদ্ধ পরাজিত ডিম্বাশয়। অতি সাদরে শুক্রানুকে বুকে টেনে নিল। এবার বেড়ে উঠার যুদ্ধ। একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে নব উল্লাসে কেউ আলোর জগতে ফিরে এল, কেউবা যুদ্ধে হেরে গিয়ে আলোর দেখা পেলনা। মনে মনে ভাবে এইতো জীবন।

আর জীবন যুদ্ধ! সে তো কম বেশী সবকিছুতেই আছে। যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধ, অধিকারের যুদ্ধ, ক্ষমতার যুদ্ধ, মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতার, বেঁচে থাকার জন্য রুজী রুটি রোজগারের, প্রেমের যুদ্ধ, দেশের সঙ্গে দেশের, আদর্শের সঙ্গে অনাদর্শের, আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে দেহের, আগুনের সঙ্গে পানির, মানবাত্মার সঙ্গে পাশবিকতার, ভালর সঙ্গে মন্দের, খেলার মাঠে জয় পরাজয়ের যুদ্ধ, কত যুদ্ধই না আছে? এর হিসাব কে রাখে? তবে হাদিস শরীফে বর্ণিত, (বোখারী শরীফ, ১ম খন্ড ১৪৪ পৃঃ) মানুষের অস্তিত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্থুলদেহ ও সূক্ষ্ম আত্মা। স্থুল দেহের এই ভৌতিক অভ্যন্তরে অর্থাৎ সূক্ষ্ম আত্মায় পাঁচ প্রকারের আত্মা রয়েছে। যথা ১ম-পশুর আত্মা; যা খাওয়া শোয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা, ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক করে। ২য়-হিংস্র জন্তুর আত্মা; এর দ্বারা হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ মারামারি, কাটাকাটি, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্ম দেয়। ৩য়-শয়তানের আত্মা; যার প্ররোচনায় পাপাচার, অহঙ্কার, মিথ্যা, কূটকৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোকা দেওয়া কুপথে পরিচালিত করার কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক করে। ৪র্থ-ফেরেশতা আত্মা; যা দ্বারা সদাচার, ন্যায়পরাণতা, সততা, পরোপকারিতা ও আল্লাহর আনুগত্য করা ইত্যাদির আকর্ষণ জন্ম দিয়ে থাকে। ৫ম-মনুষ্যত্বের আত্মা; এর কর্তব্য হচ্ছে ১ম, ২য় ও ৩য় আত্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং এদেরকে বশ মানিয়ে

ফেরেশতার আত্মার সদগুণাবলীতে পরিণত ও পরিচালিত করা।" তিনের বিরুদ্ধে একের যুদ্ধ!

প্রতিটি মানুষ অহোরাত্র এসব কু'তিন আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই বেঁচে আছে। তবে কেউ বিজয়ী আবার কেউ বা পরাজিত। এটাই নিয়তি এটাই নিয়ম, এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি একেবারেই অচল। জয় পরাজয় চলতে থাকবেই তবে এটা কোন বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। তারেকের যুদ্ধ সম্বন্ধে এত যে সাধারণ বিশেষণ, হঠাৎ করে আজকে যুদ্ধে পরাজিত বলে আফসোস কেন? করিম সাহেব কথাটা শোনার পর কেমন যেন ভাবছেন। অনেকের সঙ্গে তারেকের বন্ধুত্বের বাঁধনটা সামান্য শিথিল হলেও করিম সাহেবের গেরোটা আজও অটুট। তাই, তাঁর শুকনো গলার আফসোসটাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। করিম সাহেব দীর্ঘ সময় কাল বন্ধুত্বের আত্মীয়কে, নিঃস্বার্থভাবে আগলে রেখেছেন। নদীর পাড়ে হাঁটাহাঁটি করতে এসে দুজনের পরিচয়। বয়সের অসামঞ্জস্য তেমন নয়, দুজনেই ১৯৫৬ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে এসেছিলেন। এ পরিচয় পাবার পর আরও ঘন হয়ে কাছে এসেছেন। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাকুরীকালীন সময়ের নানাবিধ ফেলে আসা অম্লমধুর স্মৃতিচারণ করতে করতে নদীর পাড়ের সময়টা হেঁটেহেঁটে কাটিয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে পার্কের রেস্তোরায় রুটি ভাজি দিয়ে সকালের নাস্তার পর্বটা সেরে নেয়। দীর্ঘদিনের এই হাসিখুশী সঙ্গীটিকে আজকে এমন বিষন্ন দেখে করিম সাহেবের মন কেমন খচখচিয়ে উঠল। সময়ের স্রোতে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূতোটা ঢিলে হলেও তাঁর বন্ধুত্বটা আগের মতই পোখত রয়েছে। অতএব মনের টানেই হাতটা বাড়িয়ে একটা হাত ধরে সামনের বেঞ্চটায় দুজনেই বসে গেলেন। সামনে ব্রহ্মপুত্র নদ, স্রোতের যুদ্ধে আজ সে পরাজিত শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে অতি ক্ষীণ গতিতে বয়ে চলছে। কে বলবে, এই ব্রহ্মপুত্র একদা যুদ্ধং দেহী ভাব ধারণ করে দুকূল ছাপিয়ে, ভেঙ্গে গুড়িয়ে সুমুখপানে বয়ে যেত। কেমন যেন শুকনো মরা গাঙ, দুজনেই শুকনো নদীর চরা বালুর ময়দানে চেয়ে আছেন। দুটো লোক সবজির ভাড় কাঁধে নিয়ে নদীর চর পেরিয়ে শহরে আসছে। রোজগারের যুদ্ধে নেমেছে তারা। এই লাউশাক, ডাটাশাক, সরিষার ফুল, ডাটা ওগুলো সানকিপাড়া বাজারে নিয়ে আসবে, বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বাজার করে কিছু পয়সা রাখবে, আগামীদিনের ব্যবসার মালামাল কেনার জন্য। নদীতে পানি নেই বললেই চলে, তবু বালি ভর্তি ছোট ছোট নৌকা নিয়ে এঁকে বেঁকে যুদ্ধে নেমেছে মাঝিরা। বালির আড়তদার বসে আছে তাদের অপেক্ষায়। সারাদিন অপেক্ষার প্রহর গুণছে কখন আসবে দশতলা দালান নির্মাণের মালিক। জীবনের তাগিদে যুদ্ধেও শেষ নেই। অবচেতন মনে করিম সাহেবের মনে একটা আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে যুদ্ধে পরাজিত' কি?

- কি, তারেক সা'ব আজকে আপনাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছে, কিছু হয়েছে?

- না! এমনি, শরীরের বাঁধন ঢিলে হয়ে আসছে তো।

- তবু; কিছু একটা তো বটেই। এমনতো কোনদিন দেখিনি। তাই আর কি? বলে, আরও কাছে এসে বসলেন।

আচ্ছা, বলুনতো, জীবনের শেষ পৃষ্ঠায় কি যুদ্ধের দৃশ্য লেখা যায়?

- লেখা যায় না, তবে দেখা যায়, অনুভব করা যায়।

- সত্যি বলেছেন!

তারেক কি বলবে, তাঁর অনুভূতিতে যে যুদ্ধ লেগে আছে তা জয় করার কোন শক্তি তাঁর নেই। স্ত্রী রোকেয়া বেগম দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছে, এখন আর কোন ডাক্তার বদ্যিতে কাজ হচ্ছে না। শয্যাশায়ী হয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। ছেলেপেলেরা যে যার পরিবারের সুখ শান্তির যুদ্ধে অবতীর্ণ। প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় পিছনে থাকা চলবেনা। যুদ্ধের ময়দানে জিততে হবে। তবু ভাল সময়ে সময়ে মোবাইলে খোঁজ খবর নেয়, এটাই বা কম কিসে। ইদানীং ঘরকন্না কাজের কোন লোক পাওয়া খুবই দুস্কর, কেননা গ্রাম গঞ্জের মেয়ে ছেলেরা দল বেঁধে গার্মেন্টস ফ্যক্টরীতে কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। তারেকের জানামতে, অনেকেই বেঁচে থাকার যুদ্ধে এ কাজে নিজেই নামতে বাধ্য হচ্ছে।

অসুস্থ স্ত্রীকে ঘরে রেখে নদীর পাড়ে বেড়াতে আসা নেহায়েৎ প্রয়োজন, কেননা তাঁর ডায়াবেটিস সমস্যা। হার্টের সমস্যার কথা বলাই বাহুল্য। দুটো ব্লক নিয়ে কোন মতে বেঁচে আছে, এ বয়সে অপারেশন করে আর কি হবে, কে দেখাশুনা করবে। কোনমতে মাথা গুজার মত একটা বাড়ী করতে পেরেছিল। তবে মাস শেষে ইলেকট্রিক বিল, গ্যাস বিল, পৌরকর ইত্যাদি পরিশোধের জন্য অফিসে, ব্যাংকে ছুটাছুটি করতে হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে এ কাজটুকু যে কতটুকু বিড়ম্বনা যারা ভুক্তভোগী তারাই বুঝতে পারেন। এইতো সেদিন তাঁর বয়সী এক ভদ্রলোক ব্যাংকে বিল পরিশোধ করতে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আশে পাশে যারা ছিলেন তারাই আপন হলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রুষা করার পর কিছুটা সুস্থবোধ করলেন। জানা গেল ছেলে পেলেরা বড় বড় চাকুরে, এখানে দেখার কেউ নেই; অতএব বেঁচে যখন আছেন সাংসারিক যুদ্ধ তো করতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তারেক ভাবে সমাজের চেহারা তো এটাই। তবে তাঁর আজকের অনুভূতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ছেলে মেয়েরা সবাই কম বেশী নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। ঘরে স্ত্রী শয্যাশায়ী, সকালবেলা ঠিকা ঝি মরিয়মের মা এসে ঘর দুয়ারের ঝাড় মোছা, আর কিছু তরীতরকারী কাটাকুটি করে দেয়। বাকী কাজটুকু তারেক নিজেই সামলে নেয়। রুগ্না স্ত্রী হয়তো কোন সময় বিছানা থেকে উঠে এসে স্বামীর কাছে বসে অসহায় চোখে চেয়ে থাকে। ভাবে সারাটা জীবন সুখে-দুঃখে স্বামীর পাশে থেকে সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষায় বড় করে তুলেছে আর আজ! বিয়ে হয়ে এসেছিল সেই কবে, তাঁর বয়স তখন ১৪/১৫ বছর হবে। এরপর চল্লিশটা বছর চলে গেল স্বামীর মুখের এ চেহারা কোনদিন দেখেনি। সংসারের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব বা দৈন্যতা ছিল না। বাসার কাজের বুয়ার অভাব ছিল না, হরহামেশাই পাওয়া যেত। আজকে স্বামীকে দুটো ভাত রান্না করে খেতে হচ্ছে। অসহায় চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে রোকেয়া বেগমের গাল বেয়ে। মনের পর্দায় ভেসে উঠে, বিগত দিনগুলোর সংসার যুদ্ধে তাদের বিজয়ের কথা। তাদের ভাব ভালবাসার সংসারে কোন অস্বস্থি স্পর্শ করেনি। রান্নাঘরের দোর গোড়ায় রোকেয়া বেগম বসে দেখছে, স্বামী তাঁর রান্নায় ব্যস্ত।

- কি গো, কি রান্না করছ?

- এই আর কি, দুটো ভাত, একটু ডাল আর সিম সিদ্ধ দিচ্ছি, সিমের ভর্তা করবো।

- দুটো মানুষ, এত করার কি দরকার?

- না, তোমার হাতের পঞ্চব্যঞ্জন তো আর কপালে নেই।

এই বলে অবসন্ন দেহে, হতাশার দৃষ্টিতে স্ত্রীর করুণ মুখটার দিকে চেয়ে থাকে; কতক্ষণ। রোকেয়া বেগম চোখের পানি আড়াল করে আবেগঘন কণ্ঠে বলল,

- তোমারা খুব কষ্ট হচ্ছে? সবই কপাল।

কয়দিন যাবৎ স্বামীকে কিছু একটা বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না। কি বলবে, মাঝারী বেতনের কর্মকর্তা হিসাবে সরকারী অফিসে চাকুরী, ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করে গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে এসে সংসার যুদ্ধে নেমেছিল। আজ এই বুড়োমানুষটাকে বাজার করা থেকে আরম্ভ করে বাসার সব কাজই করতে হয়। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে, বেঁচে থাকাটা দুর্বিসহ মনে হয়। রোকেয়ার শূন্য দৃষ্টি, বুকে বলা না বলার যুদ্ধ, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে নড়ছে, তবু বলতে হবে।

ছেলেপেলেদের বউদের সংসারে বুড়ো বাবা-মা র উপস্থিতি তাদের পারিবারিক সুখ-শান্তি বিনষ্ট করতে পারে। অতএব, কদাচিৎ এসে কিছু ফলমূল, কিছু, টাকা পয়সা হাতে গুজে দিয়ে চলে যায়। লোকে কি বলবে, কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। সমাজে অনেক বুড়োবাবা মা এ ধরণের পারিবারিক রোগে যে আক্রান্ত নয়; সে কথা দিব্যি করে বলা যাবে না। তবে কেউ রোগটাকে কাষ্ঠ হাসির অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন, কেউবা যুদ্ধ করে রোগটাকে হারিয়ে দেন। এর ভিন্ন চিত্রও আছে, যেমন বুড়োমা বেঁচে আছে, বউদের সংসারে তাঁর যথেষ্ট প্রয়োজন। বুড়ো শ্বাশুড়ী নাতি নাতনিদের যত্ন আত্তিতে খুবই আন্তরিক হন। ভাগ্যিস যাদের বাবা বেঁচে নেই।

এতটা বছর ধরে স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে যাদের বড় করেছে, মানুষ করার পিছনে স্বামী স্ত্রী শ্রম দিয়েছে- রোকেয়ার ভাবনায় ছেদ পড়ল।

- কপালের দোষ দিয়ে কি লাভ বল? সবই আল্লাহর ইচ্ছে। তুমি আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত চেষ্টা করেছি, ফল যে পাওনি তা তো বলা যাবে না। কি ভাবছ?

- না, পিছন ফিরে তাকাতে মন চায়।

- অতীতকে দেখোনা। ও মালা শুকিয়ে গেছে।

ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে, স্ত্রীকে অতি আদরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে এল। আজকে রোকেয়াকে কেন আনমনা মনে হচ্ছে। চোখে মুখে একটা বিষন্নভাব। সারাটা জীবন যে ভালবাসা দিয়ে সংসার যুদ্ধে নেমেছিল আজ চোখের তারায় পরাজয়ের ছায়া কেন?

- রোকয়া, তোমাকে এমন লাগছে কেন? শরীরটা কি বেশী খারাপ লাগছে?

- না গো, তোমাকে একটা কথা বলব?

- বল না; কি হয়েছে?

- কামরুল এসেছিল।

- হ্যা এসেছিল; তা বেশ কয়দিন আগে।

যাবার সময় বললে, জমি জমা বাসা বাড়ী সব তাদেরকে ভাগাভাগি করে দিতে। আরও বলেছে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে।

কথাটা শুনে, তারেক খাটের কোণে স্ত্রীর পাশে বসে বললে,

- এই কথা ভেবে তোমার মন খারাপ? আরে পাগল, 'যো হোনাথা অহি হোগা' বুঝেছ! যুদ্ধ করবে ফলাফল দেখবে না।

জীবন শুরু থেকে তাদের ভাবনা ছিল, ছেলে মেয়ে বড় হবে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, নাতি-নাতনী সহ এক সাথে মিলে মিশে সুন্দর পরিবেশে দুটো চোখ বুজবে। আজ কি শুনছে। দু'জন দু'জনের দিকে নিস্পলক চেয়ে। জীবন সায়াহ্নে সংসার যুদ্ধে স্বামী স্ত্রী পরাজিত সৈনিক।

তারেক মনের সংকুচিত ভাবটাকে লুকিয়ে রেখে, ব্রহ্মপুত্র চরে মৃদু বাতাসে আন্দোলিত কাশফুলের ডগার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,

- সত্যি! করিম সাব; লেখা যায় না, বলাও যায় না। চলুন এবার উঠা যাক। বাসায় রোকেয়া একা আছে। কালের সাক্ষী হয়ে মরাগাছটা তারেকের মনের কথা শুনল কি শুনলনা কে জানে। আর কতই বা শুনবে তাঁর পাশে এমন গল্প নিত্যদিনেই কেউ না কেউ শুনিয়ে যাচ্ছে।

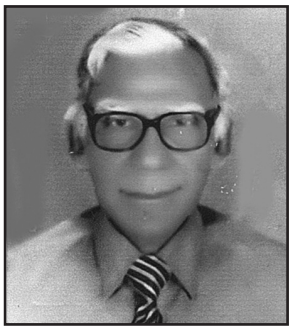

স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষা

প্রফেসর মুহম্মদ মোকাররম হোসায়েন
সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা সমিতি

অনেকটা প্রবাদতুল্য এবং অতি পরিচিত একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কথাটি হচ্ছে 'আমাদের গোয়াল ভরা গরু ছিল, গোলা ভরা ধান ছিল'। কথাটি ইঙ্গিতবহ। এটি আমাদের প্রাচীন প্রাচুর্যের কথা, সম্পদের কথা, বিত্তের কথা এবং স্পষ্ট করে বললে আমাদের স্বনির্ভরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, আমরা আমাদের স্বনির্ভরতা খুইয়েছি, হারিয়েছি এবং সমাজ ও জীবন ব্যবস্থাপনায় অকল্যাণ ও অমর্যাদার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করছি। আমাদের অতীত সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের প্রকৃতি কি ছিল তা পরিমাপ ও মূল্যায়নের হয়ত প্রয়োজন নেই। তবে একথা সত্য যে, আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বনির্ভরতার বিষয়টি উপলব্ধি করা এবং আমাদের সকল কর্মকান্ড সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করা আমাদের প্রধানতম কাজ।

আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন নিশ্চিত করা। সব কিছু প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে এমন রাষ্ট্রে। প্রতিটি নাগরিকের, প্রতিটি মানুষের যা যা প্রয়োজন তা সবই পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে এমন রাষ্ট্রে। নাগরিকের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যা ভাবা যায় তাঁর ব্যবস্থা থাকবে। সরবরাহের পথ অবারিত থাকবে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায়। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য চাই, আহার্য বস্তু চাই, এমন ব্যবস্থা সকলের জন্য থাকতে হবে। পরিচ্ছদের ব্যবস্থা থাকতে হবে সবার জন্য। পর্যাপ্ত পরিচ্ছদ ছাড়া সভ্য সমাজ কল্পনা করা যায় না। তেমনি ব্যবস্থা থাকতে হবে আবাসনেব। সেই সঙ্গে সুস্থজীবনের জন্য চিকিৎসা এবং আধুনিক জীবনের অপরিহার্য বিষয় শিক্ষা। এসবই হচ্ছে মৌলিক বিবেচনা। এসবের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরও নানা বিবেচনা আছে যা স্বনির্ভরতার জন্য আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে হবে। আধুনিক জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। একে সীমিত ভাবে দেখার অবকাশ নেই। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হলে তাকে প্রকৃত পক্ষে স্বনির্ভর বলা যাবে না।

একথা বলা যথার্থ হবে যে, ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা অর্জনের পরেই প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বনির্ভর হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিখেছি। এটি আত্মপোলব্ধির কথা। স্বাধীনতার যন্ত্রণা এমনি। নিজেদের চিনতে পারার যে সুযোগ তা স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গেই ঘটে যায়। স্বাধীনতার পর গত তিরিশ বছরে আমাদের পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্ধন হয়েছে এবং এখনও ক্রমাগত ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু যে স্বনির্ভরতার কথা আমরা গোড়া থেকেই ভাবতে শিখেছি তা এখনও আমাদের নাগালের বাইরে,

আয়ত্বের বাইরে। তিন দশক কালকে কম ভাবার অবকাশ নেই। সাহায্য, সহযোগিতা, দান-অনুদান প্রাপ্তি যথেষ্ট ঘটেছে। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে যে সাফল্য, যে অগ্রগতি, যে উন্নয়ন, স্বনির্ভরতার পথে যতটুকু পথ এগিয়ে যাওয়া যেত তা সম্ভব হয়নি। যে কথাটি বলা অনভিপ্রেত মনে হয় তা হলো স্বনির্ভরতা থেকে আমাদের অবস্থান এখনও বহুদুরে। সামগ্রিক বিবেচনায় এটিকে আমাদের ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক বাস্তবতা যা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে।

আধুনিক প্রচারযন্ত্রের যে দৌরাত্ম তাতে ব্যর্থতাকে, অযোগ্যতাকে ঢেকে রাখবার উপায় নেই। আমরা যে ব্যর্থ সে খবর আমরা নিজেরা জানার আগেই অন্যে জেনে যায়। প্রচারটা এমনি হয়ে যায় যে, সাফল্যের খবর কিছু থাকলেও তা কারুর নজর কাড়ে না। আমরা হয়ত বারবার নিজেদেরকে কটাক্ষ ও বিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত হবার সুযোগ করে দিচ্ছি অন্যদেরকে। ভ্রাম্যমাণ কত সংস্থা ওৎ পেতে আছে আমাদের অক্ষমতা, অদক্ষতা, অযোগ্যতাকে জানার জন্য। আমাদের অদক্ষতা বা অযোগ্যতা নিরাময়যোগ্য নয় তা বলা ঠিক হবে না। আমরা আন্তরিক হলে, নিষ্ঠাবান হলে, দায়িত্বশীল হলে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আমাদের স্বনির্ভরতার যে ভাবনা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের আবশ্যিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজনে। তা না হলে স্বনির্ভরতার পথ সুদূরপরাহত মনে হয়।

স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষাই যে সবচাইতে বড় কথা তা স্বীকার করতেই হবে। চোখ মেলে তাকালে যে দৃশ্যমান জগতের অভাবিতপূর্ব ছবি আমরা দেখতে পাই তা এক কথায় শিক্ষারই সৃষ্টি। শিক্ষাই সৃষ্টি করেছে এবং ক্রমাগতভাবে করে যাচ্ছে নানা পরিবর্তন, আয়োজন যা জীবনকে করছে আনন্দময়, উপভোগ্য। সব পরিবর্তনের, সব বিবর্তনের কলকাঠি শিক্ষা নেড়ে যাচ্ছে যা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে বোধগম্য মনে হয় না। আসলে সেটিই ঘটছে। শিক্ষাই বিকশিত করে মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত অসাধারণ ক্ষমতাকে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সহজাত ক্ষমতা আছে বিকশিত হবার অপেক্ষায় থাকে, শিক্ষার ছোঁয়া বা স্পর্শ পেলেই তা বিকশিত হবার পথ খুঁজে পায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষই হচ্ছে বিকশিত হবার পথকে প্রশস্ত করার। প্রত্যেক মানুষ আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। খুব অল্প সংখ্যক মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে যাদের মধ্যে এই সহজাত ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশের মধ্যে এই ক্ষমতা বর্তমান। এটিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষাই এই কাজটি করতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে উন্নয়ন বিষয়টি বহুল আলোচিত একটি বিষয়। উন্নয়ন মানেই ভাল জীবন, সুন্দর জীবন, বিকশিত জীবন, উপভোগ্য জীবন। উন্নয়নই হচ্ছে এমন জীবনের পূর্বশর্ত। উন্নয়ন আর শিক্ষা সমার্থক বলে বিবেচিত। বিবেচনাটা এমনি যে শিক্ষা মানেই উন্নয়ন, আর উন্নয়ন মানেই শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। শিক্ষার ছোঁয়া এমন সর্বত্র, সর্বগ্রাসী। শিক্ষা আমাদেরকে ভাবতে শেখায়, চিন্তা করতে শেখায়, উপলব্ধি করতে শেখায়। শিক্ষা সব পথ আগলে বসে আছে যেমনটি আগে ছিলনা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রয়োজন, শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন। ছোট ছোট সকল পরিবর্তন থেকে বৃহৎ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসংখ্য সুক্ষ্ম চিন্তা সক্রিয়। শিক্ষার মাধ্যমেই এগুলোক বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। তা না হলে এগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। তাই শিক্ষা দরকার,

শিক্ষার আলো দরকার, শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত শক্তির দরকার।

শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোথাও কোন উন্নয়ন ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। এ কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা চলে। আমরা অন্যদেশের দিকে তাকালেই একথার সত্যতা ও তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ হই। প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে যে সমস্থ দেশের গৌরব ও সাফল্য আমাদেরকে চমকে দেয়, বিস্ময়াভিভূত করে তা আসলে শিক্ষারই অবদান। এসব দেশে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাই এসব দেশে অসাধ্য সাধিত হয়েছে, গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। অব্যাহত রয়েছে তাদের সৃষ্টিশীলতা ও সৃষ্টি ক্ষমতার বৈচিত্রময় ধারা যার পেছনে রয়েছে শিক্ষার অপরিমিত শক্তি। ঐসব দেশে শিক্ষা যেখানে অবারিত, মুক্ত, বাধাহীন, সেখানে আমাদের শিক্ষায় সংকোচনের শেষ নেই। এতে উন্নয়নের চিত্রটি সহজেই অনুমেয়। ওদের সাফল্য, উন্নয়ন, অগ্রগতি তাদেরকে উন্নত, আনন্দময় জীবনের সন্ধান দিয়েছে। অপরদিকে আমাদের অনুন্নয়ন, অনগ্রসরতা আমাদের জন্য ক্রমাগত ভাবে পীড়াদায়ক, আনন্দময় জীবন তো দূরের কথা যে স্থান শিক্ষাকে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল তা আমরা দিইনি বা দিতে পারিনি। শিক্ষার পথকে আমরা অবিবেচকের মত ক্রমাগতভাবে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছি।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের চিন্তার পরিবর্তন দরকার। শিক্ষার দরজা সকলের জন্য খোলা থাকতে হবে। শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে না পৌছলে অন্ধকার দূর হবে না। অন্ধকার আমাদের ঘরে ঘরে, লোকালয়ে লোকালয়ে, অচিন্তনীয়ভাবে সর্বগ্রাসী। এ অন্ধকার দূর না হলে উন্নয়ন থেকে, অগ্রগতি থেকে আমরা দূরেই থেকে যাব। আমাদের এ অবস্থান যুগের পর যুগ, দশকের পর দশক ধরে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। আমরা এ অবস্থান থেকে মুক্ত হতে পারছি না যেটি আমাদের দরকার। আমাদের ৬০-৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর যা উন্নয়নের অগ্রগতির, স্বনির্ভরতার প্রধান অন্তরায়। এ অন্তরায়কে অপসারণ করা দরকার। আমাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেখানে নিরক্ষর সেখানে স্বনির্ভরতা অর্জনের আকাঙ্খা একটি অকল্পনীয় ব্যাপার।

স্বনির্ভরতা বহুমাত্রিক-একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বনির্ভরতা যত বেশী অর্জন করা যায় এবং যত বেশী ক্ষেত্রে অর্জন করা যায় ততই একটি দেশের জন্য গর্বের ও শ্রদ্ধার। তবে প্রথমেই ভাতের কথা ভাবতে হবে, চাল-ডালের খবরদারি করতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে আমাদের গত একশ বছরের যে ইতিহাস তা মোটেই সুখকর নয়। গত একশ বছরের মধ্যে প্রায় ৯০ বছরই খাদ্য নিয়ে আমাদের সংকটে থাকতে হয়েছে। দেশের মানুষের ভাত যোগাতেই আমাদের সরকারকে অনেক বেশী ভাবনায় পড়তে হয়েছে। দেন-দরবার, নানা দেশে ধর্ণা দিয়ে আমাদের দেশের সরকার মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়েছে। বিষয়টি বড়ই ভাবনার, বড়ই পীড়াদায়ক। গত দশ বার বছর ধরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলা যায়। তাই বলে স্বনির্ভরতা হাতের মুঠোয় একথা বলা যাবে না। খাদ্য আমাদের বহুগুণ বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসংখ্যার পাল্লাটা ত কম ভারী নয়। শতকরা ১.৫% হারে জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে। যে খাদ্য উৎপাদন বাড়তি তা বাড়তি জনসংখ্যার কুলোতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে করে বর্তমান যে অবস্থা তা পালটে যায়।

মনে রাখতে হবে ক্ষুধার্ত, অন্নহীন, বুভুক্ষু মানুষের কোন দাম নেই। আমাদের পরিচয়টা হয়েছে

এমনি যে এদেশে শুধু হাহাকার, শুধু নিরন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস। কথাটি ফেলে দেবার নয়, যদিও পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে আমাদের অবস্থান বহুগুণে ভাল। তাই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন অবকাশ নেই। আমাদের জনসংখ্যা এ শতকের গোড়া থেকেই বাড়তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখন যা তা হলো জনসংখ্যা উপচে পড়ছে, সব উন্নয়নকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, সকল উন্নয়ন কর্মসূচী মিথ্যে বলে উপহাস করছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ঘনবসতির যে চিত্রটি আমরা দিচ্ছি তা যে কোন উন্নত ও অগ্রগামী দেশের জন্য উদ্বেজনক মনে হবে। জনসংখ্যার দেশ ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, সবাইকে ছাড়িয়ে আমরা একেবারে এক নম্বরে। এ জন্যেই দারিদ্র ও নিরন্ন মানুষের দেশ হিসাবে আমরা সব সময়ই প্রথম কাতারে স্থান করে নিয়েছি।

আমাদের উর্বর জায়গা-জমি, মাঠ-প্রান্তর আছে যা আমরা উপযুক্তভাবে, দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পরি। জায়গা জমি থাকলেই তা শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হবে তা ঠিক নয়। তাই যদি হতো তাহলে কৃষি স্কুল, কৃষি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি ট্রেনিং সেন্টারের প্রয়োজন হতোনা। আমাদের বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এসবের গুরুত্ব যে কি হাড়ে হাড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সময় মত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না হলে শুধু মারাত্মক খাদ্য সংকট সৃষ্টি হতো তা নয়, বরং খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করতো। খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের যে প্রচেষ্টা চলছে তা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। আমাদের কৃষি শিক্ষার বিস্তারের ফলে আমাদের নিত্য নতুন সফলতা আসছে যা আমাদেরকে খাদ্যে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান আমলে যে খাদ্যশস্য এ অঞ্চলে উৎপাদিত হতো, বর্তমানে সেখানে তাঁর প্রায় তিনগুণ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তা এর ফলেই মেটানো সম্ভব হয়েছে। তা না হলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতো।

শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারছে উৎপাদনের নানা কৌশল ও টেকনিক। এগুলোর বিরোধিতাও মানুষ একসময় করেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিরক্ষর, অশিক্ষিত, দৈব-নির্ভর হলে যা হয়, আসলে তাই ঘটেছে। এখনও কোথাও কোথাও বিরোধিতা আছে আধুনিক শিক্ষার সাফল্য নিয়ে, বিজ্ঞানের নানা অবদান নিয়ে। পুরানো ধ্যান ধারণাকে মানুষ ছাড়তে চায়না তা যত মিথ্যেই হউক, অসত্য হউক, অকার্যকর হউক। বছরের পর বছর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা যে ধারণায় উপনীত হন তা সাধারণ্যের মনে গ্রহনযোগ্য হতে মোটেই সহজ হয় না। এর প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এখনও শিক্ষার আলো থেকে দূরে। অজ্ঞানতার আছর, এত বেশী যে তারা সত্যকে জানতে আগ্রহী হয়না। তাদেরকে শিক্ষার গন্ডীর মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের শুধু উপরে উপরে, ভাসাভাসাভাবে উপলব্ধি করলেই হবেনা। তা বাস্তবায়িত করতে হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এ কাজটি আমাদের হয়নি এবং এখনও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। যত তাড়াতাড়ি এটি বাস্তবায়ন করা যায় ততই মঙ্গল। যে ভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে আমাদের পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হবে। এখন ত একটা পর্যায়ে আমরা পৌছেছি। কিন্তু জনসংখ্যার বিষয়টিত থেমে নেই। সামনের দিনের চ্যালেঞ্জকে তাই অনেক গুরুত্ব সহকারে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। খাদ্যে স্বনির্ভরতার আরও নানাদিক আছে যেগুলি আমাদেরকে ভাবতে হবে। কার্বোহাইড্রেট ত আছেই। তাঁর সঙ্গে আমিষ-

নিরামিশের বৈচিত্রময় যেসব দিক আছে সেগুলো মোটই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক-বাহক। খাদ্যে নানা মাত্রা যোগ করতে হবে তা হলেই না তা হবে আকর্ষণীয়, আস্বাদনের জন্য উপাদেয়। পরিমাণগত আর গুণগত উভয় বিবেচনাই আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। সুস্থ, সবল সুন্দর জীবনের এসবের কথা আমাদের ভাবতে হবে। স্বনির্ভরতা এরও অঙ্গীভূত। আমাদের এমন মানুষ চাই যারা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, নিজের জন্য যেমন সক্রিয় তেমনি অন্যের জন্যও। দূর্বল, অসুস্থ, প্রাণহীন মানুষ উন্নত সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে পারে না। আমাদের সেই স্বনির্ভরতা প্রয়োজন যাতে করে আমাদের মানুষ মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বহুকাল আগে আমাদের সম্পদ ছিল, প্রাচুর্য ছিল এবং গোলাভরা খাদ্য ছিল যে কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর সত্যতা নিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় তখন যখন আমরা জানি যুগে যুগে বিদেশীরা দলে দলে এদেশে পাড়ি জমিয়েছে। সে সময় চলাচল বিপদসঙ্কুল ছিল। কিন্তু পথের কোন বাধাই তাদেরকে ঠেকাতে পারেনি। কেউ এসেছে উত্তাল-প্রমত্ত সমুদ্র পথে, আবার কেউ স্থল পথে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের প্রাচুর্যের, খাবার সহজ প্রাপ্তির এমনি সুখ্যাতি তাদের জানা ছিল। এদেশে এসেছে ইংরেজ, এসেছে ফরাসী, এসেছে ডাচ, এসেছে পর্তুগীজ। এছাড়াও আছে তুর্কীরা ও অন্যান্য জাতির লোকেরা। সবার নজর ছিল বাংলার গোলাঘরের দিকে। তাই এরা এসেছে, কোথাও বসতি গেড়েছে, কলোনী করেছে। লক্ষ্য এদের ছিল গোলাঘর লুটপাট আর সম্পদ পাচার। তা এসব লোকরা ঠিকই করেছে। আমাদেরকে সম্পদহীন করার প্রচেষ্টায় এরা যে সফলকাম হয়েছিল তা ইতিহাস থেকে জানা যায়।

শিক্ষা ছাড়া স্বনির্ভরতা অর্জিত হবে না। আমাদের রপ্তানির কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো আমদানি বন্ধ করা যদি ও বিশ্বায়নের যুগে হিসেব নিকেশটি অন্যরকম। আমরা যদি স্বনির্ভর হই অর্থাৎ আমাদের যা প্রয়োজন তা উৎপাদন করতে সমর্থ হই তা হলেই ত দেশের চেহারা পাল্টে যাবে। এই মুহূর্তে আমরা সব টাকাই আমদানিতে খরচ করছি। স্বনির্ভরের দর্শন হচ্ছে এই প্রবনতাকে রোধ করা যেটা হয়তো কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। আসল কথা হচ্ছে শিক্ষাকে সবার কাছে পৌছে দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন আরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে সকল শিশুকে শিক্ষার গন্ডীর ভেতর ঢোকানো যায়। আমাদের ৬০ লক্ষ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় যে বিদ্যালয় তা হয়ত আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা অন্যখানে। এদের সবাইকে ত ধরে রাখার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত কঠিন। অভাবী বাবা-মা এমনিতেই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়না। এটি শিশুর জন্য যাই হউক, বাবা-মার জন্য শাস্তি স্বরূপ। ঘরের টুকটাক কাজ করার দায়িত্বটি বাবা-মা বিদ্যালয়গামী শিশুর কাঁধে দিয়ে নিশ্চিত হতে চায়। শুধু টুকটাক বললে ভুল হবে। ছোট ভাই বোনর যত্ন-আত্তি এবং বাবা, মার, নানা সেবাও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানারে বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তি বা খাদ্য প্রাপ্তির যে সব পদক্ষেপে সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এটাই শেষ কথা নয়। এটাকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আমাদের অনেক মহৎ পরিকল্পনা নানা অসাধুতার কাছে, কপটতার কাছে পরাভূত হয়। ফল তাই আশানুরূপ হয় না। কর্মসূচী পরিত্যক্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। আমরা যাদেরকে সাধু বলে জানি

তাদের পরিচয় যখন ভিন্ন হয় তখন প্রতিকার আমরা কার কাছে প্রত্যাশা করবো?

আমাদের শিক্ষার দূর্বলদিকগুলো সনাক্ত হওয়া প্রয়োজন যথাযথভাবে এবং নির্ভরতার সঙ্গে। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ যে শিক্ষার অধিকারী আমরা হইনা কেন তাকে কাজের হতে হবে, অর্থবহ হতে হবে এবং জীবন -চেতনার সন্ধান দিতে হবে। বাঁচা-মরার যে নানান প্রশ্নের সঙ্গে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে মুখোমুখি হই তাঁর উওর শিক্ষা থেকেই পেতে হবে। কর্মের সঙ্গে যদি শিক্ষার সংযোগ না থাকে তাহলে তা দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রশ্নই উঠেনা। বিশাল আমাদের কর্মক্ষেত্র, সমস্যা আমাদের সীমাহীন। শিক্ষাকে তাই কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে পেতে হবে। মান্ধাতার আমলের ধ্যান ধারণা যদি আমাদের শিক্ষা সঞ্চারণ ঘটায় তাহলে তা দিয়ে জীবন বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। আমাদের শিক্ষার বড় একটি অংশ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা বলে। এখানে আমরা বড় তাত্ত্বিক। অদৃশ্য, অলৌকিক নানা ধারণা আমাদের বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বাস্তবতা বর্জিত ধ্যানধারণা দিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া যায় না। এতে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর 'জ্ঞান কেতাব' সর্বস্ব থেকে যায় যা প্রকৃত পক্ষে কোন কাজে আসে না। শিক্ষাকে ধারালো হতে হবে, জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত হাতিয়ার হতে হবে। তাহলে তা দিয়ে এগুনো যাবে। তা না হলে আমাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থীর মনে হতাশার কারণ এখানেই। শিক্ষা তাদেরকে সামনে এগুনোর নির্দেশনা দিতে পারছেনা। শিক্ষা যদি ভোতা ও মরিচা ধরা অস্ত্রের মত হয় তাহলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, হতাশার সংকেত। এমনটিই এখন ঘটছে অনেক শিক্ষার্থীর জীবনে।

যে সমস্ত দূর্বলতা আমদের শিক্ষাকে গ্রাস করছে তাঁর কথা ভাবতে হবে সর্বাগ্রে। শিক্ষা মানে যে যথার্থ শিক্ষা নয়, প্রকৃত শিক্ষা নয়, উপযুক্ত শিক্ষা নয় তা কমবেশী সবাই আমরা অবহিত আছি। প্রয়োজন ও চাহিদার বিবেচনায় শিক্ষাকে খাটো করে দেয়ার অবকাশ নেই। শিক্ষার সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের দায়িত্ব পালন যদি আদর্শ ভিত্তিক না হয় তা হলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন যথার্থ হবে না। শ্রেণীভিত্তিক ক্লাস পরিচালনা যদি যথাযথ হয়, গবেষণাগার, লাইব্রেরীতে শিক্ষার্থীর অবস্থা দৃঢ় ভিত্তিক হয় তাহলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ, জীবনের সঠিক নির্দেশনা পাবে। বর্তমান অবস্থায় আমরা সেটা নিশ্চিত করতে সমর্থ হচ্ছি কি? কাউকে একাই সকল দায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করতে হবে না। তবে আমাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীকে গতিশীল হতে হবে, কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। হতাশায় হাবুডুবু খেলে সে শিক্ষা নিয়ে লাভ কি? প্রায়োগিক শিক্ষার কথা আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই। কর্ম যেন আমাদের বিষয় নয় এমন ধারণাই আমাদের মগজে এবং চিন্তায় সক্রিয়। কেতাবী শিক্ষার সর্বনাশা প্রভাব আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মাঠঘাটের তাবৎকর্ম কৃষক করবে, শ্রমিকেরা করবে। আমরা অফিসে বসে ফ্যানের হাওয়া খাব, কলম চালাবো, নথি দেখবো, মোসাহেবী করবো আর প্রয়জোনে অপ্রয়োজনে বড় বড় কথার বুলি কবচাবো। কর্মের যে বিশাল জগত আছে তাঁর প্রতি একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর প্রবল বিতৃষ্ণা। এটাই হচ্ছে আমাদের অদ্যাবধি শিক্ষালব্ধ চেতনা। আমাদের এ শিক্ষার পরিবর্তন দরকার। কর্মের সঙ্গে এর সং যোগ ঘটানো দরকার। কর্মকে মর্যাদার চোখে দেখতে হবে,

শিখতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে শিক্ষার্থীকে কিভাবে কর্মের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়া যায়। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধ্যান ধারণা, যে দর্শন লালিত হচ্ছে তা দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন সাধ্য বলে মনে হয় না। আমাদের শিক্ষাকে একবিংশ শতকের উপযোগী হিসাবে তৈরি করতে হবে।

স্বনির্ভর কথাটিকে আমাদেরকে অবশ্যই আপেক্ষিক অর্থে মেনে নিতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন একবিংশ শতকে কোন দেশই একশ ভাগ স্বনির্ভর হতে পারে না। আজকের পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কারও মুখ দেখবোনা, কারও সাথে যোগাযোগ রাখবোনা, কারও সাথে কথা বলবনা এমন অবস্থার কথা ভাবা এখন অসম্ভব। সব দেশই স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আবার সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক বন্ধনে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মৈত্রীতে আবদ্ধ। তবে যে অর্থে স্বনির্ভরতা আমাদেরকে বুঝতে হবে তা হচ্ছে কথায় কথায় যাতে আমাদেরকে হাত পাততে না হয়, অপরের দ্বারস্থ হতে না হয়।

স্বনির্ভরতা আমাদের অর্জন করতেই হবে। আমরা সম্মান চাই, মর্যাদার আসন চাই, নিজস্বতার স্বকীয়তার গর্ব করতে চাই। জাতি হিসেবে কেউ হেলোফলা করবে এটি কাম্য হতে পারে না। যারা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আমরা তাদের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে চাই। অখ্যাত-অজ্ঞাত অনেক দেশ আমাদেরকে পেছনে রেখে অনেক সামনে এগিয়েছে। খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। এদের নাম-ঠিকানা কারুর জানা ছিল না। স্বনির্ভরের চেতনা এদের তাড়িত করেছে। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যে ত্যাগ, পরিশ্রম, করা দরকার তা করতে এরা কুণ্ঠিত হয়নি। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে যে ঘটনাটি এসব দেশে ঘটেছে তা শিক্ষার আশ্চর্যজনক সম্প্রসারণ। শিক্ষার আলোক পেয়েছে বলেই এসব দেশের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে, উজ্জীবিত হয়েছে। শিক্ষা না হলে এটি সম্ভব হতো না কোনদিন। স্বনির্ভর সকল দেশেই একই ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের বার বার ভাবতে হবে। স্বনির্ভর কাজটি কোন একটি দলের কাজে নয়, কোন এলাকার বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাজ নয় বা যারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে তাদের কাজ নয়। এ কাজটি করতে হলে সকল মানুষের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। দেশকে স্বনির্ভর করার আকাঙ্খা সকল মানুষের ভাবনার মধ্যে আনতে হবে। প্রত্যেকেই যেন ভাবতে শিখে দেশকে গড়তে হবে, স্বনির্ভর করতে হবে, পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে, অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে। সকল মানুষকে একাত্ম, একীভূত করার জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা পেলেই করণীয় কি কাজ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। অন্য কোন ভাবেই তা সম্ভব নয়। স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের উত্তরণ ঘটাবো, আর জাতীয়ভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের পরিচয়কে, অবস্থানকে সংহত করবো। এজন্য শিক্ষাই হবে আমাদের শক্তির উৎস, প্রেরণার উৎস, উজ্জীবনের মূলমন্ত্র। শিক্ষাই দেবে আমাদেরকে 'সাহস বিস্তৃত বক্ষপট'।

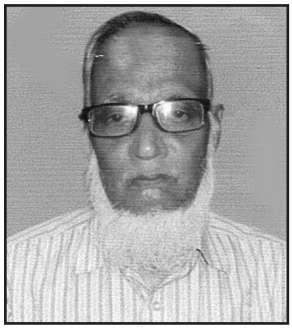

বার্ধক্যের বিড়ম্বনা

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
আজীবন সদস্য
ময়মনসিংহ জেলা শাখা

বৃদ্ধ বয়সে বিভিন্ন ধরণের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এই প্রবন্ধে বার্ধক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিড়ম্বনা নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

পারিবারিক বিড়ম্বনা: সব পিতা-মাতাই সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য আজীবন চেষ্টা করে থাকেন। সন্তানের সুখের জন্য অনেকেই চাকুরীর পাশাপাশি সকাল-বিকাল প্রাইভেট টিউশানি করেও অতিরিক্ত উপার্জনের চেষ্টা করে থাকেন। সেই পিতা-মাতা অবসর গ্রহণ করার পর অবহেলার পাত্র হয়ে যান। বৃদ্ধ বয়সে অনেক পিতা-মাতা কে সন্তানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তখন অনেক ছেলে সন্তান স্ত্রীর প্ররোচনায় মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহারও করে থাকে। অথচ মা-বাবা কম খেয়ে কমপক্ষে ছেলেমেয়েদের সুখের জন্য কষ্ট করে থাকেন। আমাদের সমাজে প্রত্যেকেই ছেলে সন্তানের আশা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই মা-বাবার সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। এজন্যই হয়তো এ প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে :

Your son is your son until he marries,
But your daughter is your daughter until she dies

এমনও দেখা গেছে মা-বাবা তাঁর শেষ সম্বল জমি-জমা বিক্রি করে সন্তানের লেখাপড়া করিয়েছেন। সেই ছেলে ভাল চাকুরী করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু মা-বাবার যত্ন নেয় না।

আমার জানা একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। তা হলো কোন এক বাবা তাঁর ছেলের লেখাপড়ার খরচের জন্য স্ত্রীর গহনা বিক্রি করেন জমি বিক্রি করে দেন। সেই ছেলে লেখাপড়া শেষে চাকুরী করে স্ত্রী-সন্তানসহ শহরে বসবাস করতে থাকে। দীর্ঘদিন সে গ্রামে তাঁর মা-বাবার কোন খোঁজ-খবর নেয় নাই। দীর্ঘ ৩০ বছর পরে খেয়াল হলো গ্রামে গিয়ে মা-বাবার খবর নিতে। বাড়ীর কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে তাঁর বাবা শেষ বয়সে অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা করে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। আর তাঁর মা এখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায়। অনেক ইতস্তত করে শেষে বাড়িতে গিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে মা বলে ডাক দিতেই তাঁর মা বলে উঠলেন, 'আয় বাবা আয়, তোর জন্যই হয়তো বেঁচে আছি', এই বলে অন্ধ মা তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন। কিছুদিন পর তিনিও মারা যান। এই হলো আমাদের পারিবারিক জীবন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেক ছেলে তাঁর স্ত্রীর

তোয়াক্কা না করে বৃদ্ধ মা-বাবার যত্ন নিয়ে থাকে।

সামাজিক বিড়ম্বনা: এক সময় ছিল তখন বলা হত 'Old is Gold' কিন্তু এখন যৌথ পরিবার প্রথা না থাকাতে বৃদ্ধদের তেমন সেবা-যত্ন করা হয় না। যানবাহনে যাতায়াতের সময় প্রায়ই বিভিন্ন ধরণের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। সেদিন অটোতে উঠে বাসায় যাচ্ছিলাম। কিছু দূর যেতেই ২ জন মহিলা যাত্রী অটোর কাছে আসতেই চালক আমাকে বলল 'চাচা, সম্মুখের সিটে আসেন'। আমি বললাম, 'সম্মুখে ড্রাইভিং সীটে আসবো কেন এর চেয়ে বরং নেমে যাই। তখন সে বললো, ঠিক আছে বসেন'। আমি বললাম, মুরুব্বীদের সম্মান করা উচিত'।

একদিন অবসর সমিতি অফিসে যাওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়ানো রিক্সাওয়ালাকে বললাম 'রাজবাড়ীর পিছনে (অবসর সমিতি অফিসে) যাবে' ঐ সময় এক যুবক কিছু না বলে রিক্সায় উঠে বসল। সে বলল, পরে আসেন চাচা, এ কথা বলেই সে রিক্সা নিয়ে চলে গেল। আমি অবাক দৃষ্টিতে রিক্সার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সময় কোন মুরুব্বী রিক্সার জন্য অপেক্ষা করলে আমরা তাকে আগে রিক্সার ব্যবস্থা করে দিতাম।

এখন সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে যারা বিভিন্ন ধরণের বিড়ম্বনার স্বীকার হোন তাদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই। ৫৯ বছর বয়সে সরকারি চাকুরী থেকে অবসরে যেতে হয়। বেসরকারি চাকুরীতে এই বয়স সীমা ৬০-৬৫ বছর। কিছু সংখ্যক উচ্চবিত্ত ছাড়া সকলকেই অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। দীর্ঘদিন পর ২০১৫ সনে চাকুরী জীবীদের বেতন ভাতা শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেয়া হয় নাই। দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর সরকারি চাকুরী করে যারা অবসরে গেছেন শেষ বয়সে তারা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনীর সমস্যা, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অথচ তাদের চিকিৎসা ভাতা মাত্র ১৫০০/- থেকে ২৫০০/- করা হয়েছে। এই টাকা তাদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়। এই ব্যাপারেও সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও চিন্তা করা প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন জেলা অবসর সমিতির সাথে জড়িত থেকে এবং ৫ বছর যাবৎ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা যায় পারিবারিক পেনশনারের সংখ্যা প্রায় ৪০% অথচ পারিবারিক পেনশনারের ক্ষেত্রেও দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীরা আজীবন পেনশন পান। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুরপর স্বামী বা তাঁর প্রতিনিধিরা ১৫ বছর পেনশন পায়। কেন্দ্রীয় সমিতি অফিস ও এজি অফিস থেকে বলা হচ্ছে যে, এক্ষেত্রেও আজীবন পেনশন কার্যকর হয়েছে। কিন্তু একাউন্টস্ অফিস থেকে বলা হচ্ছে, তারা কোন অর্ডার পাননি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশনারের সংখ্যাও অনেক। কাজেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর যারা পেনশনার হয়েছেন তারাও নিয়মমাফিক আজীবন পেনশন পাওয়ার দাবীদার। পরিশেষে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারের আরও অধিক সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মানবতার সেবায় ইসলাম

রওশন আরা কবির
সদস্য নং-২৫২২
কেন্দ্রীয় সমিতি

ইসলাম একটি সহজ সরল সাবলীল, সুন্দর পবিত্র জীবন ব্যবস্থার নাম। শান্তি, শৃঙ্খলা ও মানবতার সেবার ধর্ম ইসলাম। পক্ষান্তরে মানবতার সেবা বিরোধী সকল কর্মকান্ডকে ও চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে সৎ ও উত্তম গুণাবলী অর্জন করে সেই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে। আব্দুলাহ ইবনে আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ " হে কাবা তুমি মহান, হে কাবা তুমি মহান, হে কাবা তুমি মহান, তবে তোমার চেয়ে আরও একটি মহান জিনিষ আছে, সেটা হলো মানবতা।"

মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড যেমন- অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, মারামারি, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, ব্যভিচার, হত্যা, অশান্তি এ জাতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পাক কোরআনে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তেমনি শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বিপদে-আপদে একে অন্যকে সাহায্য করা, সেবা করা, সংকটের মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়াতে, দরিদ্রকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে যুগে যুগে নব রসুলের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, রোগীর পরিচর্যা কর এবং মজলুমের উপর তোমরা জুলুম করবে না," আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুলাহ (সঃ) বলেছেন- "তোমরা ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালিম, কিংবা মজলুম হোক"। এক ব্যক্তি জানতে চাইলেন- হে আল্লাহর রাসুল মজলুমকে তো সাহায্য করবো কিন্তু জালিম কে সাহায্য করবো কিভাবে ? তিনি বললেন, জুলুম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করাই তাকে সাহায্য করা। একজন মুসলমানের উপর যদি কোন দুঃখ দুর্দশা, জুলুম আসে, তবে প্রত্যেক মুসলমানেরই সেজন্য দুঃখিত ও প্রতিকার করা কর্তব্য। নবীজী বলেন- মুমিন ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া, বন্ধুত্ব ভালোবাসা ও কোমলতার ব্যাপারে যেন একটি দেহের মতো। (যেমন দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা শরীরই অসুস্থ ও জরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে (বুখারী মুসলিম)। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে উলেখ করেছেন- তাকেই বেশী পছন্দ করেন যে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- "আমি নবী করিম (সঃ) এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনও আমার কোন ত্রুটিতে আমাকে লজ্জা দেননি (বুখারী শরীফ)"। সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল উমারী (রাঃ) আবু মুসা থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবোয় কিরাম জিজ্ঞেস করলেন-"ইয়া রাসুলুলাহ, ইসলোমর কোন কর্মটি উত্তম"? তিনি বললেন, "সেই সত্যিকার মুসলমান যারা জিহ্বা ও হাত থেকে নিরাপদে থাকে" (বুখারী শরীফ)। নবী করিম (সঃ) আরও বলেন- "তুমি

আহার্য দান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম করবে" (বুখারী শরীফ)। তিনি বলেন- তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তাঁর ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পর্যন্ত করবে (বুখারী শরীফ)।

ইসলাম ধর্মে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, ইয়াতিম ও বিধবার হক আদায় করা, পাড়া-প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ধরণের সকল কাজই হলো মানবতার সেবা করা। যারা তা রক্ষা করে না তারা অবশ্যই কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। "রাসূলুলাহ (সাঃ) আরও বলেছেন "তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইহকালে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।"

আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমদের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য কোরআন ও হাদীসে বার বার বিশেষ ভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহর পাক কালামে উল্লেখ করেছেন- "সত্যিকার ধর্ম পরায়ণ তারাই যারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে গরীব আত্মীয় ও ইয়াতিমকে দান করেন। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ ও পরকালের শাস্তি পেতে হলে অসহায় দরিদ্র ও ইয়াতিমের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। বিশেষ করে ইয়াতিমের ভরণ-পোষণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সমাজের ধনী ব্যক্তিদের অসহায় ইয়াতিমদের প্রতি অবশ্যই অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যারা জীবন সংগ্রামে ব্যর্থতার সম্মুখীন, দারিদ্রের কষাঘাতে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাদের অধিকার রয়েছে প্রতিটি ধনী মুসলমানদের সম্পদে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ধনীদের ধন-সম্পদে ইয়াতিম ও বঞ্চিতদের হক ও অধিকার রয়েছে (সুরা যারিয়াত)। ইসলাম ধর্মই সর্ব প্রথম ইয়াতিম, মিসকিন, দুঃস্থ বিপদ গ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। ইয়াতিম কে দান করলে ধন-সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়।

হাদীসে রয়েছে- 'কোন ব্যক্তি যদি হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ দান করে এবং সেই দানকৃত বস্তু যদি একটি খেজুর পরিমান হয়, তবে আল্লাহ তাকে পাহাড় সমান নেকী দেবেন'। মহানবী (সাঃ) বলেছেন- 'মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যে ঘরে ইয়াতিম রয়েছে এবং তাঁর সাথে ঐ ঘরের সদস্যরা ভাল ব্যবহার করে। আর মন্দ ঘর সেটি যে ঘরে ইয়াতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়'। আল কুরআনে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায় ও জুলুম করে ভোগ করাকে দোযখের অগ্নি ভক্ষণ তুল্য বলে ঘোষনা করা হয়েছে। 'ইয়াতিমের সম্পদ আমানত স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, ইয়াতিমের প্রতি লক্ষ্য রাখ যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং যতদিন না তাদের নিজের ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান হয়'। মনে রাখতে হবে তাদেরকে পিতা-মাতার স্নেহে লালন-পালন করতে হবে। তবেই হবে মানবতার সেবা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী করিম (সাঃ) প্রদর্শিত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ধর্মে সকল জাতির সকল শ্রেণীর পূর্ণ শান্তির ও নিরাপত্তার বিধান রয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে ইসলাম ধর্মে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

আমাদের আশে-পাশে যারা বাস করেন তারাই প্রতিবেশী। আপনার আমার সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তারাই প্রথম এগিয়ে আসবেন। কোন বিপদ হলে, অসুস্থ হলে তারা সেবা যত্ন করতে

এগিয়ে আসেন। বিয়ে শাদী বা যে কোন অনুষ্ঠানে তারা যেমন এগিয়ে আসবেন তেমনি আপনাকেও সহাযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

প্রতিবেশী কারা এ সম্পর্কে নবী করিম (সাঃ) এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন- "সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী, ইসলামে যে সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে প্রতিবেশীর অধিকার, চতুর্থ স্তরের হলেও এর প্রতি অধিক মাত্রায় তাগিদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ ঘোষণা করেন- "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করবে না। আর মাতা-পিতা, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, কর্মস্থলের সহকারী, প্রতিবেশী, যাতায়াতের পথে সহচর ও সফরসঙ্গী প্রত্যেক্যের সাথে সদ্বব্যবহার করবে। আমাদের প্রতিবেশীগণ পরস্পর পরস্পরের আমানত স্বরূপ এ আমানত আপ্রাণ চেষ্টায় রক্ষা করা উচিত এবং কোন অবস্থাতেই প্রতিবেশীর অনিষ্টের কারণ হবে না, বরং একে অন্যের জানমালের হেফাজত করবে। এটাই ইসলামী সমাজ জীবনের বিধান ও মানবতার ধর্ম। প্রতিবেশী যে কোন পর্যায়ের হোক না কেন,অথবা যে কোন জাতিরই হোক না কেন, সকলের প্রতিই আল্লাহর সেজন্যমূলক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা প্রতিবেশীর হক আদায় করে না তাদের সম্পর্কে নবীজী (সঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তাঁর অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা পায় না সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশস্তে যাবার অধিকার হারাতে হবে। কাজেই তা হবে কবীরা গুণাহ। প্রতিবেশী সৎ কাজে সাহায্য চাইলে সাহায্য করতে হবে। অভাবে থাকলে অভাব মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। নবীজী (সাঃ) আরও বলেছেন- যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায়, আর প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে সে প্রকৃত ঈমানদার নয়। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক তাঁর ভাল আচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আপনার প্রতিবেশী আপনাকে কষ্ট দিলে, তবে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। তথাপি প্রতিবেশীকে মন্দ বলা বা প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। মনে রাখবেন প্রতিবেশীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কারও ভাল মন্দ। আল্লাহর নিকট সে প্রতিবেশীই সবচেয়ে উত্তম যে তাঁর নিজ প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন- "তোমরা পরস্পর উপহার আদান-প্রদান কর। এটা জিনিসের লেনদেনের উপর নয়, বরং আন্তরিকতার গভীরতার উপরই গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। একবার হযরত আবু হানিফা (রাঃ) এর এক প্রতিবেশী ছিল অগ্নি উপাসক, সারারাত মদ্যপান করে ইমাম সাহেবের ইবাদত বন্দেগীতে ও লেখাপড়ায় অসুবিধা করত। একদিন ঐ বাড়ীতে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ইমাম সাহেব খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সংবাদে ব্যথিত হয়ে ইমাম সাহেব তাকে মুক্ত করতে গেলেন। কাজী ইমাম সাহেবকে বললেন, 'হুজুর আপনাকে কষ্ট দেয় বলেই তো তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে'। ইমাম সাহেব বললেন, 'প্রতিবেশীর হক আদায়ের জন্যই আমি তাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি'। ইমাম সাহেবের জিম্মায় তাকে মুক্তি দেয়া হয়। লোকটি এ ঘটনা শুনে এবং ইমাম সাহেবের ব্যবহারে ভাল হয়ে যায়। এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে মানবতার সেবায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বয়স্কদের নিয়ে কিছু ভাবনা

কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ
আ- ১৮৫১
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

কেমন আছেন ভাই? এ কথা কেউ জিজ্ঞাস করলে সাধারণত ষাট উর্দ্ধ একজন হলেই অজান্তে বলেন তিনি, 'আরে ভাই আছি কোন রকম, নানান কষ্ট, মনটা ভাল নেই, শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলবো ঐ উক্তিগুলো সঠিক নয়। সত্তর হলেই জীবন ফুরিয়ে গেল, হতাশা এসে মাথায় চাপ দিলো, যৌবনের সেই উৎসব সবই শুধু স্মৃতি তা নয়। জীবনটাকে ঝাপসা হতে দেবে না, পুরোনো কথা ভেবে দুঃখ করা চলবে না, মনটাকে সদা তরতাজা রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে,বয়সটা শুধু অংকের সংখ্যাই হয়ে থাকুক। যা পেয়েছি অতীতে তাঁর জন্য হাজারো শুকরিয়া এবং এখনও বেঁচে আছি, স্বসম্মানে তা আল্লাহর দান। অসুখ বিসুখ তো থাকবেই যা প্রকৃতির নিয়ম এবং এর সঙ্গে শারীরিক, মানসিক সমস্যাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবেনা, এটাও ঠিক। তবে এটার মোকাবিলা করতে হলে বাড়ীর লোক জনের সাহায্য, সহানুভূতি, সাহচর্য ও আশ্বাস দারুণ প্রয়োজন।

বয়স্ক হয়ে গেছেন বলে চুপচাপ বসে সারা দিন অলস জীবন যাপন করবেন না। কিছু কিছু কাজ কর্মের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। ছেলেমেয়ের জন্মদিন, ঈদের দিন, বিশেষ বিশেষ দিন, নানা কর্ম ও পর্ব উপলক্ষে নিজেকে অন্যের মত ব্যস্ত হওয়ার জন্য মন প্রস্তুত করুন। নিরাশ হবেন না,বা আমি এটা পারবোনা বা আমার কি আর সেই বয়স আছে? এগুলো কথাকে পাত্তা দেবেন না। সম্ভব হলে আশে-পাশের বাজারে হেঁটে গিয়ে নিজেই টুকটাক বাজার খরচা করে এনে নিজের মনের আনন্দকে লালন করুন। শরীরে সহ্য হলে লিফটে না গিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করুন। নাতী-নাতনীকে স্কুলে নেয়া আনা,এটাও একটি সুন্দর অভ্যাস। পাশে মাঠ থাকলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি ও ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করুন। দেখবেন মন অনেক ভাল লাগছে। বেশিক্ষণ এক জায়গায় শুয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পর পর যে কোন ওছিলায় এদিক-ওদিক চলোফরা করতে হবে। ষাট-সত্তর হলেই ব্লাড সুগার, প্রেসার, কিডনি ও হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাথার কোষগুলো মরচে ধরে অনেক কিছু মনে থাকে না। কিন্তু এগুলো থাকা সত্বেও সময়ের সাথে সাথে মনটাকেও বদলাতে হবে। এটা নিয়ে সব সময় চিন্তা ভাবনা করা যাবে না। এমনিতে আমাদের একটা বদ অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেটা হলো, সমবয়সী বা বেশী বয়সী লোকজন এক জায়গায় হলে দেখা যায় সেখানে সিংহভাগ আলোচনা

শুধু অসুখ বিসুখ নিয়ে, বার্ধক্যের কথা নিয়ে। কিন্তু এটা ঠিক না। চেষ্টা করতে হবে, আলোচনার বিষয় যেন নানামুখী হয়। প্রয়োজনে ধর্মীয় কিছু আলোচনা, গান সিনেমা ও হাসি ঠাট্টার উপকরণ গুলোও আড্ডাতে জায়গা দেওয়া উচিৎ। বয়স্ক লোকদের খাওয়া-দাওয়ার একটু ভাল হওয়া উচিৎ। এর মানে এই নয় যে বেশি খতে হবে। তবে খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বৈচিত্র ও সময়ানুবর্তিতা, রুচিকর ও পুষ্টিকর খাবারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদদের পরামর্শ নিতে অসুবিধা কোথায়? হাতের কাছে কিছু জরুরী ঔষধ মজুদ রাখতে হবে। অসুখের সব ঔষধ যেন যখন-তখন হাত দিলেই পাওয়া যায়, এমনভাবে কাছে রাখতে হবে। রাত-বিরাতে একা বের হওয়া ঠিক নয়।

বয়স্কদের মধ্যে ডিপ্রেশন বেশি দেখা যাচ্ছে। বয়স্করা বেশির ভাগই ডিপ্রেশনে ভুগছেন কারণ বয়স বাড়লে চলাচল কমে যায় একাকীত্ব বেড়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ কমে যায়, আর্থিক সমস্যা ও অনেকের এসে যায় শেষ অবধি সামাজিক যোগাযোগ কমে যায়, ফলে অনেকেই ডিপ্রেশনের স্বীকার হন। ছেলে মেয়ে দূরে থাকলেও বাবা মার মনটা ভাল থাকে না। তখন তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবতে থাকেন। ডিপ্রেশনের লক্ষণ হলো -

১। অনেকেই এমনি চুপচাপ থাকেন;
২। অনেকের কাজকর্ম করতেই ইচ্ছ করে না;
৩। অনেকেই সারাদিন শুয়ে থাকেন;
৪। অনেকেই ক্ষুধা মন্দায় ভাগেন।
৫। অনেকেই অসুখের কারণে ও ডিপ্রেশনে থাকেন।

বয়স জনিত অসুখ ও প্রতিকার

আবারো বলি, প্রকৃতির নিয়মেই সময়ের সঙ্গে বয়স বাড়বেই, এটাই চিরন্তন সত্য। এই নিয়মের মধ্যে কিছু অসুখ যা কমন ও বেশির ভাগ লোকের মধ্যে থাকে এখানে কিছু অসুখের কথা বলবো ও তাঁর সাধারণ প্রতিকার কিভাবে সম্ভব তাঁর কিছু সাধারণ আলোচনা করা যাক :

বয়স বাড়ার কারণে শারীরিক ও মানসিক দুটো বিষয়ই বৃদ্ধির দিকে যেতে থাকে। প্রথমে যে মানসিক রোগ দেখা দেয়, তা হলো ডিপ্রেশন পুর্বেই বলেছি যে বিশেষ করে একাকীত্ব থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া হার্টের সমস্যায়, উচ্চরক্তচাপ, স্নায়ুজনিত রোগ, আই.বি.এস,ইত্যাদিও ডিপ্রেশন বাড়ায় যা ডাক্তারগণ হর হামেশাই বলে থাকেন। স্ট্রোক ও ডিপ্রেশন পাশাপাশি ধাবিত হয়। ডায়াবেটিস বয়সকালের অন্যতম রোগ যদিও সব বয়সেই এই রোগ দেখা যায়। কিন্তু বয়সকালে একে প্রতিরোধ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ ডায়াবেটিসের সাথে আরো নানান রোগে এটাকে জটিল করে ফেলে। ডায়াবেটিক রোগ অনেক সময় মানসিক রোগে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে ডিপ্রেশন, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। আজকার আলোচনাটা শারীরিক এর চেয়ে মানসিক দিকটাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে বৃদ্ধ

বয়সে শারীরিক দুই-তিনটা রোগ খুব বেশি দেখা যাচ্ছে।

ক. স্ট্রোক

স্ট্রোকের মূল কারণ হলো প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকা। আমার এটা হলো না, আমার এটা নেই, ঐ লোকটার কত আছে, কি সুখে লোকটা আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছে, কত কাড়ি কাড়ি টাকা, আর আমার সে ক্ষেত্রে এত অভাব কেন? একটা গাড়ী কেনার খুব দরকার ছিল, ইত্যাদি ভাবনায় জীবনের শেষ সময়ে স্ট্রোক এসে মাথায় ঘুরপাক খাওয়া শুরু হয়। এই না পাওয়ার বেদনাই এক ধরণের নিত্য দিনের রোগে পরিণত হয়।

অনেকে বুঝতেই পারেন না যে তারা স্ট্রোকে আছেন বা ভুগছেন। লক্ষণগুলো নিম্নরুপ হতে পারে ?

- কিছুই ভাল লাগে না;
- মনের মধ্যে গুমোট বেধে থাকে;
- ঘুম ভাল হয়না;
- সামান্য কারণে অতিরিক্ত টেনশন ও অস্থিরতা;
- খিটখিটে মেজাজ;
- যে কোন সাধারণ বিষয়েও অসন্তোষ প্রকাশ;
- নিজের স্ত্রী/পুত্র ও সন্তানাদির অসুখ-বিসুখ

ওদিকে চাহিদারও শেষ নেই মানুষের জীবনে। একটা শেষ হলে আরেকটা চাহিদা মনের কোণে উঁকিদেয় ফলে নিরন্তর স্ট্রোক নামক বিষয়টি পিছু ছাড়ে না। স্ট্রোক কাটানো যায় কি? হ্যা অবশ্যই স্ট্রোক কাটাতেই হবে আমাদেরকে না হলে ধুকে ধুকে মারা যাব। না তা ঠিক নয়। কিছু কিছু টোটকা অভ্যাস ও জীবন শৈলির পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ট্রোক কমানো যায় যেমন-

- বেশি খারাপ লাগলে জায়গা পরিবর্তন বা কিছু দিনের জন্য বাসা ছেড়ে অন্য কোথায় বেড়ানো যায়। কোন জিনিসটা আপনার বেশি ভাললাগে, এই সময়ে সেটার করার উদ্যোগ নিন।
- ভালমন্দ কোন জিনিসটা খেতে ইচ্ছা করে বিশেষ কারণ ছাড়া ডাক্তার এর পরামর্শে দেরি না করে ঐগুলো খান।
- সমবয়সী বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে ভাল লাগে, তাই করুন।
- অনেক সময় শরীরের চাহিদা অনুযায়ী থেরাপী বা গা টিপে নিলেও স্ট্রোক কমে
- সব সময় পজিটিভ চিন্তা আনার চেষ্টা করুন।
- আল্লাহর ধ্যানে, নামাজ ও তসবিহ তেলোয়াতেই অনেক সময় মন পরিবর্তন হয়।

এবার শারীরিক মাত্র তিনটি বিষয়ে আলোচনা করবো সেটা শতকরা নব্বই ভাগ বয়স্কদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে ঃ

খ. আর্থাইটিস ঃ

বেশির ভাগ মানুষের বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর কারণেই জয়েন্টে ব্যথা ও হাঁটু, কোমরের ব্যাথা চাড়া দিচ্ছে। খুব সহজে বলতে গেলে আথ্রাইটিস বলতে বোঝায়, শরীরে জয়েন্টে মরচে পড়ে যাওয়া, হাড় ক্ষয় হতে থাকে, দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়সের সাথে সাথে কার্টিলেজ ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। কার্টিলেজ ক্ষয় হলে উপরের হাড়ও নিচের হাড় কার্টিলেজের আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে আসে ফলে দুটো হাড় পাশাপাশি চলে আসে হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ হয় তখনই ব্যথা অনুভূত হয়। সেই ব্যথা কখন মৃদু কিন্তু কখনও সহ্য করার মত নয়। আথ্রাইটিসের আরো কারণ আছে, যেমন উবু হয়ে বসা, একাকীত্বের কারনে অনেকক্ষণ সোফায় হেলান দিয়ে টিভি দেখা, রোদ না লাগানো, ভিটামিন-ডি এর অভাব, প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাব এবং পুরানো চোট খাওয়া ইত্যাদি। ডাক্তারগণ লাঠি ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে থাকেন হাঁটুর ব্যাথা হলে। সাধারণ খাওয়া-দাওয়া ব্যায়াম, হাঁটা-চলাই এর উত্তম চিকিৎসা।

গ. ডিমনেশিয়া এবং অ্যালজাইমার্সঃ

ডিমনেশিয়ার অন্যতম কারণ অ্যালজাইমার্স। এটা মূলতঃ বেশি বয়সের রোগ নামে পরিচিত। এর মূল কারণ ভুলে যাওয়া। জামার বোতাম ঠিক থাকে না, জুতার ফিতা বাঁধতে মনে থাকে না, চাবি, মোবাইল, মানিব্যাগ কোথায় রেখেছে খুঁজে পায় না, চশমা চোখে দিয়েই চশমা খোঁজে। এ ধরনের লক্ষণগুলোই এ রোগের বৈশিষ্ট। ডিমনেশিয়া প্রথমে প্রকট না হলেও আস্তে আস্তে ব্যক্তিত্বের ধরনে, চলনে-বলনে বেশ পরিবর্তন হতে থাকে। আরো বেড়ে যায়। কথা কম বলে, হাটা-চলার ইচ্ছা ও শক্তি দুটোই লোপ পায়। ডাক্তারীমতে পরিবারের কারও অ্যালজাইমার্স থাকলে রক্তে কোলেস্টরেল বেশি থাকলে, অতিরিক্ত ওজনের কারণে, উচ্চরক্ত চাপ থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ থেকে অ্যালজাইমার্স বাড়ে। এই রোগ সারাতে বাড়ীর লোকের ভূমিকাই মুখ্য। ঔষধ দিয়ে এগুলো খুব একটা সারে না বলে ডাক্তারগণ অভিমত প্রকাশ করেন। বাড়ীর লোক যদি আক্রান্ত ব্যক্তির খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা, মন ভাল রাখার চেষ্টা, মন বদলিয়ে দেয়ার চেষ্টা, তথা সার্বিক যত্ন নেন তবেই বয়স্ক লোকটি অনেক সময় আস্তে আস্তে সেরে উঠেন।

ঘ. পার্কিনসনস ?

এই রোগ মূলত নার্ভের ডিজিনেরেশনের জন্য হয়। এই রোগে হাত-পা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে থাকে। হাঁটা চলায় অসুবিধা হয়, চিন্তাশক্তি কমে যায়, ঘুমের সমস্যা প্রকট হয়, ধরে রাখতে পারে না এবং স্মৃতি ধরে রাখতে পারে না ও সর্বোপরি জিনগত কারণই এর জন্য দায়ী। আধুনিক যুগে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। তবে বাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কারণ অ্যালজাইমার রোগীরা অনেক সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে, তাই তাকে একা ছাড়া

যাবে না এবং তাকে পরিচিত বাড়ি ব্যবহার করতে দিতে হবে।

শেষের দিকে বলতে চাই, জন্মিলে মরতে হবেই এটাই ঠিক,তবে মরার আগেই বহুবার যেন মরে না যাই। মনে সাহস রাখুন, স্বপ্ন দেখুন, আশাহত হবেন না। বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে? সব শেষ হলো, তা মোটে নয়। দুটি প্রবাদ তো এখনও সদা চলমান তা হলো "Old is gold", আরেকটি হলো "পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। কাজেই আমরা হারিয়ে যেতে চাই না। আমরা স্বপ্ন দেখতেই থাকবো যতদিন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন।

উজ্জল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষের আয়ুও শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরানো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার-
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়,
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব
নক্ষত্রের আয়ু শেষ হয়।

-জীবনানন্দ দাশ

পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের স্মৃতিচারণ

ড. মোহাম্মদ আলী খান
সদস্য নং: আজীবন ২৮৫৪
কেন্দ্রীয় সমিতি

স্মৃতির দুয়ার খুলে নিজের কথা বলা অন্যের কাছে, সহজ কাজ নয়। বেশির ভাগ মানুষ যেমন তা করেন না, তেমনি অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গও স্মৃতিচারণমূলক বই লেখায় মনোনিবেশ করেন না। এমনকি যাঁরা লেখক- কলম ও কাগজ নিয়ে খেলা করেন নিরন্তর তাঁদের মাঝেও এর সংখ্যা বিপুল নয়। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন (১ জানুয়ারি ১৯০৩-১৩ মার্চ ১৯৭৬) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি যে খোলা মনের মানুষ ছিলেন এবং নিজেকে এই মাটি ও মানুষের কাছাকাছি ধরে রেখেছেন আজীবন তাঁর প্রমাণ স্মৃতিকথামূলক বইগুলি। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে একজন প্রতিভাধর কবির লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি ও সমাজ।

জসীম উদ্‌দীন নিঃসন্দেহে বড় কবি। স্কুল জীবনে কবর কবিতা যিনি পড়েছেন তিনি আর কোনদিন এই কবিকে ভুলবেন না। কবিতার পাশাপাশি শিশুসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, উপন্যাস, গল্প, জারিগান, উপন্যাস অর্থাৎ সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। তথাপি সবকিছু ছাপিয়ে তিনি পল্লীকবি। কবি ১০.০৪.১৯৭৫ তারিখে একটি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি আরও পদবী পাইয়াছি। কিন্তু আমার দেশবাসী আমাকে 'পল্লীকবি' এই পদবী দিয়াছেন। এটিই আমি সবচাইতে গৌরবের বলিয়া মনে করি।"

ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায় বইয়ের প্রচ্ছদ

এই মহান কবির স্মৃতিচারণ অত্যন্ত সুখপাঠ্য, তথ্যসমৃদ্ধ, ও প্রাঞ্জল। তারই কিছু দৈবচয়ন এখানে উপস্থাপন করা হল। ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায় স্মৃতিকথামূলক একটি চমৎকার বই। নামেই পরিচয় ও এখানে রয়েছে অনেক অভিনবত্ব। বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন: "এই স্মৃতি-কথায় আমি যাহাদের কথা লিখিয়াছি, এক কবি নজরুল ছাড়া সকলেই পরপারে। এইসব মনীষী-কথার মাধ্যমে পাঠক যদি এইসব মহৎ লোকদের কিঞ্চিৎ সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন নিজেকে ধন্য মনে করিব।" বইটির প্রথম সংস্করণ কলকাতা হতে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। তবে দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা ও ঢাকা থেকে যুগপৎ প্রকাশ পায়। কবিগুরুর সাথে সাক্ষাতের বাসনা এবং অবশেষে কবিগুরুর সান্নিধ্য ও স্নেহলাভের বিরল ঘটনাপ্রবাহ কবি জসীম উদ্‌দীন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর জনপ্রিয় নাটক পল্লীবধু , কবিগুরুর দেয়া প্লট অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল, তাঁর সুন্দর বিবরণ এখানে আছে। এই স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যের মধুর স্মৃতি। তাঁদের মধ্যে উলেখ্যযোগ্য: কবিগুরুর ভ্রাতুস্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, শিল্পী

নন্দলাল বসু, স্যার এফ, রহমান, শিল্পী আব্বাসউদ্দিন প্রমুখ।

স্মৃতিচারণে কবি লিখেছেন, "অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে মাঝে মাঝে নন্দলাল বসু আসিতেন গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে। ..... আর্টের বিষয়ে, ছবির বিষয়ে তিনি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলিতেন যা লিখিয়া রাখিলে সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হইত। কয়েকটি কথা মনে আছে। ------ "গাছের এক এক সময়ে এক এক রূপ। সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, রাত্রি কত ভাবেই গাছ রূপ পরিবর্তন করিতেছে। শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্ররা গভীর রাত্রিকালে জেগে উঠে গাছের এই রূপ পরিবর্তন লক্ষ করে।"

আর একটি স্মৃতিচারণ এমন ঃ "একদিন জ্যোৎস্নারাত। আমরা দুইজনে (পল্লীকবি ও মোহনলাল) বসিয়া গল্প করিতেছি। রাত প্রায় একটা। আমাদের খেয়াল হইল, চল আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দিয়া আসি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি হইতে রিক্সায় চাপিয়া চলিলাম পার্ক সার্কাস। বৌ বাজার হইতে দুইজনে ভাল দুই গাছি বেলফুলের গোড়ের মালা কিনিয়া লইলাম। আব্বাস উদ্দিন থাকিত কড়েয়া রোডের এক মেসে। বড়ই ঘুমকাতুরে। ঘুম হইতে জাগাইতে সে ত রাগিয়া অস্থির। আমরা অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিলাম, হে গায়ক প্রবর আজ আমরা দুই বন্ধুতে স্থির করিলাম, অখ্যাত বিখ্যাত আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে রজন যোগে গিয়া বেল ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া আসিব। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করে এই মালা গ্রহণ করুন। আমরা দুইজনে তাহার গলায় দুইটি মালা পরাইয়া দিলাম। বন্ধুবর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তারপর বহুক্ষণ গল্পগুজব করে জোড়া সাঁকো ফিরিয়া আসিলাম। পথের দুইধারে ফুটপাথের উপর সারি সারি সর্বহারা শুইয়া আছে। মাঝে মাঝে রিক্সা থামাইয়া বহুক্ষণ তাদের দেখিলাম। মোহনলাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, এদের কবিতা কোন কবি লিখবে?"

আজ মনে হয় কবি জসীম উদ্‌দীন শোনা স্মৃতিচারণ করেননি, সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষের কথা, ঐ সময়ের সমাজ-বাস্তব তাঁর চিত্র এঁকেছেন সুনিপুণভাবে। জীবন কথা" বইয়ের প্রচ্ছদ তাঁর এই অপূর্ব ঢংয়ের ও মেজাজের লেখা, স্মৃতিচারণমূলক অন্যান্য বইয়েও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় বই "জীবন কথা"। ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ বঙ্গাব্দে (১৯৬৪) বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পাঠকপ্রিয় "জীবন কথা"র পরতে পরতে কবিকে নতুন নতুন করে অনুধাবন করা যায়। তাঁর 'অন্ধ দাদা' থেকে শুরু করে 'সন্ন্যাসী ঠাকুর' পর্যন্ত অনেক প্রিয়জন ঘিরে একণিষ্ঠ চিত্র এই স্মৃতিকথায় রূপায়িত করেছেন। তিনি ঠিকই লিখেছেন, "যে চরিত্রগুলি আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিয়ত যাওয়া-আসা করিতেছে তাহাদের কাহিনী কি শেষ হইতে পারে?

"স্কুলের পথের" বর্ণনা সে সময়ের যেন স্থিরচিত্র ঃ "স্কুল হইতে আমার বাড়ি ছিল আড়াই মাইল দুরে। সেখান হইতে নয়টার সময় খাইয়া স্কুলে রওয়ানা হইতাম। স্কুলের ছুটি হইত চারিটার সময়। দারুণ ক্ষুধায় তখন পেটে আগুণ জ্বলিতে থাকিত। বইপত্র বগলে করে বাড়ির পথে রওয়ানা হইতাম। ..... একদিন দারুণ ক্ষুধার সময় নিজের পাঠ্যবই বাঁধা দিয়া দুই আনার বরফি কিণিয়া খাইলাম। কিন্তু কোথায় পাইব পয়সা? কি করে ধার শোধ করিব? ..... বহুদিন পরে বাড়ি হইতে

কোন জিনিস বাজারে বিক্রি করে দুই আনা সংগ্রহ করে দোকানির নিকটে গেলাম। দোকানি বলিল, তোমার দেখা না পাইয়া বইগুলি ছিড়িয়া ঠোঙ্গা তৈরি করেছি।"

অন্যত্র কবির জীবনবোধ নিম্নের কথায় ফুটে উঠেছেঃ

"আজ আমার বিগত জীবনের দিকে যতদূর চাহিয়া দেখি, আমার পিতা, সুরেশবাবু, সুবোধ ডাক্তার এমনি কত মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁরা কি আমার জীবনে এতটুকুও আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে? সেই আত্মত্যাগ সেই পরার্থে সকল সমর্পণ-জীবনের দেউলিয়া দিনগুলির সঙ্গে তাঁহাদের মহৎ- সংসর্গের দিনগুলি তুলনা করে কেবলই মনে হয়, সেখানে শুধুই শূন্যতা-শুধুই শূন্যতা জমা হয়ে আছে। তাই এত করে তাহাদের কথা লিখিয়া গেলাম; দেশের অনাগত কালের ভাইবোনেরা যদি এসব জানিয়া কোনো আদর্শবাদের সন্ধান পায়।"

কবি জসীম উদদীনের কবিতার ভাষা যেমন মধুর, তেমনি তার গদ্যলেখাও। আর বাস্তব জীবন ও হারিয়ে যাওয়া একটি সময়ের চিত্র তাঁর স্মৃতিকথাগুলোতে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই অনন্য। এমনই আর একটি বই "স্মৃতির পট" যা ১৯৬৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া আছে "যাদের দেখেছি" যা কবিপুত্র পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছেন। "স্মরণের সরণী বাহি" ছোট্ট সুন্দর বই যা কবির মৃত্যুর পর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এগুলো সবই কবির স্মৃতির "অমৃত-সঞ্চয়"। শুধু পল্লীকবির স্মৃতিচারণ মূলক বইগুলি নিয়ে গবেষণা করলে সে সময়ের এক সাধারণ চিত্র পাওয়া যায় যা আমাদের চিন্তা-চেতনা, বিবেকের সীমানায় দারুণভাবে প্রভাব ফেলে, আমাদের মানসিকতার গন্ডিকে নিয়ে যায় বহুদূর। কবি জসীম উদ্দীনের স্মৃতিকথামূলক বইগুলি কেবল স্মৃতিচারণমূলক বই নয়, হারিয়ে যাওয়া সময়কে ধরে রাখা একজন নিষ্ঠাবান শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টি।

গল্প

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

জীবন সায়াহ্নে সমুদ্র সৈকত

মোঃ সাজ্জাদ আলী
চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতি
আজীবন সদস্য নং-৮৪৬

চশমাটা খুলে কাচটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে চোখে লাগিয়ে তাকালেন সমুদ্রের দিকে। আহ! কি সুন্দর দৃশ্য! অজস্র ঢেউ মহাকালের বার্তা নিয়ে ক্ষুধ্ব গুঞ্জনে বারবার কূলে আছড়ে পড়ছে। আছড়ে পড়ছে একটা শিহরণ ষাটোত্তর একজন প্রবীণের জীবনে। কয়েক বছর আগে চাকুরীর পাট চুকিয়ে এখন অবসর জীবনযাপন। সৈকতের একটা বড় পাথরের উপর বসে আছেন পৌঢ় আনোয়ার হোসেন। নিষ্কলুষ নির্মল বাতাস চোখে মুখে কেমন সতেজ অনুভুতি জানাচ্ছে। এইতো সামনে দিয়ে একজোড়া যুবক-যুবতী, বোধ হয় দম্পতি, কেমন উচ্ছল উদাস ভঙ্গিতে ছুটে চলে গেল। যুবক-যুবতী একে অপরকে কাছে টানছে। হাসছে লাফাচ্ছে। ঢেউগুলো তাদের পায়ে আছড়ে পড়ছে। কি রঙ্গিন এদের জীবন, কি নিঃসংকোচে এদের সুখী ভ্রমণ। ওদের রঙ্গিন অনুভূতি এই প্রৌঢ় বয়সীর মনে দোলা লাগলো কি? আনোয়ার হোসেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন। দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে ঘোরালেন। সূর্যটা ডুবে যাচ্ছিল সেই সময়। তিনিও চেয়েছিলেন রোকেয়া বেগমকে নিয়ে ওদের মতো হৈ হুল্লোড় না হোক, বসে বসে স্মৃতিচারণ করে এই সমুদ্র সৈকতে ক'টা দিন কাটাতে। কিন্তু হলো কি? আহ কত সখই না ছিল রোকেয়ার।

'হোঃ হোঃ করে মিলিত কণ্ঠে হাসির শব্দে ফিরে তাকালেন আনোয়ার হোসেন। চোখের ঘোলাটে চশমাটা একটু নেড়ে নিয়ে সৈকতের দিকে তাকালেন। সেই প্রাণবন্ত দু'টি যুবক-যুবতী তাঁর দিকেই তাকিয়ে হাসছে। 'এই যে শুনুন' বলে মেয়েটি একটু থামলো। তারপর বললো, "আপনাকে অনেকক্ষণ একা একা এই পাথরে বসে থাকতে দেখছি। আপনার সঙ্গী নেই?"

নড়ে চড়ে বসলেন আনোয়ার। এমন ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। বললেন, ' না মানে আমি একাই এসেছি। তা আপনারা---। এবার ছেলেটি বললো, " আমি আশরাফ। এই আমার স্ত্রী। দু'জন এই আর কি হানিমুনে বেরিয়েছি। চাকুরী করি। এক মাসের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। উঠেছি একটা হোটেলে।" সুন্দর একগুচ্ছ ফুলের সৌরভের মত আশা আকাংখার গন্ধ যেন পাচ্ছেন আনোয়ার হোসেন। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা অসহায় দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করে বললেন, " বাহ বেশতো। হানিমুন করবেন বৈকি। এই বয়স, এই সুযোগ আর আসবে না।" কথাটা বলতে গিয়ে স্বরটা তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল নাকি? হবেও বা।

মেয়েটা বললো, " আসুন না আমাদের হোটেলে। আরও আলাপ করা যাবে।" বলে ওরা চলে গেল। সেই আগের মতো হাসতে হাসতে। অন্ধকার হয়ে আসছে। আনোয়ারও তাঁর আস্তানাতে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। যদিও সময়ের অভাবে ওদের হোটেলে আর যাওয়া হয়নি।

দীর্ঘ চাকুরী জীবনের অধিকাংশ সময়ের বন্ধু রুহুল আমীন সমুদ্রের ধারেই একটা ছোট বাড়ী কিনেছেন। বাড়ীতে একা একটা কেয়ারটেকার ছাড়া তাঁর কেউ থাকে না। রুহুল আমীন রিটায়ার করে দেশের বাড়ীতে আছেন। আনোয়ারের সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাবার কথা শুনে তিনি সানন্দে তাকে এই বাড়ীটায় থাকতে দিয়েছেন।

এখন অনেক রাত। বাড়ীটাও একটা প্রাণহীন নিঝুমপুরী যেন। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আনোয়ার শুয়ে আছেন। অপার শূণ্যতা পাষাণভারের মত সারাক্ষণ বুকে চেপে থাকে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। রোকেয়া? আজ সে কতদূরে...। নিভৃত পেলেই তৃষিতের মত কণিকাগুলো যেন ছুটে আসে। মনে পড়ে..।

বিয়ের পর প্রাণময় গতি আর অফুরন্ত আনন্দ পেরিয়ে বাস্তবে কঠিন ছোঁয়া পাবার আগেই স্ত্রী রোকেয়া একদা প্রস্তাব দিয়েছিল, "এই শোনো একটা কথা রাখবে?"

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বহাস্যে আনোয়ার বলেছিলেন, "শুধু একটা কথা? বেশ রাখতে চেষ্টা করবো, এবার বলে ফেলো সুন্দরী।"

বৈকালিক চায়ের পেয়ালা স্বামীর হাতে দিতে দিতে রোকেয়া বলে, "না, ঠাট্টা নয়, আচ্ছা বিয়ের পর অনেকে তো এই হানিমুন করতে বেড়াতে যায়। তা সেরকম হলে কেমন হয়?"

কিছুটা বিস্ময়। যেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যান আনোয়ার। তারপর হো হো করে হেসে উঠেন, " তাহলে গিন্নীর হানিমুন করার ইচ্ছা হয়েছে। তা বলো, কোথায় যেতে হবে তোমাকে নিয়ে?"

"বারে! ইচ্ছা যেন আমার একার।" লজ্জার ভঙ্গিতে বলে রোকেয়া, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছা সমুদ্র দেখার। ঠিক হানিমুন নয়, বুঝলে। সংসারের ঝামেলাতো আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে। তুমি বরং এক মাস ছুটি নেবার চেষ্টা করো লক্ষীটি"।

শুনে মনে মনে স্বীকার করলেন আনোয়ার হোসেন, বেশ ভালই। বুঝলেন একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া বিয়ের আগে রোকেয়া আর কিছু ভাবেনি। বড়ই সাধারণ। অতি আভিজাত্য নেই, পারিপাট্যের আধিক্য নেই, নেই অতিরিক্ত উচ্ছলতা।

সংযম প্রেমকে স্থায়িত্ব দেয়, কিন্তু আবেগ দেয় গভীর প্রেরণা। জীবনকে রূপে রসে সুষমায় আর মহিমায় ভবে তোলে। জীবনকে উপভোগ করতে হলে চাই একটুখানি উচ্ছাস ও প্রগলভতা। একজন সাব পোষ্টমাস্টারের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে। অনেক স্বপ্নের মধ্যে সামান্য আকাংখা থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন না।

কিন্তু ছুটি চাইলেই ছুটি পাওয়া যায় না। কর্মচারীর স্বল্পতা হেতু ছুটি পাওয়া গেল না। এদিকে দিন ক্রমেই গড়িয়ে চললো।

যখন ছুটির সম্ভাবনা দেখা গেল তখন রোকেয়া আসন্ন প্রসবা। তাদের প্রথম সন্তান আসছে এবং তখনই বদলী। অগত্যা বাপের বাড়ীতে রোকেয়াকে রেখেই আনোয়ার হোসেনকে নতুন জায়গায় যেতে হয়েছে। তবে নতুন দায়িত্ববোধ তাকে নতুন এক কাজে ব্রতী করেছে। মাসিক বেতন থেকে কিছু কিছু টাকা তাঁর নিজের

একাউন্টে জমা দিতে থাকতেন। এর মাস পাঁচেক পর প্রথমা সন্তান ফারহানাকে বুকে জড়িয়ে রোকেয়া এসে দাঁড়ালো আনোয়ারের নতুন কর্মক্ষেত্রে। মাতৃত্ব আর সংসারের বাড়তি কাজে ডুবে গেল সে। সময় হারিয়ে গেল সন্তানের পরিচর্যার মাঝে। ক্রমে ক্রমে ঝামেলা বাড়লো। বাড়লো ব্যস্ততা। এরই মধ্যে আবার বদলী। কন্যা বড় হলো। জন্ম নিলো আর এক কন্যা রীমা। চাকুরী জীবনের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে একটা সংসারকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম লগ্নে সমুদ্র সৈকতে হানিমুন করার বাসনা তারা প্রায় ভুলেই গেল। এদিকে যৌবনের উচ্ছ্বাস সময়টা দ্রুত পার হতে থাকলো।

পাশ বইয়ের টাকাটা জমা হতে হতে সুদে আসলে যা দাঁড়ালো তা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগালো বড় মেয়ে ফারহানার লেখাপড়া ও বিয়েতে, সৈকতে বেড়াতে নয়। আনোয়ার চিন্তামুক্ত হলেন। যা হোক চুকে তো গেল পাশ বইতে রাখা টাকাগুলো ছিল বলেই। একদিন অবসরমত আনোয়ার হোসেন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীকে, সৈকতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছাটা... ।..." রাখো তোমার সমুদ্র সৈকত।' স্বামীর কথাটা শেষ করতে না দিয়ে রোকেয়া চাপা স্বরে বললো, "বয়স কি আমাদের কমছে না বাড়ছে? দেখছো না এখন জামাই হয়েছে। আরও একটা বড় হচ্ছে। ছেলে রয়েছে"। একটু ভেবে বললেন আনোয়ার, "তাই বলে আমাদের ইচ্ছাটা পূরণ হবে না?"

"----ইচ্ছা? হ্যাঁ তা হতে পারে। শোন, প্রথম যৌবনে যখন হলোনা, তুমি আগে রিটায়ার করো। ছেলেটাও বড় হবে। বাকি মেয়েটাকে পার করবো। তারপর পিছুটান থাকবে না। তখন বুড়োবুড়ি যাহোক কটাদিন বেড়িয়ে আসবো, কি বলো!" হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন আনোয়ার, "তুমি যখন বলছো তাই হবে।"।

......হঠাৎ শব্দ। আনোয়ার তন্ময়তা কাটিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। পাশের টেবিলে রাখা প্রায় নেভানো আলোটা উসকে দিয়ে বুঝলেন, ওটা মেঘের গর্জন। খোলা জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। এক্ষণি বুঝি বৃষ্টি আসবে। আসুক বৃষ্টি সব ডুবে--ভেসে যাক। তাহলেই যেন ভাল হয়।

রিটায়ার করার বছর দুয়েক যেতে না যেতেই অঘটনটা ঘটে গেল। ছেলেটা কলেজে পড়ছে। আজ ক্লাব গঠন, কাল নাটক, পরশু পার্টি ইত্যাদিতে সর্বদা মেতে আছে। সংসারের দিকে কোন লক্ষ্য নেই, দরদ নেই। একটা কুলাঙ্গার ছেলে হয়েছে। শুধু টাকা দাও। টাকা না দিলে কথা কাটাকাটি। তারপর রাগ করে কিছুদিন উধাও। একদিন ছেলেটা হাজির। "আব্বা টাকা লাগবে।" আনোয়ার বললেন, "টাকা কেন?" ছেলেটা রেগে বলল "রিটায়ারের টাকাগুলো আমার দরকার---ব্যবসা করব" ।---"না এই কষ্টের টাকা তোমার একার নয়, আর তুমি ব্যবসা করে টাকা নষ্ট করবে"। আনোয়ার হোসেন বলতেই ছেলেটা জোর করে কৌশলে টাকাগুলো হাতিয়ে নিল। তারপর একদিন কাউকে না জানিয়ে একটি সহপাঠী মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর ফিরলো না। বাবা-মা তাঁর ছেলের অধঃপতনে কতটুকু আঘাত পেতে পারে, তা সে মোটেই ভাবলো না। রোকেয়া ভেঙ্গে পড়লো। ছেলেটার অধঃপতনে চিন্তায় শরীর ভেঙ্গে গেল। শেষে শয্যা নিল। আর ভালো হলো না------- অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও।

শেষ শয্যায় শুয়ে রোকেয়া ক্ষীণ গলায় বলেছিল, "ওগো আমাদের সেই সৈকতে যাওয়া বুঝি হলো না। কিন্তু তুমি যেয়ো। অন্ততঃ সৈকতে যেয়ে আমার কথা স্মরণ করলেও আমি শান্তি পাবো।"

"--তুমি চুপ কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।" জোর করে চুপ করিয়ে দিলেও আনোয়ার হোসেন শেষ রক্ষা করতে

পারেনি। কিন্তু কোথায় ফিরবে? চিরচেনা শূন্য সংসারে নাকি অজানা জীবনের ওপারে। সবাই অনেক আশা আকাংখা নিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু সব কি পাই? পাই না। তাই সব মানুষের মনেই অপূর্ণ থেকে যায়। এটাই হয়তো ভবিতব্য।

কি হবে এই সংসারে? সারা জীবন পরিশ্রম করে কি পেয়েছেন? জীবনের আশা-আকাংখা সবই অপূর্ণ থেকে গেল। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে রিটায়ারের সমস্ত প্রাপ্য টাকা ছেলেটা জোর করে নিয়ে নিলো। বাকি যা ছিল দুই মেয়ে জামাইকেও দিতে হলো। কি হবে নিজের কাছে অর্থ রেখে? দুর্নিবার এক অসহায়ত্বের মধ্যে পাশে এসে দাঁড়ালো বন্ধু রুহুল আমীন। সান্ত্বনার ভাষা যদিও নেই তবু বললো, "সব টাকাই তো দিয়ে দিলে, তা তুমি কিছু রাখলে না?"--"কি জন্য রাখবো? একা মানুষ। মাসান্তে যে পেনশনটা পাব তাই দিয়ে যাহোক চালিয়ে নিতে পারবো।"--"আচ্ছা আনোয়ার, সমুদ্র তীরে যাবে?" রুহুল আমীন বললো।

চমকে উঠলেন আনোয়ার কথাটা শুনে। একটা স্মৃতি মোচড় দিয়ে উঠলো। সমুদ্র তীর, সৈকত। "কেন?" রুহুল আমীন বললেন, "তোমার রিটায়ার করার পর তোমাদের সৈকতে যাবার কথা ছিল। তুমি যেতে চাইলে আমার একটা ছোট্ট বাড়ী আছে ঠিক সমুদ্রের ধারে, সেখানে ক'টা দিন কাটিয়ে আসতে পারো।" বন্ধুবরের কথাটা ফেলে দিতে পারলেন না আনোয়ার। বললেন, "কিন্তু একটা শর্ত। আমার সৈকতে যাবার কথাটা তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। আমি চাই না, আমার জন্য কেউ ভাবুক, খোঁজ করুক।" রুহুল আমিন বললেন, 'না হয় তাই হলো। তুমি যে ক'টা দিন থাকবে তাঁর খরচপত্র আছে তো?"

আনোয়ার হোসেন এ কথায় মুচকি হাসলেন, যেন অর্থ কোন সমস্যাই নয়। বললেন, "এটার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি। বছর পাঁচেক হলো গোপনে বেশ কিছু টাকার বিভিন্ন মানের সঞ্চয়পত্র কিনেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ঐগুলি ভাঙ্গিয়ে স্বামী-স্ত্রী রিটায়ারের পর বেড়িয়ে পড়বো। কিন্তু যার ইচ্ছায় এসব করেছিলাম, আজ সেই নেই।" একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আনোয়ার। রুহুল আমীন বললেন, "তুমি তো বুদ্ধিমান লোক। এতোদিন এ টাকা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। যাক নিশ্চিন্তে যেতে পারছো তাহলে।"

বৃষ্টি থেমে গেছে। চোখের পাতাটা বুজে আসছে আনোয়ারের। রাত শেষ হয়ে আসছে। আর নয়। এবার ফেরার পালা। আমি ব্যর্থ। আমি সত্যিই ব্যর্থ স্বামী, অযোগ্য বাবা। সফলতা আনতে পারিনি। স্ত্রীর হানিমুনের প্রতিশ্রুতি, সন্তানের বখাটে হওয়া, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, নিজের নিঃসঙ্গতা, সব চোখের সামনে ছবির মতে ভাসছে। চুল চেরা হিসাব নিকাশ কিছুই মেলোত পারে না।

পরদিন শেষবারের মতো সৈকতে অনেকটা হাঁটলেন ডাক বিভাগের রিটায়ারড কর্মচারী প্রৌঢ় আনোয়ার হোসেন। নতুন করে দেখলেন, বেশ ভাল লাগলো। দূরের দিগন্তে তাকিয়ে স্ত্রীর কথা মনে হলো। একটা করুণ মুখের সৈকতে বেড়াবার আকুতি চোখে ভেসে উঠলো। বিড় বিড় করে উঠলেন, "রোকেয়া তোমার আশা পূর্ণ করতে পারলাম না। তুমি ক্ষমা করো। আজ আমি একা নিঃঙ্গতায় পর্যদুস্ত। জানিনা আর কতদিন এই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে।"

এই মহা সৃষ্টির কাছে জীবন সায়াহ্নে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো আনোয়ার হোসেনের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে গেল। ধরে রাখতে পারলেন না তপ্ত দু'ফোটা অশ্রু। মুখ ফিরিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরে চললেন সমুদ্র সৈকত থেকে, বুঝি জীবন পরিক্রমা থেকেও।

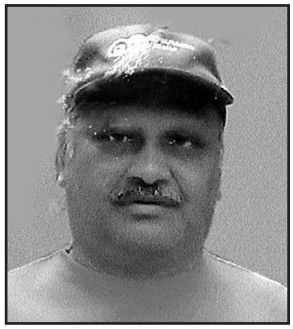

মায়ার সংসার

মীর আব্দুল আউয়াল
আজীবন সদস্য -২৭৬২
কেন্দ্রীয় সমিতি

বাসায় কাজে এসেই খাবার টেবিলে ফলের ঝুড়িতে রাখা ডালিমের প্রতি দৃষ্টি পরে যায় কাজের বুয়া সখিনার। মুহূর্তে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তার। ডালিমের রঙ দেখে অভিভুত হয় সে। কী সুন্দর গাঢ় লাল রঙের ডালিম। ঝুড়িতে থরে থরে সাজানো রয়েছে। বাস্তবে ডালিমের কোন সুগন্ধ না থাকলেও আজ বেশ সুগন্ধ যেন আছড়ে পড়ছে তাঁর সজাগ নাকে। আজকের ডালিমগুলি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে তাঁর কাছে। এমনটি তাঁর হয়নি আর কোনদিন। মনে হচ্ছে, বাড়ির গৃহিনী যদি দয়া করে তাকে একটি ডালিম দিত তাহলে খুবই খুশি হতো সে। আজ সাতদিন হলো ছোট মেয়েটা জ্বরে ভুগছে। কোন কিছুই মুখে নিতে চায়না সে। এ মরার জ্বরের ছাড়ার কোন নাম নেই। গরীবের জ্বর সহজে যায় না। আজকাল রোগ-ব্যাধিও মানুষ চেনে। ভাবতে ভাবতে মুহূর্তে চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যায় সখিনা।

বাড়ির কর্ত্রী আজ যেন তাঁর কাছে খুবই দয়ার্দ্র হৃদয়ের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। তাকে স্থির হয়ে খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে কাছে আসেন গৃহকর্ত্রী সাজেদা বেগম। তাঁর চোখে মুখে মায়া মমতার ছাপ। মনে হলো অনেক আদর করে সখিনার মাথায় হাত রাখলেন তিনি। মনটা একদম ভরে গেল তার। এতো আদরে চোখে জল এসে যায় সখিনার। কোন কিছুই ভাবতে পারছে না সে এখন। মনে হচ্ছে দুনিয়ার সব মানুষগুলি কী আজ হঠাৎ করে বদলে গেল? এমন হলে যে পৃথিবীটা স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে।

- কী দেখছো সখিনা অমন করে? একটা ডালিম কী লাগবে তোমার?

- আমাকে সত্যি সত্যি একটা ডালিম দিবেন আফা। আমার ছোট মাইয়াডার আজ সাতদিন হলো খুব জ্বর।এখনও সারে নি। ডাক্তার ওরে ডালিম খাইতে কইছে। গরীব মানুষ ডালিম কিনমু কইথনে? দু বেলা আহার জুটাইতে দিন যায়।

- বেশ তো। ফলের ঝুড়ি থেকে দুটি ডালিম নিয়ে যাও। আমার আবার গরীবের দুঃখ দেখলে মন কাঁদে।

- আপনার বহুত দয়া আফা। আফনি মানুষ না, আফনি সাক্ষাৎ দেবী।

- ওকথা বলছো কেন সখিনা? মানুষ হিসেবে তুমি আমি সবাই সমান। আজ হয়তো তোমার নেই।

তাই বলে কী কোন কিছু চাইলে আমি তোমাকে দিব না। অমন হৃদয়হীনা আমাকে ভেব না তুমি। আমিও তোমার মতোই রক্ত-মাংসে গড়া স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষ। আর মানুষ তো মানুষের জন্যে।

আজ বাড়িটা খুবই ভাল লাগছে সখিনার। আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো এ বাড়িতে কাজ করে সে। এ বাড়ির কর্ত্রী সাজেদা বেগমের এমন মায়াময় আচরণ ইতোপূর্বে কোনদিন দেখেনি সে। প্রচন্ড গরমেও বাড়িটা আজ বেশ আরামদায়ক ঠান্ডা মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। হঠাৎ কর্কশ শব্দে ধ্যান ভাঙে তার।

-এই হারামজাদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস অমন করে? সেই কখন থেকে লক্ষ্য করছি আমি, খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই কী যেন ভাবছিস? কিছু চুরি-টুরি করবি নাকিং ছোটলোকদের তো আবার হাতটানের অভ্যাস আছে। তোকে চোখে চোখে না রাখলে এতদিন কত কিছু যে চুরি করতিস তুই, তা কে জানে?

-কী কন আফা। আমি চুরি করমু ক্যান? ছোট মাইয়াডার আজ সাতদিন হলো জ্বর। অহনও জ্বর ছাড়ে নাই। ডাক্তারের কথামত ওষুধ-পত্তি কিনবার পারি নাই। ডাক্তার মাইডারে ডালিমের রস খাইতে কইছে। ভাত পাই না, আবার ডালিম কিনমু কইথনে?

- এই সেরেছে। তুই তো আমার ডালিমের দিকে চোখ দিয়েছিস। ও ডালিম তো আমার ছোট ছেলে সাকিবের জন্য ওর বাবা কাল সন্ধ্যায় বাজার থেকে এনেছে। এখন ডালিমের প্রতি তোর চোখ যখন পড়েছে তাতে ভাবছি,আমার ছেলেটার কোন অসুখ-বিসুখ আবার না হয়। ছোট লোকদের চোখ খুব মারাত্মক। তাদের চোখ শকুনের চোখের চেয়েও খারাপ।

- না আফা, আমার বিশ্বাস কইরেণ,আমি ডালিমে কোন চোখ দেই নাই। আল্লাহ তায়ালা আফনার ছেলেডারে ভাল রাইখবো এই দোয়াই করি।

-থাক,তোকে আর দোয়া দিতে হবে না। তোর মতো ছোট লোকদের দোয়ায় আমার কিচ্ছু হবে না। সৃষ্টিকর্তা এমনিতেই তোদের দেখতে পারেন না। তা নাহলে কী আর তোরা পরের বাড়ি কাজ করে খাস।

- অমন করে কইয়েন না আফা। আল্লাহ আমাদেরকে ভালই বাসেন আফা। তা না হইলে চাঁদ-সুরুজ আমাগোরে সমান আলো দিতো না।

- নে নে, অত মোল্লাগিরি করতে হবে না তোর। তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যা। কাজের শেষে কিছু আতপ চাল পিষে দিয়ে যাস। ছোট ছেলেটা আজ পিঠা খেতে চেয়েছে। ও সহজে কিছু খেতে চায় না।

- আফা,একটা কথা কইতাম।

-বল, কী বলবি? টাকা-পয়সা চাস না যেন? তোদের তো আবার কেঁদে কেঁদে টাকা-পয়সা চাওয়ার বড় অভ্যাস। ছোটলোকদের এ একটা ব্যবসা।

-আফা,আইজকে আমার একটু সহালো সহালো ছুটি দিয়েন। মাইয়াডারে হাসপাতালে নিমু।

- হাসপাতালে নিয়ে কী করবি বল? তোর তো দু মেয়ে আছে। একটা মরলে তো আরও একটা থাকবে। তোর রিকশাওয়ালা স্বামী তো সেই কবে হারিয়ে গেছে। প্রয়োজনে আবার বিয়ে করবি। আবার তোর গাদা গাদা ছেলে-পিলে হবে। তোদের বিয়েতে তো তেমন খরচ নেই। চিন্তা কীসের?

কথা শুনে চোখে জল এসে যায় সখিনার। মনে হয় পৃথিবীটা আপনা আপনি ফাঁক হলে সে তাঁর ভিতরে এখনই ঢুকে যেত। এত জ্বালা তাঁর আর প্রাণে সহে না।

গৃহকর্তা আবেদ সাহেবের অফিসে যাবার সময় হলো। তাঁকে এখনি নাস্তা দিতে হবে সখিনার। কাজের বুয়াদের সকালে কাজের চাপ বেশি। ঘড়ির কাঁটাও যেন এ সময়টা চড়কির মত দ্রুত ঘুরতে থাকে। হেঁশেলে দ্রুত রুটি তৈরীর কাজে ব্যস্ত সখিনা। এমন সময় আবেদ সাহেব সখিনাকে ডাকলেন।

- কৈ গো সখিনা,নাস্তা কী হয়েছে?

- একটু দেরি হইবে স্যার। আপনি টেবিলে বহেন। আমি আইলাম বইলা।

ওয়াশরুম হতে বের হয়ে সাজেদা বেগম দেখেন আবেদ সাহেব নাস্তা করছেন। আর সখিনা তাকে তাল পাখা দিয়ে বাতাস করছে। এ দৃশ্য দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন গিন্নি সাজেদা বেগম। রোগে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন তিনি। তারপর যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে তিনি এগিয়ে যান সখিনার কাছে। তাঁর হাত থেকে তালের পাখা কেড়ে নিয়ে তাকে একটা জোরে থাপ্পড় মারে।

- তোর এত বড় সাহস যে,তুই আমার সাহেবকে পাখার বাতাস দিস?

-বিদ্যুৎ নাই তাই স্যার কইলেন বাতাস দিতে।

-আর অমনি কাজে লেগে পড়লে। পরপুরুষের বাতাস দিতে খুব ভালো লাগে, তাই না? যাও, হেঁশেলে যাও। সেখানে কত কাজ পড়ে আছে।

মুখখানা কালো করে অন্য কাজে চলে যায় সখিনা। আসলে পুরুষ মানুষের সেবা করতে ভালো লাগে তার। মাওলানা সাহেবেরা বলেন পুরুষদের সেবা করতেই নাকি আল্লাহতালা মেয়েদের তৈরী করেছেন। বেগম সাহেবা যেন কেমন মানুষ। তাঁর পেটে শুধু হিংসে ভরা। আবেদ সাহেব তাঁর কাছে খুব ভদ্র মানুষ। তাকে দেখলে খুব মায়া হয় সখিনার। বেগম সাহেব কর্তাবাবুকে সব সময় খুব চাপে রাখেন। কোন সময় তাঁর সাথে হাসিমুখে কথা বলেন না। সাজেদা বেগমের বদমেজাজের কারণে সবসময় সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। শুধু মাসের এক তারিখে সাজেদা বেগমের মুখের হাসি দেখা যায়। সেদিন বিকেলে আবেদ সাহেব মাহিনা পেয়ে সমুদয় টাকা বেগম সাহেবার হাতে তুলে দেন। আর এ টাকাই তাঁর হাসির একমাত্র কারণ। সব কাজ শেষে তাকে গৃহকর্ত্রীর আদেশমত আতপ চাল পিষে আটা করতে হলো সখিনার। তা নাহলে যে ছুটি নেই তার।

বৈশাখের পড়ন্ত বিকেল। রোদ কমলেও তাঁর তাপ এখনো বিদ্যমান। চিতই পিঠা তৈরী শেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে সখিনা। সকালে বাসায় কাজে আসার সময় মেয়েটার অনেক জ্বর দেখে এসেছে। এখন সে কেমন আছে তা কে জানে? যাবার সময় সে প্রতিদিনের মতো গৃহকর্ত্রীকে বললো,

- আফা,আজকের মতো যাই।

- আচ্ছা শোন। একটা চিতই পিঠা তোমার মেয়ের জন্য নিয়ে যাও। কারণ তোমাকে এ পিঠা না দিলে আমার ছেলের আবার অসুখ-বিসুখ করবে যে? কারণ এ পিঠায় তুমি চোখ দিয়েছো। ছোট-লোকদের চোখ আবার কচ্ছপের চোখের মতো। মন্ত্রের মতো কাজ করে।

কথাটা তীরের মত বিঁধলো সখিনার বুকে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা ছোট চিতই পিঠা হাতে নিয়ে বাসার দিকে রওয়ানা দেয় সখিনা। একটা ডালিমের বড় আশা ছিল তার। মনে মনে ভাবে, বড়লোকেরা গরীবের দুঃখ বোঝে। আজ তাঁর স্বামী বাড়ি থাকলে যে করেই হোক একটা ডালিমের জোগাড় করে দিত সে। কিন্তু হায়রে কপাল! সে ভাগ্যও আজ তাঁর নেই। লোকটা কী যে ভেবে সংসার ছেড়ে পালালো তা সেই জানে। আজও সে আর ফিরে এলো না তাঁর নিজের বাড়িতে। পুরুষ মানুষেরা নিজের ছেলে-মেয়ে ফেলে সহজেই চলে যেতে পারে। ছেলে-মেয়ের মায়া-মমতাও তাদের ঘরে ফিরতে পারে না। কারণ পুরুষেরা সংসারের মায়ামমতা বুঝে না। তারা মৌমাছির মত মধু খেয়ে সরে পরে। ভুলেও পিছন ফিরে আর তাকায় না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে একলা বসে বসে কাঁদে সে। তাঁর স্বামীর মত অমন সুঠাম দেহের অধিকারী সুপুরুষ আর বাবরি চুলের মানুষ সে আর দ্বিতীয়টা দেখেনি। মাঝে মাঝে স্বপন দেখে সে। জোনাকীভরা অমা রাতে কে যেন নাম ধরে ডাকে তাকে। সে ডাকে কুপি হাতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সখিনা। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কেউ নেই। তারপর ব্যর্থ আশা বুকে নিয়ে ফিরে যায় সে তাঁর চিরচেনা তেল চিটচিটে বিছানায়।

সারা আকাশ তখন কালবৈশাখী মেঘে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যার আর বেশি বাকি নেই। এখন দু'মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে তাকে। জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চলছে সে। কিছুদূর গিয়ে তাঁর সামনে পরে আমজাদ শেখ। তাকে দুষ্টু প্রকৃতির লোক হিসেবেই জানে সখিনা। হঠাৎ সখিনার পথ রোধ করে দাঁড়ায় সে। তাঁর মতিগতি বেশি ভালো মনে হয় না সখিনার কাছে। চকিতে তৈরী হয়ে নেয় সে।

- কী ব্যাপার পথে দাঁড়াইলা যে? পথ ছাড়ো?

- আমাকে অমন পর ভাবো ক্যান সখিনা? আমি তোমারে ভালাবাসি গো।

- তোমার না বউ আছে আমজাদ? তাঁর পরেও তুমি আমার দিকে নজর দ্যাও ক্যান?

- বউ আছে ঠিক। কিন্তু তোমার মত অতো হুন্দর না। সে দ্যাখতে কালা পেত্নির লাহান।

- এই দ্যাখ। কী দেখতেছাসে? এই ছুরি দিয়া তোরে ফাইরা ফালামু? গরীবের ইজ্জত অতো সস্তা না।

- ওমা! ওকি সখিনা। এমন করছো ক্যান? আমজাদের টর্চের আলোতে চকচকে ছুরি দেখে পথ থেকে

সরে দাঁড়ায় সে। মুখে বলে, ইস! মাগির দেমাক কত? তারপর দৌড়ের মত হেঁটে বাসায় যায় সখিনা। দূর থেকে টিপটিপ করে তাঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যায়। ঘরে গিয়ে সে দেখে তাঁর স্নেহের পুত্তলি ছোটমেয়েটা প্রচন্ড জ্বরে তখনও কাতরাচ্ছে।

- আমি আইছি মা। কোন চিন্তা নাই। তোমার লাইগা একডা চিতই পিডা আনছি মাগো। দ্যাখে দ্যাখো, কী সুন্দর চিতই পিডা?

- আমি পিডা খামু না মা। আমার তুমি একডা ডালিম আইনা দ্যাও। আমি ডালিম খামু। ডালিম খাইতে খুব মজা লাগে মা।

মেয়ের মুখের কথা শুনে চোখে জল এসে যায় সখিনার। মনে হয় আবার সে ফিরে যায় তাঁর গৃহকর্ত্রী সাজেদা বেগমের কাছে। সেখানে গিয়ে আরো বেশি বেশি করে কেঁদে তাঁর কঠিন মনটাকে নরম করে একটা ডালিম নিয়ে আসবে সে। কিন্তু তক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, সামনে অন্ধকার রাত। তেলের কুপিতে তেল ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। ঘরের আবছা আলোতে মেয়েটা হঠাৎ নড়াচড়া করে উঠে। কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সখিনা,

- কিছু বলবা মা?

- একডু পানি। আমি পানি খামু মা। ঐ দ্যাখ মা, আমার সামনে কে যেন আইসা দাঁড়াইছে?

তাড়াতাড়ি গেলাসে পানি নিয়ে মেয়ের মুখের কাছে এগিয়ে ধরে সখিনা। কিন্তু তখন তাঁর মুখে আর কোন সাড়াশব্দ পেলনা সে। মুখে পানি দেয়ার চেষ্টা করলেও পানি গড়িয়ে পড়লো তাঁর দু'গন্ড বেয়ে। আকাশে মেঘের গর্জন যেন আরো বেড়ে গেল সে সময়। চারদিকে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। ঝড়ের ঝাপটায় মুহূর্তে উড়ে যায় তার সুখ দুখের ছোনের ঘরখানি। জ্বলন্ত দুর্বল কুপিটা দপ করে নিভে যায়। বড় মেয়েটা চিৎকার করে উঠে। তাঁর সে কান্নার আওয়াজ ভেসে যায় প্রচন্ড বাতাসের তোড়ে পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে নয়, দূর কোন অজানায়।

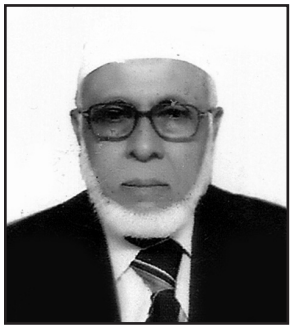

পিতার স্বপ্ন

মো: মুস্তাফিজুর রহমান
সদস্য, যশোর জেলা সমিতি

উপজেলা মনিরামপুর, ইউনিয়ন চালুহাটি, গ্রামের নাম আটঘরা। অতীতের কোন এক সময় আটঘর বা আটটি মাত্র পরিবার নিয়ে গ্রামটির সূচনা হয়েছিলো। এখন পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি। পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু গ্রামের নাম বদলায়নি, এখনও সেই আটঘরা। এই গ্রামের একটি সরদার পরিবার, পরিবারের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছে সরদার বংশ। এই বংশের একজন ব্যক্তির নাম সাদেক আলী সরদার। গ্রামের বাইরে ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামেও তাঁর রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। তাঁর মূল জীবন জীবিকা হলো জমিজমা চাষাবাদ। কৃষিকাজ এখন নিজে করেন না। জনকিষান দিয়ে করানো হয়। ধানচাল তরিতরকারির উৎপাদন যেমন আছে তেমনি পুকুরে মাছেরও রয়েছে বেশ ভালো ফলন। মাছতরকারি ধানচালের আবাদ, ফসল এখন তাঁর আগের মতো নেই। ভবদহ গেট, নদীনালার ভরাট অবস্থা। এখন জন জীবনের ঘটেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

সাদেক আলী সরদার রাজগঞ্জ স্কুলে শৈশবে, কৈশোরে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু স্কুলের সীমানা পার হওয়ার আগেই পারিবারিক বিপর্যয়ে তাঁর পড়াশোনা অগ্রসর হতে পারেনি।

নিজের জীবনের এই শিক্ষাদীক্ষার ঘাটতি পূরণে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। ছেলে শফিকুল ইসলামকে লেখাপড়া করিয়েছেন সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শফিকুল ইসলাম কৃতিত্বের সাথে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেছে। বি সি এস পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্যের মাধ্যমে সে এখন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

সাদেক আলী সরদার এখন বাওড়ের বাতাস বুকভরে গ্রহণ করেন। অপরিসীম স্বস্তি আর শান্তির স্পর্শ তিনি দেহমন জুড়ে অনুভব করেন। বয়স বেড়েছে, মন টানে একবার শহরে ছেলে-বউমার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি। আবার এই সুযোগে একজন বড় ডাক্তার দেখিয়ে আসা যাবে। যাতে বাকি জীবনটা সুস্থতায় কেটে যায়। সুস্থতার শান্তি একটি অন্যরকম আনন্দ।

সকালে ঘর থেকে বের হলেন সাদেক আলী সরদার। মহানায়কের মতো, একজন গর্বিত পিতা হেটে চলেছেন। পথ চলতে পরিচিতদের জানতে ভুল করলেন না, যশোর শহরে ছেলে শফিকুলের

বাসায় যাচ্ছেন। কাঁধ ঝুলছে ব্যাগ, তাঁর ভেতরে কাপড়চোপড় রয়েছে, আরও রয়েছে শফিকুলের মায়ের হাতে বানানো কিছু শুকনো পিঠে। এসব পিঠে বউমা খুব পছন্দ করে।

ফকির রাস্তার মোড়ে এসে সাদেক আলী সরদার যশোরগামী বাসে উঠলেন। বাসে খুবভীড় সিট পাওয়া কঠিন। তবুও কষ্ট নেই, ছেলের বাড়ি যাবার আনন্দের কাছে এতটুকু কষ্ট অতিতুচ্ছ। শহরে পৌছাতে বেলা বেশ বেড়ে যায়। রিক্সা চড়ে বিশাল বেসরকারি এক হাসপাতালের সামনে নামলো। লোকেলোকারন্য, অসংখ্য রোগীর ভিড়। ঢাকা থেকে এসেছে একজন খুব বড় ডাক্তার। তবে সিরিয়াল করানোর পর ডাক্তার দেখানো যাবে। সিরিয়াল করাতেও আরেক সিরিয়াল। শেষ পর্যন্ত সিরিয়াল করানো গেলো। এবার অপেক্ষার পালা। দুপুর বিকেল সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলো। সময় মত মসজিদে আযান হচ্ছে আর নামাজ কালাম পড়া চলছে। হালকা খাওয়া-দাওয়াও করতে হচ্ছে। নইলে চিকিৎসার জন্যে এসে রোগ ব্যাধি বাড়ানো যাবেনা।

সাদেক আলী সরদারের সিরিয়াল পাওয়া গেলো তখন রাত সাড়ে নয়টা। মজার ব্যাপার হলো, ডাক্তার দেখিয়ে বাইরে আসার সঙ্গেই হাত থেকে একজন অচেনা লোক প্রেসক্রিপশনটা কেড়ে নিলো। সাদেক আলী সরদার অবাক হয়ে জানতে চাইলো বাবাজি আপনাক তো চিনলাম না। ডাক্তারের কাগজ কেড়ে নিলেন কেন? অচেনা লোকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রেসক্রিপশনটা পড়তে শুরু করেছে। সাদেক আলী সরদার তাগিদ দিলো। ডাক্তারের কাগজখানা ফেরত চাইলো। লোকটি কোন গুরুত্ব দিলো না। কেমন যেন মিন মিন করে বললো

ঃ দেখছি।

ঃ ডাক্তারের কাগজ দেখছেন। আপনি কি ডাক্তার?

ঃ না। দেখছি। একটু কাজ আছে।

ঃ আপনি ডাক্তার না, তবে ডাক্তারের কাগজে আপনার কী কাজ?

পাশের একজন চিকিৎসাপ্রার্থী লোক সাদেক আলী সরদারকে বুঝিয়ে দিলো উনি ডাক্তার নন, ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি। উনার কাজ হলো ডাক্তারদের মাধ্যমে কোম্পানির ঔষধ চালু করা। ডাক্তার সাহেব আপনার প্রেসক্রিপশনে তাঁর কোম্পানির ঔষধ লিখেছেন কিনা, তাই পড়ে দেখছেন।

সাদেক আলী সরদার একটা বিষয় বুঝতে পারলেন না, ডাক্তার সাহেব যে রোগের যে ঔষধ তাই লিখবেন, রোগের চেয় কোম্পানি বড়। কোম্পানির ঔষধ কেন লিখবেন তাতে মানুষের রোগ ব্যাধি ঠিকমতো সারবে তো? আসলে আল্লাহ ছাড়া কারও উপর কোন ভরসা নেই।

এত কঠিন ভাবনা, সাদেক আলী সরদার আর ভাবতে চাইলেন না। রাত বেড়েছে, রিক্সা ডেকে রওনা হলেন ছেলের বাসায়। বাসার দরজায় গিয়ে বেল টিপলেন, অল্পক্ষণ পরেই ছেলে শফিকুল ইসলাম সরদার দরজা খুলে দিলো। ছেলে অবাক, পিতাকে দেখে

ঃ আব্বা, তুমি এত রাতে কীভাবে এলে?
ঃ রাতে নয়রে, দিনেই এসেছি। ডাক্তারের সিরিয়াল এতবড় যে, রাত হয়ে গেলোরে বাবা।
ঃ তুমি একটা খবর দিলেও তো পারতে। বস, বাথরুমে যাও, হাতমুখ ধোও আমি ভেতর থেকে আসছি।
ঃ শোন, শোন, তোর মা বউমার জন্যে কিছু শুকনো পিঠে দিয়েছে। ভেতরে নিয়ে যা।
পিঠের পুটলাটি নিয়ে ছেলে ভেতরে গেলো। সাদেক আলী বসলেন, তারপর জামা কাপড় বদলাতে থাকলেন। এরপর সুস্তির হয়ে বসেছেন। এমন সময় ভেতর থেকে মৃদু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো
ঃ দেখো, তোমার বাপ এলেন, এত রাতে, এখন রান্না-বান্না করবে কে? আমি পারবো না।
এবার ছেলের কণ্ঠস্বর কোনো গেলো ঃ
ঃ আস্তে, আস্তে। আব্বা শুনতে পাবে।
ঃ আমার শরিরটা ভালো নেই। যা ভালো বোঝ কর।
সাদেক আলী সরদার বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ সংলাপ চলছিলো, ছেলে-বউমার মধ্যে ভেতরে তাঁর অনুতাপ জেগে উঠলো। আসলে এত রাতে আসাটা উচিত হয়নি। কিন্তু ডাক্তার দেখতে গিয়েই তো দেরী হয়ে গেলো। ছেলে এসে জানালো
ঃ আব্বা, তুমি কিছু মনে করোনা। তোমার বউমা অসুস্থ, রান্না ঘরে যেতে পারছে না।
ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। বউমাকে ডাক্তার দেখাসনি ক্যান।
ঃ কালকে নিয়ে যাবো ডাক্তারখানায়। আব্বা তুমি এক কাজ করো। ঐ রাস্তার মোড়ে একটা হোটেল আছে। ওখানে কষ্ট করে যাও, খেয়ে আসো, আমি টাকা দিচ্ছি।
ঃ আরে না, টাকা লাগবে না। টাকা আমার কাছে আছে।
তবুও ছেলে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট পিতার হাতে জোর করে গুঁজে দিলো। পিতা বাইরে গিয়ে হোটেল থেকে খেয়ে এলো। ঘরে এসে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পিতা শুয়ে পড়লো। ছেলে বিছানার চারপাশে মশারি গুঁজে দিলো।
পিতা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝ রাতে ছেলে পিতাকে ডেকে তুললো।
ঃ আব্বা উঠ, উঠ।
ঃ এত রাতে ডাকছিস কেনো? কি হয়েছে?
ঃ কিছু হয়নি আব্বা। খেয়ে নাও। পিতা বিস্ময়ে হতবাক। বউমার শরীর খারাপ। আবার খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি।
ঃ কি বলিস, খেয়ে নাও। বউমার শরীর খারাপ। আবার ডাকাডাকি করিস।
ঃ আব্বা, শোনো। তুমি ঘুমানোর পর রাতে শ্বশুর আব্বা এসেছেন। তোমার বউমা আবার রান্না করেছে। তাই তোমরা দু জন একসাথে খেয়ে নাও।
ঃ নারে, পাগল। আমি হোটেল থেকে খেয়ে আসলাম। আমার ক্ষিধে নেই। তোর শ্বশুরকে খাবার দিগে, যা।
সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ-কালাম পড়ে নিলো সাদেক আলী সরদার। বাড়ি ফিরতে হবে।

কাপড়চোপড় ব্যাগে গুছিয়ে নিলো। ছেলেকে ডাকলো। ছেলে বেরিয়ে এলো।
ঃ আব্বা, ডাকছো কেন?
ঃ আমি এখন বাড়ি যাবো।
ঃ বাড়ি যাবে, এখন না, সকালে খেয়ে দেয়ে তারপর যেও।
ঃ নারে, তোর মা একা রয়েছে। জানিস তো তোর মার আবার ভয় বেশি।
পরে আবার আসবো, বাইরের গেট খুলে দে। বউমার শরীর খারাপ, বেয়াই ঘুমোচ্ছে, তাদের ডাকার দরকার নেই।

পিতাপুত্র বাইরে এলো। এবার পিতাপুত্রের বিদায়ের পালা। রাতের পঞ্চাশটি টাকা পিতা পুত্রের হাতে গুজে দিলো। বিস্মিত পুত্রের জিজ্ঞাসা,
ঃ আব্বা, টাকা ফেরত দিচ্ছ কেন? হোটেলে ভাত খাওনি।
ঃ আমার কাছে টাকা ছিলো, খেয়েছি।
ঃ নিয়ে যাও বাস ভাড়া লাগবে।
ঃ আমার কাছে টাকা আরও আছে। রেখে দে কাজে লাগবে।
কয়েক পা গিয়ে ফিরে এলো পিতা। পুত্রের পিঠে হাত রেখে বললো ঃ
ঃ বাবা, মনে কষ্ট রাখিস নে। আমি আবার আসবো।
আর শোন, বউমাকে ডাক্তার দেখা।

পিতার পা দু'টি হয়ে উঠলো চঞ্চল, অস্তির। পুত্র দাঁড়িয়ে আছে। একজন হাঁটছে, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। কার মনে কী কষ্ট কেউ জানতে পারলো না, কেউ তা বুঝতে পারলো না। পারলো না অনুভব করতে।

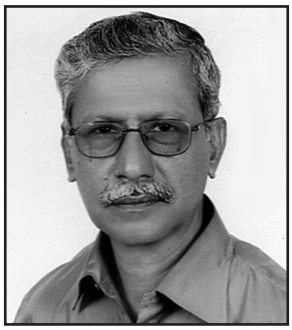

ছোবল

পরেশ কান্তি সাহা।
আজীবন সদস্য -২৮৮
মাগুরা জেলা সমিতি

বড় ভাই নীলকান্ত ভেবেছিল তাঁর বোধহয় সুদিন আসবে - কারণ বাবা জমিজমা রেখে গেলেও সেগুলো দেখাশোনো করে সেখান থেকে সোনা ফলাইতো এই বিশ্বাস পরিবারটি এ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। শহরতলীতে বাড়ী। পাড়ায় এদের একটা সুনাম আছে। নীলকান্ত যখন এসএসসি পরীক্ষা দেবে, ঠিক সেই সময়ে বাবা একটা সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই নীলকান্তর আর পরীক্ষা দেয়া হয়নি। সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে নীলকান্তের উপর। চার বোন এবং ছোট ভাই রতিকান্তকে মানুষ করা হয়ে উঠে তাঁর জীবনের ব্রত। যদিও এ কাজ করতে যেয়ে বিশেষ করে বোনদের বিয়ে দিতে গিয়ে কিছু জমি বিক্রি করতে হয়েছিল - কিন্তু সান্ত্বনা তাদেরকে যোগ্য পাত্রে পাত্রস্থকরেছিল। কর্তব্য পালন করতে যেয়ে নীলকান্ত তাঁর নিজের বিয়ের কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। মা ও পঙ্গু বাবা যদিও ইতিমধ্যে কয়েকবার তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু বারবারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর একে একে চার চারটে বোনকে বিয়ে দিয়েছে এবং রতিকান্ত বি,এ পাশ করার পরই না নীলকান্ত পরম সুন্দরী পরমাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। সুখের সংসারে আসে অনাবিল প্রশান্তি। নীলকান্তর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয় রতিকান্ত। দু'ভাই মিলে ব্যবসারও বেশ প্রসার ঘটছিল। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বর্গা দেয়া জমির ফসলগুলো ঘরে তোলার জন্য জনদের সঙ্গে কাজের সহযোগিতা করা। নীলকান্তর ধাতে সয়ে গেছে।

ভাদ্র মাস। চারদিকে বর্ষার জলে থৈ থৈ করছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কুমার নদ। শুষ্ক মৌসুমের চেহারা আর বর্ষার চেহারা একদম ভিন্ন। এখন আর পাল তোলা নৌকা দেখা যায় না - দু'চার খানা যা দেখা যায়, তা হলো মাছ ধরার নৌকা। যেখানে এক সময় স্টীমার চলেছে, যুগের বিবর্তনের মাঝ দিয়ে সেখানে নৌকা পর্যন্ত চলে না। পশ্চিমাকাশ মেঘমুক্ত হলেও পূর্ব আকাশে মেঘের ভেলা লুকোচুরি করছে। এরই ফাঁকে বিরাট একটা রংধনু উঠেছে। গোধূলি লগ্নে একদিকে এই রংধনু আর কুমার নদের স্রোতধারা নির্নিমেষে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পরমা ও নীলকান্ত।

বাড়ীর পাশের ডোবাতে পাটের জাগ দেয়া আছে। জনেরা ঐ পাট ধুয়ে গাদা করে রেখেছে। সন্ধ্যা আগত। তাই জনদের কাজে সহায়তা করার জন্য নীলকান্ত পরমাকে বললো

- তুমি বস, আমি ধোয়া পাটগুলো বাড়ীতে নিয়ে যেতে জনদের একটু সাহায্য করি।

- ঠিক আছে, যাও।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পায়ে চলা পথ। দু'ধারে গাছ। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ নীলকান্তর চিক্কার

- তোরা সব তাড়াতাড়ি আয়, সাপ আমার পায়ে কামড় দিয়েছে, তোরা সব তাড়াতাড়ি আয়।

চিৎকার শুনে পাশের জনেরা এবং পরমা ছুটে আসে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে নীলকান্ত। মুখ দিয়ে গুগলা বের হচ্ছে। নীলকান্তর মুখের রং হয়ে যাচ্ছে নীল। তাই তাড়াতাড়ি করে গামছা দিয়ে পরপর তিনটা বাঁধন দিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে আসে বাড়ীতে। চারদিকেতো হুলুস্থুল। দোকান থেকে রতিকান্ত এসেছে। এখানকার

নামকরা ওঝা কানাই ফকিরকে ডেকে আনা হয়। শুরু করে দেয় বিষ নামাতে। প্রায় দু'ঘন্টা পর নীলকান্তকে কিছুটা সুস্থ বলে মনে হলো।

যাবার বেলা কানাই ফকির বলে গেল - আপাতত এ যাত্রা রেহাই পেলে। তবে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল যে গামছা দিয়ে তিনটে বাঁধন দিয়েছিল। রতিকান্ত কানাই ফকিরের হাত ধরে বলে

- চাচা, ভাগ্যিস আপনি বাড়ী ছিলেন, তা না হলে যে কি বিপদ হতো।

- না না রতিকান্ত, এটা ঠিক নয়

- সবই আল্লাহর রহমত, বলে বিদায় নিল কানাই ফকির।

সারা রাত ধরে সেবা শুশ্রুষা করে পরমা, অবশ্য রাত বারটা অব্দি মাও সঙ্গে ছিল। একটু ঘুমের ভাব হলে মা চলে যায়। তাঁর নিজের ঘরে। যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দেবার শব্দে পাতলা ঘুমটা ভেঙে যায় নীলকান্তর। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পরমা বলে - কি ফাঁড়াটাই না গেল আজকে। ভাগ্যিস লোকজন কাছে ছিল।

- না না পরমা, এ নিয়ে তুমি ভেবো না। দুর্ঘটনা তো আসতেই পারে, সামলে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

-২/৩ দিন পরই নীলকান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

এই ঘটনায় দু'মাস পর পঙ্গু বাবা হার্ট স্ট্রোকে মারা গেল। যদিও পঙ্গু অবস্থায় বাবা সংসারের কোন কাজে আসতো না, তবুওতো যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মাথার উপর বটবৃক্ষ হয়ে ছিল। এই অভাবটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করলো নীলকান্ত ও রতিকান্ত। তবে বাবার অবর্তমানে মা ভেঙ্গে পড়লো এবং এক পাশ পক্ষাঘাত হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

যথাসময়ে পরমার কোল আলোকিত করে এলো নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের আগমনে বিশ্বাস পরিবারটি নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরুকরলো। কারণ এই নবজাতকই তো তাদের একমাত্র ভাবী বংশধর। স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে উঠে নিরঞ্জন। দু'বছর যেতে না যেতেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে পরমা। রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অনেক পরীক্ষা নিরক্ষার পর ধরা পড়লো জরায়ুতে ক্যান্সার হয়েছে। যে কারণে জরায়ুটা অপারেশন করে বাদ দিতে হয়। এ অবস্থায় সংসার অচল হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই রতিকান্তকে বিয়ে দিয়ে অনন্যাকে বৌ হিসেবে ঘরে আনে। তিন বছর বাদে অনন্যার কোলে আসে ফুটফুটে মেয়ে অন্তরা।

নিরঞ্জনের বয়স ৮ বছর। স্কুলে ভর্তি হয়েছে ক্লাস টুতে। ভীষণ দুরন্ত, আর এই বয়সে সবাই দুরন্ত হয়, তবে নিরঞ্জনটা একটু বেশী।।

শ্রাবণের শেষ। বর্ষাটা এবার একটু দেরীতেই এসেছে। কুমার নদের দু'কূল ভরে উঠেছে জলে - আর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতি বর্ষণ ফলে পাড় ভাঙতে শুরুহয়েছে।

সারাদিন বৃষ্টি হলেও বিকেলটা ছিল মেঘমুক্ত। মাঝে মাঝে সূর্যের আলো নদের ঢেউয়ে পড়ে আলো আঁধারীর খেলা খেলছিল। এ সময় নিরঞ্জন দু'বন্ধু সহ এসেছে বড়শী দিয়ে মাছ মারতে। ইতিমধ্যে দু'টো সরপুঁটি মাছও পেয়েছে। তৃতীয় বারের মাছটা ধরতে যেয়ে যেইনা ছিপ টান দিয়েছে, অমনি পা ফসকে পড়ে যায় স্রোতের জলে। আসে পাশে বড় কোন লোকও ছিল না। দুই বন্ধু বাড়ীতে যেয়ে খবর দেয়। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো পুরো বিশ্বাস পরিবার সহ প্রতিবেশীরা; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে পরদিন দুপুরে ব্রীজঘাটে জেলেদের জালে পাওয়া গেল নিরঞ্জনের লাশ। একমাত্র সন্তান হারা হয়ে মা-বাবা ভেঙে পড়লো অথৈ সমুদ্রে। কিন্তু জীবনতো থেমে থাকে না - সে চলে তাঁর নিজের গতিতে। সেই গতিহারা পথে চলতে চলতে নীলকান্ত ও পরমা ভেসে চললো জীবনের ভাসমান স্রোতে।

কথায় আছে খোঁড়া পা-ই খাদে পড়ে। নীলকান্তর ঘটনাও তাই ঘটলো। একমাত্র ছেলে নিরঞ্জনের মৃত্যুর

৬ মাস যেতে না যেতেই ঘটলো আর এক দুর্ঘটনা। ইদানিং সে কোথায় যাচ্ছে, কি করছে সব কিছুতেই দিশেহারা। এমনকি রাস্তা পার হতে ডান বাম যে দেখে নিতে হয়, সে কথাটাও বেমালুম ভুলে গেছে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। কালীবাড়ী পুজো দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে নীলকান্ত যখন রাস্তা পার হচ্ছিল, ঠিক তখনই একটা মোটর সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে পড়ে রাস্তার উপর। আসে-পাশে লোকজন ধরাধরি করে ভ্যানে করে নিয়ে গেল হাসপাতালে। মাথার আঘাতটা কম হলেও ডান পা-টা খন্ড বিখন্ড হয়ে গেছে। খবর পেয়ে সবাই ছুটে গেল হাসপাতালে। পরমাতো হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। দু'জনেই ভর্তি হলো হাসপাতালে। দু'ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ী থেকেই লোকজন এলো। পরদিন হাসপাতাল থেকে রিপার্টে দিল - এ রোগীর চিকিৎসা এখানে হবে না, আপনারা ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যান।

কি আর করা যাবে -- ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য রতিকান্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। পরদিন ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

বিকেল বেলা রতিকান্তর শ্বশুর রতিকান্তকে পুকুরপাড়ে ডেকে নিয়ে বললো-

- বাবাজী, তুমি আমার জামাই, তোমার ভালোমন্দ দেখাটা আমার কর্তব্য। ভাইয়ের চিকিৎসা করাটা তোমার কিন্তু সেই চিকিৎসা করতে যেয়ে যদি তুমি পথের ফকির হও, সেটাতো আমি বসে বসে দেখতে পারি না।

- তা হলে কি করতে বলছেন?

- দেখো বাবাজী, নীলকান্তর অবস্থা ভাল না। কি হয় না হয়, সেটাও বলা যাচ্ছে না। তা ছাড়া চিকিৎসা করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকাটা তুমি দেবে কেন? তাঁর সম্পত্তি আছে, সেই সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর চিকিৎসা কর। আর দ্বিতীয়ত পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকলেও সে নিঃস্বন্তান এবং তাঁর সম্পত্তি নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী পরমাকে লিখে দেবে আর তখন পরমা তোমার আশ্রয় নেবে না- নেবে তাঁর ভাইদের আশ্রয়। এ ক্ষেত্রে লাভবান হবে পরমার ভাইয়েরা - তুমি নও। তাই ফাঁকতালে পড়বে তুমি। তাই বলছিলাম কি, তুমি একজন ভালো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ কর- বলে কানে কানে আরও কিছু বললো যা দূর থেকে বোঝা গেল না।

পরামর্শটা রতিকান্তর মনে ধরলো। তাই শ্বশুরের কথায় দ্বিমত পোষণ না করে চলে গেল শহরের নামকরা উকিল আলী হোসেনের কাছে। উকিলের কাছ থেকে যখন হাসপাতালে ফিরলো রাত তখন দশটা। রতিকান্ত নীলকান্তকে বললো

- দাদা, চিকিৎসা করতে তো অনেক টাকার প্রয়োজন। এখন জমি না বেঁচলে তো আর এতো টাকা যোগার করা যাবে না।

- কি করবি না করবি সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? যা করার তাই কর।

- তাহলে এই স্ট্যাম্পে সই করে দাও।

- দে, কোথায় সই করতে হবে, করে দিচ্ছি। আমাকে একটু ধর, বলে স্ট্যাম্পে সই করে দিল নীলকান্ত।

পরদিন নীলকান্তকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে গেল। বিভিন্ন পরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিলো পা কেটে ফেলতে হবে। বাড়ীতে এই কথা শোনা মাত্রই পরমা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। এমনকি তাকে সেবা শুশ্রষা করার মতো আর কেউ নেই, কারণ তাঁর দাদা-বৌদি এসেছিল, তারাও চলে গেছে। তা ছাড়া বাড়ীতে এখন কেউ আর তাকে সহ্য করতে পারে না। কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধে - বিশেষ করে ছোট বৌ অনন্যা এখন ভীষণ মুখরা হয়ে উঠেছে এবং প্রায়ই পরমাকে বলে -

- ছেলেকে খেয়েছিস, স্বামীকে খাচ্ছিস, এরপড় তো আমাদের খাবি। অপয়া, আটখুড়ো, তোর মুখ দেখলেও।

অযাত্রা। অসহায় পরমা নীরবে সব সহ্য করে। গোচরে, অগোচরে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে নিজেকে ভাসায়। হাত তুলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে - ঠাকুর, আমিতো আর পারছি না, এবার তুমি আমাকে নাও। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারদের পরামর্শ মতো নীলকান্তর পা কেটে ফেলতে হয়। ৬ মাস চিকিৎসার পর যখন বাড়ীতে এলো তখন হাড্ডিসার পঙ্গু নীলকান্ত সংসারের এক জঞ্জাল মাত্র। দুই দু'টো প্রাণী বসে বসে সংসারে খাবে, তা তো হয় না। ছোট বৌ অনন্যা সত্যি সত্যি অনন্যা হয়ে উঠেছে। এতো মুখরা যে, দৈনিক ঝগড়া বিবাদ বেঁধেই থাকে। পরমা সংসারে ঝিয়ের মতো কাজ করে, কারণ তাঁর স্বামী অকর্মণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও টিকতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে নীলকান্ত বলে -

- রতিকান্ত, এ ভাবে তো চলে না, আমাদেরকে না হয় পৃথক করে দে।

- পৃথক করে দেবো আরকি। তোমার চিকিৎসা করতে যেয়ে তোমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছি।

- সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিস?

- হ্যা, তারপরও আমার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করেছি।

- সম্পত্তি কার কাছে বিক্রি করলি?

- ঐ মুহূর্তে সম্পত্তি আর কে নেবে? বাধ্য হয়ে আমাকেই নিতে হলো।

- তা হলে তো এ বাড়ীতে এখন আর আমাদের থাকা চলে না।

- সেটা আর আমি কি বলবো।

- ঠিক আছে, অন্ততঃ আজকের রাত্তিরটা থাকতে দে।

পাশ থেকে উঠে গেল রতিকান্ত। দরজার পাশ থেকে অনন্যা শুনছিল তাঁর স্বামী ঠিকঠাক কথাগুলো বলতে পারছে কি না।

নীলকান্ত ও পরমা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। এরপর নীলকান্ত পরমাকে বললো

- আমি একটু মায়ের ঘরে যাব।

পরমা বললো - চল।

ক্রাচের উপর ভর দিয়ে মায়ের ঘরে যেয়ে বাকশক্তিহীনা মাকে হাত জোড় করে প্রণাম করে বললো

- মা, আর তো সময় পাব না, রতিকান্তকে তুমি দেখো।

মা কথা বলতে না পারলেও চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল।

নীলকান্ত ও পরমা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেও কারও চোখে ঘুম আসেনি। ভোরের আযান হতে না হতেই নীলকান্ত পরমার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে একবার পিছনে ফিরে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শেষ প্রণামটি করতেই প্রতিবেশী অনন্ত বললো -

- এই ভোর-বিহানে কোথায় চলছো নীলকান্ত দা?

উত্তরে নীলকান্ত বললো

- কোথায় চলছি তা তো জানিনেরে ভাই, যেতে থাকি। এই বিশাল পৃথিবী এ দুটো প্রাণীর জন্য কি একটু ঠাই দেবে না? কথাগুলো বলতে বলতে ক্রাচের উপর ভর দিয়ে অন্ধকারে পা বাড়ালো নীলকান্ত আর পরমা।

অবসরে যাওয়া হলো না

মোঃ লুৎফর রহমান জোয়ার্দার
সদস্য নং আ-৯৯০
কেন্দ্রীয় সমিতি

আমরা অনেকেই তো বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সদস্য এবং ষাটোর্দ্ধ প্রবীণ, না কি! কার্যক্ষমতা নেই বলেই সদাশয় সরকার বিধান মতে আমাদেরকে চাকুরী থেকে অবসর দিয়েছে। কিন্তু অবসর প্রাপ্ত হয়েও এ পর্যন্ত আমরা কি সত্যিই অবসর নিতে পেরেছি! নাহঃ পারিনি। থাক সে কথা। আজ এমনই একটা গল্প বলছি, শুনুন।

আমার ফ্লাটের উপরে পাঁচতলার নিজস্ব ফ্লাটে বসবাস করে মঈনউদ্দিন আহমেদ নামের অবসরপ্রাপ্ত মাঝারী পর্যায়ের এক সরকারি কর্মকর্তা। দশ-এগার বছর আগে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছে। দেখতে খুব একটা সুন্দর না হলেও সৌম্য মার্জিত ও স্বাস্থ্যবান। একটু ময়লা চেহারা আর কি! তা হোক, অন্তর যথেষ্ট পরিষ্কার। প্রশাসনে চাকুরী করলেও একেবারে বে-রসিক নয়, সাদাসিধে গোছের। কিছুটা সংস্কৃতি চর্চা করে বলে মনটাও উদার, সব মিলিয়ে ভালোই মনে হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি এ ফ্লাটে বসবাস করছি। আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোটই হবে। আমার স্ত্রীকে সে আবার আপা বলে ডাকে। অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকায় তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সুবাদে অবসর সময়ে ভবসংসারের অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে বিনিময় হয়।

যাক গে- আমি কোনদিনই কারো পারিবারিক বা ব্যাক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আর পছন্দও করিনা। বলতে পারেন, অনেক কিছু দেখেও না দেখার, অনেক কিছু শুনেও না শুনে থাকি। তবে আমাকে কেউ জানালে আমি তো আর না করতে পারি না। ধৈর্য ধরে শুনতেই হয়। কিছু করতে না পারলেও নিদেনপক্ষে একটু সহানুভূতি জানানো বা একটু সুপরামর্শ দিলে তো ক্ষতি নেই।

সেদিন সকালবেলা নাস্তা খেয়ে বাইরের ঘরের সোফায় বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছি। সাইড টেবিলে গিন্নী এক কাপ গরম চা রেখে গেল। আর যা-ই হোক,স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই গিন্নী আমার খাওয়া দাওয়া বিশেষ করে সকালে নাস্তা খাওয়ার পর এক কাপ চা ঠিকই সামনে এগিয়ে দেয়। বন্দর নগরীতে সাত খুন মামলার রায়ের সংবাদে চোখ বুলাচ্ছি। পাপ বাপকেউ ছাড়ে না। হঠাৎ প্রধান দরজায় মৃদু খটখট শব্দ হলো। কাগজ টেবিলে রেখে দরজার ছিটকিনি খুলেই দেখি মিঃ মঈনউদ্দিন। একটু হাঁপাচ্ছে মনে হলো। হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানালাম- আরে মঈন সাহেব যে, এসো এসো,

ভিতরে এসো। মঈন সাহেব ভিতরে ঢুকলে আমি দরজা বন্ধ করে তাকে একটি সোফায় বসার ইঙ্গিত করলাম। সে বসে একটু দম নিচ্ছে। আওয়াজ পেয়ে এর মধ্যেই আমার গিন্নী, 'ভাই কেমন আছেন বলতে বলতে' ট্রেতে এক কাপ চা, এক গ্লাস পানি ও একটা পিরিচে কয়েকখানা বিস্কুট রেখে গেল।

মঈন সাহেবের বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম-"কী খবর, একটু বিব্রত মনে হয়! তা কেমন -আর কেমন আছি! কিছুটা বিতৃষ্ণভাব নিয়ে বলল-"খুউব ভাল আছি।" একটু দম নিয়ে আবার বলল- আপনি তো সবই জানেন, সেই দশ-এগার বছর আগে সরকারি চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছি। তারপর থেকে আল্লাহর নামে কবুল করা পরিবার নামের স্থায়ী কর্তৃপক্ষ অলিখিত শর্তসাপেক্ষে সংসারের তাবৎ কাজ করার জন্য আমাকে যে অতিরিক্ত চাকুরীতে নিয়োগ করেছে তা এ যাবৎ কাল ধরে বিশ্বস্তার সঙ্গে পালন করে চলেছি। মনে হয় এর কোন ব্যতিক্রম নেই। এর থেকে কোন মাফও নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বোধ হয় আর পারছি না।

-আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ আবার কী হলো?

-কী আর হবে! যা প্রতিদিন হয় আজও তাই। কোন ব্যতিক্রম নেই- আর হবেও না। এ জীবনে মনে হয় কোনদিন একটু অবসর নেওয়া যাবে না।

-আরে আজ আবার কী হলো তাই বল না!

-আর বলবেন না। এইমাত্র ফর্দ মোতারেক থলে ভর্তি বাজার বাসায় দরজায় পৌছে দিয়ে এলাম।

-ভালইতো, তাতে অসুবিধা কোথায়?

- অসুবিধা কোথায়, নাঃ! এই বয়সে এই ভারী বাজারের থলে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় তোলা কি সহজ ব্যাপার? দুই-দুটো ছেলে আমার। হায়রে! ছেলে হলে মানুষ খুশী হয়, কিন্তু কপাল আমার! দেখুন আমার কি দূরাবস্তা। তারা সকাল-সন্ধ্যে চাকুরী করে, সময় পায় না। আল্লাহ সবই দিয়েছে কিন্তু এই বুড়োকে সাহায্য করার কেই নেই। আমি নাকি অবসরপ্রাপ্ত, আমার কোন কাজ নেই। তাই এ সব আমার জন্য ফরজ। হায়রে কপাল আমার! আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করার পর আর মা-বাবার থাকে না। আবার এ কথাও ঠিক যে বিবাহিত জীবনে একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীর বা স্ত্রী তাঁর স্বামীর সব চেয়ে বিশ্বস্ত এবং আপন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ আমার! সবই আল্লাহর ইচ্ছে। তাঁর পরেও পান থেকে চুন খসলেই গিন্নী মুখ ঝামটা দিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করে 'বাজার করতে এতো দেরী হয় কেন? বাজারে ঘুরেঘুরে তো সস্তা দামে হাট কুড়ানো পঁচা জিনিষ কেনা ছাড়া টাটকা ভাল জিনিষ কপালে জুটল না। হাড় কিপটে কোথাকার!'

একটু দম নিয়ে আবার বলে-"ঐ যে কথায় কী যেন বলে-- স্ত্রীর চোখে সবাই ভাল কেবল স্বামী ছাড়া।

কী বলব ভাই, শীতের ভরা মৌসুমেও তরিতরকারির দাম কমলোনা! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার নীচে কোন তরকারী নেই! ইচ্ছে হচ্ছিল অনেকদিন পর গরুর গোশত খাব। কিন্তু ব্যাটা কসাই এক কেজি গোশতের দাম হাকল পাঁচ শত টাকা। মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরেও তো বার আনা এক টাকা সের গরুর গোশতো খেয়েছি, নাকি! সে তুলনা না হয় নাই করলাম। পিঁপড়ের মত দেশে লোক বাড়ছে, চাহিদা

তোমাবেক সরবরাহ নেই। তারপর মধ্যস্তভোগী দালাল-ফড়ের সিন্ডিকেটের গুতোয় জিনিষের দর কমে না। এদিকে অনেকের মত আমার পকেটে তো কুলায় না। তাছাড়াও পাঁচ দোকান ঘুরে ভাল মন্দ দেখে দাম করে জিনিষ কিনতে -হয়, রাস্তায় যানজট, তাই সময় তো একটু লাগবেই। কিন্তু তাঁর পরেও গিন্নীর নাক সিটকানি, আমি নাকি জিনিষ চিনি না। আমার কেনা কোন জিনিষই তাঁর পছন্দ হয়না। বলে পঁচা ওটা নরম। ডিম ময়লা কেন! ইত্যাদি।

এর পরেও তাঁর সেই এখন অভিযোগ আমি নাকি বাজার ঘুড়ে অল্প পয়সায় খারাপ জিনিস কিনে আনি। আমি হাড় কিপটে, খরচ করতে চাইনা। হায়রে কপাল এতো করেও গিন্নীর মন পেলামনা। ভাই আপনি তো জানেন সারা জীবনে বাড়তি পয়সা আয় করতে পারিনি, তাই বাড়তি পয়সাও খরচ করতে পারিনা। সংসারের প্রয়োজনে সরকারি চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর আট বছর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছি। এখন আর ভাল লাগে না। আমার সম্বল তো আপনি জানেন। অর্ধেক ছাড় দেওয়া পেনশনের কিছু টাকা আর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী এই সব মিলিয়েই আমার মাসিক আয়। মনে করেছিলাম ছেলেরা বড় হয়ে সংসারের হাল ধরবে, সুখে শান্তিতে দিন চলে যাবে। ওরা না পারলেও আমার যা আছে তাতে আমাদের বুড়া-বুড়ির কোন অভাব হবে না। তবে ভাগ্যি ভাল যে পেনশন পাওয়ার পর ব্যাংকের লোন ও নিজে কিছু টাকা জোগাড় করে ঢাকা শহরে মাথা গোজার ঠাই এই ফ্লাটটুকু করতে পেরেছিলাম। তবে হ্যা আল্লাহ্ রহমতে কারো কাছে হাত পাতিনা। জোর দিয়ে বলতে পারি আমার জানা মতে কারো কাছে আমি ধারী না। এই দেখুননা- এই এখনই গিন্নী খোটা দিয়ে বলেই ফেলল -"সারাদিন তো ঘরের মধ্যে বসে বাক্সে ছবি দেখ, হয় লেখালেখি কর, আর না হয় হারমোনিয়াম নিয়ে ভ্যা ভ্যা করো। কোন কাজ তো করতে হয় না। ঘরে বসে খেয়ে খেয়ে শুধু হাতীর মত শরীর বানাচ্ছ। আর আমি! সেই ভোর পাঁচটায় উঠে রাত এগারটার আগে একটু বিশ্রাম নিতে পারি না। এর মধ্যে ভোরে নামাজ পড়া, দরুদ ও তসবী পড়ি, সকালের নাস্তা, দুপুরের ও রাতের খানা তৈরী করি। এছাড়াও সকালে তিন ঘন্টা ও বিকালে তিন ঘন্টা আমার বুটিক শপ চালাই। কেউ তো আমাকে সাহায্য করে না। এর মধ্যে রেষ্ট নেব সে টাইম কোথায়! আমার হয়েছে মরণ।"

সত্যিই বেচারী একদম সময় পায় না। আমি আর দাঁড়াতে পারিনি। এটুকু শুনেই নীচে নেমে এসেছি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন- একথা ঠিক যে দুই ঘন্টায় - তার কাজের এক ছোটা বুয়া (কাজের মহিলা) ঝেড়ে-মুছে কেঁচে-ধুয়ে মাজা-ধোয়া করে তরকারী কেটে কুটে দিয়ে যায়, তবু সংসারের বাকী হাজারো কাজ তো মুখ বুজে তাকেই করতে হয়। কোন কাজ কোন কথা পছন্দ না হলে একটু বেশী চেঁচামেচি বা বকাবকি করে। আবার কানেও ঠিকমত শোনে না। হাঁটুতে ব্যথা, মাজায় ব্যথা। রোগের শেষ নেই। বেচারা! তার দীর্ঘ বিবরণ শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম- তোমার পুত্ররা তাদের বৌরা সংসারের কোন কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে না?

-ঐ যে বললাম না ভাই সাহেব-আজকাল ছেলেরা আর বাপ-মায়ের ছেলে নেই। এ কথা সত্য

যে ওরা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরে। তাছাড়া সন্তান-বৌ সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় পাবে কোথায়! বৌমারা তাদের ছেলে স্বামী সামলিযে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু কাজ করে বৈ কি। সরকারি চাকুরীকালে সংসারের টুকিটাকি অনেক কাজ করার জন্য। লোকের সহায়তা পাওয়া যেত। আর এখন! মুসকিল হলো প্রতি মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে পেনশন তোলা, সঞ্চয় পত্রের টাকা তোলা, সম্মানী তোলা, বিভিন্ন বিল পরিশোধের জন্য ব্যাংকে যাওয়া, দু তিন দিন পরপর বাজার সওদা হিসাবে বাজার করে আনা, সবই করতে হয়। এছাড়া রোগ শোকের জন্য মাঝে মধ্যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। আবার আত্মীয় স্বজনের অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়েও পারা যায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল- 'প্রতিনিয়ত একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। আর এসব করতে করতেই জীবন শেষ করে ফেললাম। তথাকথিত চাকুরী হতে অবসর পেলেও সংসার জীবনে অবসর পেলাম না।'

আমি বলাম-"কী আর করা। এইতো ভাই জীবন। যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিনই কাজ থাকবে। তারপরে প্রাণ নেই, কাজ নেই। সব শেষ। বাসায় যান, একটু ধৈর্য ধরে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি! সব ঠিক হয়ে যাবে। মঈন সাহেব গাত্রোত্থান করে চুপচাপ বাসার দিকে রওয়ানা হলেন। - সোফায় বসতে বসতে ভাবলাম-আমরা তথাকথিত চাকুরী হতে অবসর নিয়েও স্বেচ্ছায় বরণ করা সংসার জীবনে আমরা কেউ একটু নির্ভেজাল অবসর পাই না। এক্ষেত্রে অপরকে একটু সহানুভূতি আর সমবেদনা। জানানো ছাড়া আর কিই বা করার আছে! চলন্ত সংসার জীবনে আমরা শুধু রং মেখে সং সেজে দ্বায়িত্ব বান বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেই চলেছি।

বুদ্ধিজীবী

প্রফেসর মোঃ নাসিম উদ্দিন প্রামাণিক
সদস্য নং -আ ১০৫৯
বগুড়া জেলা শাখা সমিতি

নাতি সাকিল হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। সাধারণ ছাত্রের চেয়ে সে একটু বেশী চঞ্চল। চঞ্চল বলতে আমি অস্তিরতা বুঝাচ্ছি না। তাঁর চঞ্চলতা দ্বারা আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো, সে জানতে খুব আগ্রহী। তাঁর অজানাকে জানার কৌতুহল খুব বেশী। সে এটা ওটা সম্বন্ধে সব সময় প্রশ্ন করতেই থাকে। খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনে সে প্রায়ই দেখে দেশের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের কথা। দেশের কোন ক্রান্তিলগ্নে বা কোনও সমস্যা-সংকুল অবস্থায় সাংবাদিক বা গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের দ্বারস্তহয় তাদের পরামর্শ বা মতামত জানার জন্য। সাকিল বুঝে যারা চাকুরী করে তারা চাকুরীজীবী যারা ব্যবসা করে তারা ব্যবসাজীবী এবং যারা আইন ব্যবসায়ী বা উকিল তারা আইনজীবী। কিন্তু সাকিল বুঝতে পারে না বুদ্ধিজীবী কারা। কারণ, চাকুরী করতে, ব্যবসা করতে, আইন ব্যবসা করতেও বুদ্ধির দরকার। তবুও তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় না। তা হলে বুদ্ধিজীবী কারা। সে তাঁর নানাকে জিজ্ঞাসা করে, নানা ভাই বুদ্ধিজীবী কারা?"

সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণীতে পড়া নাতির এ ধরণের প্রশ্নে নানা মুসকিলে পড়ে গেলেন এই ভেবে যে, ওর ভাষা জ্ঞান তো অতটা সমৃদ্ধ হয়নি যার মাধ্যমে সে তাঁর নানার কথা ষোলোআনা বুঝতে পারবে। যাহোক, নাতির কৌতুহল মিটাতে হবে। তিনি বললেন, "শোন সাকিল, এগুলি বড় মানুষের বিষয়। ছোট মানুষেরা এগুলি খুব একটা বুঝবে না। বুদ্ধিজীবী কারা তাঁর একটা সংজ্ঞা বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- বুদ্ধিজীবীরা হলো সমাজ ও সাংস্কৃতিক সচেতন এবং জ্ঞান- বিজ্ঞানে দক্ষ সুশিক্ষিত মানুষ যারা বুদ্ধির বলে বা বুদ্ধির কাজ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে"।

নানার কথা শুনে নাতি চিন্তা করে টেলিভিশনের দৃশ্যের কথা। টেলিভিশনের খবরে সাকিল দেখে সাংবাদিকেরা বুদ্ধিজীবীদের কাছে যায়। তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করে দেশের কোনও সমস্যা দেখা দিলে। তাঁর মনে ভেসে উঠে পিছনে আলমারী ভর্তি বই নিয়ে টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসে আছেন। আর সাংবাদিক তাঁর মুখের সামনে মাউথপিচ ধরে আছেন এবং তিনি তাঁর মতামত দিচ্ছেন। তাঁর মনে একটা হাস্যকর ধারণা হয়। তাঁর কাছে মনে হয় বুদ্ধিজীবী বুদ্ধির দোকান দিয়ে বসে আছেন আর মানুষ তাঁর কাছে বুদ্ধি কিনতে যাচ্ছে। যেহেতু নানা বলেছেন, বুদ্ধির কাজ দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে।

"আচ্ছা নানা, বুদ্ধিজীবীরা যে মতামত দেয় তা দিয়ে কি সমস্যার সমাধান হয়?" জিজ্ঞাসা করে সাকিল। নানা বললেন, "কোনো বুদ্ধিজীবীদের কথায় কোন সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, তাঁদের পরামর্শ কেউ গ্রহণ করে না।"

"কেন গ্রহণ করে না?" বললো সাকিল

"কারণ উনারা কেউ নিরপেক্ষ নন। একেক বুদ্ধিজীবী একেক দল বা মতের সমর্থক বা অনুসারী। অনেক বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে শোনো যায় কিংবা সন্দেহ করা হয়, তারা বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করে তাদের দালালী করে বললেন নানা।

"তাহলে বিভিন্ন মিডিয়ার লোকজন তাদের কাছে যায় কেন?" জানতে চায় সাকিল।

"এর পিছনেও স্বার্থ আছে। একেক মিডিয়া একেক দল বা মতের সমর্থক। তারা তাদের স্বপক্ষে তথ্য উত্থাপনের জন্য তাদের পছন্দ মত বুদ্ধিজীবীর কাছে যায়। আবার আর একটা কারণ হলো, তাদের পরিবেশন করার জন্য বিষয় দরকার। সুতরাং তারা তাদের কাছে যায়। একবার কেউ বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত হলে তাঁর কাছে মিডিয়ার লোকজন অনবরত যেতে থাকে।"

" আচ্ছা নানা ভাই, যে সব বুদ্ধিজীবীদের কথা আমরা খবরের কাগজে পড়ি বা টিভিতে দেখি তারা ছাড়া আর বুদ্ধিজীবী কি দেশে নাই? তাদের কাছে কেউ যায় না কেন?" জিজ্ঞাসা করে সাকিল।

-নানা গা মোচড় দিয়ে হাঁই তুলে বললেন, "পেশাদার বুদ্ধিজীবী না হলেও উনাদের চেয়ে অনেক ভালো পরামর্শ দিতে পারেন এমন বহু জ্ঞানী লোক দেশে আছে। কিন্তু তাদের কাছে মিডিয়ার লোকজন যায় না। এখানে লবিং- এরও একটা ব্যাপার আছে।"

সাকিল বললো, "নানা ভাই, লবিং কি জিনিস?"

নানা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন,"ও লবিং তুই বুঝবি না। লবিং মানে তদবির করা বা ধর পাকড় করে কোন কিছু করিয়ে নেয়া।"

"আচ্ছা নানা ভাই, বুদ্ধিজীবীরা যে সাক্ষাৎকার দেন, তাঁর জন্য কি টাকা পান?" বললো সাকিল।

"অবশ্যই," বললেন নানা। "সেই জন্যই তো কোন বিষয়ে না জানলেও যা তা একটা বলে দেয়। আর সেটাই মিডিয়াতে গুরুত্ব সহকারে প্রচার হয়।"

"আচ্ছা নানা ভাই এরকম বুদ্ধিজীবী কি আগেকার যুগেও ছিল?" জিজ্ঞাসা করলো সাকিল।

নানা বললেন,"হাঁ, আগেকার যুগেও বুদ্ধিজীবী ছিলো। কিন্তু আগের যুগে কোন মিডিয়া ছিল না। রাজা বাদশাহরা দেশ শাসন করতো। তারা কোন সমস্যায় পড়লে রাজ্যের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের ডাকতো। তাদের পরামর্শ চাইতো।"

-সাকিল জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা নানা ভাই,

-রাজাদের বুদ্ধি কি কম ছিলো, সেই জন্য তারা বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ চাইতো?"

নানা বললেন, "হাঁ, অনেক রাজারই বুদ্ধি কম ছিলো। কারণ, রাজার ছেলে রাজা হতো। সে ছেলে বুদ্ধিমান হোক আর না হোক সেটা বিবেচ্য নয়। দিল্লীর বাদশাহ আকবরের নাম শুনিস নি? উনি নিরক্ষর ছিলেন। লিখতেও পারতেন না, পড়তেও পারতেন না। তাঁর কি বুদ্ধিজীবী ছিলা?" জানতে চাইলো সাকিল।

নানা বললেন, "অবশ্যই। তাঁর নয় জন পন্ডিত বা বুদ্ধিজীবীছিল। তাদের পরামর্শ নিয়ে উনি কাজ করতেন। তাদেরকে নবরত্ন বলা হতো।"

"তাঁর আগেও কি রাজা বাদশাহর বুদ্ধিজীবী ছিলো?" বললো সাকিল।

-নানা বললেন "বহু প্রাচীন কাল থেকেই রাজা বাদশাদের বুদ্ধিজীবী ছিলো। তারা বুদ্ধির বিনিময়ে নিয়মিত এনাম বখশিস বা মাসোহারা পেতো।"

-নানা গা মুচড়িয়ে হাই তুলে নড়ে চড়ে বসে বললেন- এই বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অনেক হাসির গল্প আছে। এক রাজ্যে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি কম ছিলো। তাই তাঁর রাজ্যে তিনি কিছু বুদ্ধিজীবী পুষতেন। তারা তাঁকে সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতো। বুদ্ধিজীবীরা এতো সতর্ক থাকতো যে তারা কানে আর নাকে সিপি দিয়ে রাখতো যাতে বুদ্ধি খরচ হয়ে না যায়। ঐ রাজ্যে একদিন একটা দূর্ঘটনা ঘটলো। বর্ষার মৌসুমে মাটির দেয়াল ধ্বসে পড়ে এক লোক মারা গেল। ঐ পরিবারের লোকেরা রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করলো। রাজা চিন্তা করে কোনা সমাধান না পেয়ে তাঁর এক বুদ্ধিজীবীকে ডাকলেন। বুদ্ধিজীবী এসে সব শুনার পর কানের সিপি খুলে বুদ্ধি বের করলো। তারপর বললো, "যে মিস্ত্রী দেওয়াল নির্মাণ করেছে তাকে ধরে আনো।"

তাকে আনতেই সে কেঁদে বললো, "মহাশয়, আমার দোষ নেই। আমি যে কোদাল দিয়ে মাটির চাপ কেটে দেয়াল গেঁথেছি সেই কোদাল ছিলো বাঁকা। তাই চাপগুলি সমান হয়নি। যার ফলে দেয়াল সোজা হয় নি এবং পড়ে গেছে"।

বুদ্ধিজীবী বললো, "তাইতো! এর দোষ নেই। একে ছেড়ে দে। ঐ কর্মকার বেটাকে ধরে আনো যে ঐ কোদালটা তৈয়ার করেছে"।

পাইক পিয়াদারা ঐ কামারকে ধরে আনলো। কামার এসে হাত জোড় করে? বললো,"মহাশয়, আমার কোন দোষ নাই। কোদাল ঠিকই বাঁকা হয়েছে। কিন্তু তা আমার দোষে নয়।"

রাজা বললেন, "কার দোষে, সেটাই বল।"

সে বললো,"মহারাজ, আমি যখন কোদাল পিটিয়ে তৈরী করি তখন আমার দোকানের সামনে রাস্তা দিয়া এক বালক করুন সুরে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। তাঁর গানের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে কোদালটা বাঁকা হয়ে গেছে।"

রাজা বললেন,"তাহলে এর তো দোষ নাই।"

বুদ্ধিজীবী এবার বললো,"ঐ বালকটাকে ধরে আন। ব্যাটা গান গাওয়ার আর জায়গা পায়নি।"

বালকটিকে ধরে আনা হলো। একেবারে সরল সোজা ছেলে।

সে কাঁদতে কাঁদতে আসলো। রাজা তাকে বললো, "এই ব্যাটা, তুই কামারের দোকানর সামনে দিয়ে গান গাইতে গাইতে গেছিস। তোর জন্য কোদাল বাঁকা হয়েছে। সেই জন্য দেয়াল চাপা পড়ে মানুষ মারা গেছে। তোকে শূলে চড়ানো হবে।"

বালক কাঁদতে কাঁদতে বললো, "মহারাজ, আমার মনে পড়েছে। সেদিন আমার পিসে মশায়ের অসুখের কথা শুনে তাকে দেখতে যাচ্ছিলাম আর মনের দুঃখে গান গাচ্ছিলাম। পিসের অসুখ না হলে আমি ইচ্ছে করে ঐ রাস্তা দিয়ে যেতাম না।" শুনে বুদ্ধিজীবী বললো, "এই ছোড়ার কথাই ঠিক। বৃদ্ধের অসুখ না হলে সে ঐ রাস্তা দিয়ে যেতো না। পিসে মশাইকে ধরে আনো।"

এবার লোকজন পিসে মশাইকে ধরে আনলো। বৃদ্ধ মানুষ, একেবারে অচল। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। রাজা বৃদ্ধকে দেখে বললো,"এই বুড়োই সব সর্বনাশের মূল। একে শূলে চড়াও।"

বৃদ্ধ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বললো, "মহাশয়, আমি এমনিই মরে যাবো। আমার মতো আধমরা মানুষকে শূলে চড়িয়ে মারলে মহারাজের দুর্ণাম হবে। এটা তাঁর মহান শূলকে কলংকিত করবে। প্রজারা মন্দ বলবে।"

রাজা এবার চোখ কপালে তুলে বললেন,"বুড়ো ঠিকই বলেছে।"

বুদ্ধিজীবীকে লক্ষ্য করে রাজা বললেন,"মশায় আপনি একটা সুচিন্তিত সমাধান বের করুন।" বুদ্ধিজীবী মশায় অনেক চিন্তা করে একটা সমাধান দিলো। সে বললো,"এই মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে লোকজন প্রেরণ করুন রাজ্যমধ্যে। তারা এ রাজ্যের সবচেয়ে মোটাতাজা একজন লোককে ধরে আনুক। তাকে শূলে চড়িয়ে মহারাজের মহান শূলের সম্মান রক্ষা হোক।"

রাজা যথারীতি আদেশ দিলেন তাঁর সিপাহীদেরকে সবচেয়ে মোটা তাজা লোক ধরে আনতে। আদেশ পালিত হলো। তারা মোটা তাজা একজন লোক ধরে নিয়ে আসলো। তাকে দেখে রাজা মহাখুশী। তিনি আদেশ দিলেন, "একে শূলে চড়াও।"

মোটা তাজা লোকটি বললো, "মহারাজ, আমার কি অপরাধ? আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার শূলে চড়তে হবে? "

বুদ্ধিজীবী বললো,"এটা রাজার ইচ্ছা। তাঁর মহান শূলের জন্য একজন মোটাতাজা লোক দরকার। আর তুমিই সেই লোক। তুমি সৌভাগ্যবান যে, তুমি মহারাজের শূলে চড়তে পারছো।"

"কিন্তু এটা অন্যায়। বিনা অপরাধে একজন মানুষকে শূলে মারা হবে," লোকটি বললো।

রাজা বুদ্ধিজীবীর দিকে তাকালেন। বুদ্ধিজীবী বললো, "কোন অন্যায় নয়। রাজা সার্বভৌম। রাজার আদেশই আইন। রাজা কখনো অন্যায় করেন না।"

"কিন্তু আইনই যদি বে-আইনী হয়, তখন সেটা আর আইন হয় না" "চুপ কর ব্যাটা," বললো বুদ্ধিজীবী।

সাকিল বললো,"এটা কি কোনও বুদ্ধির কাজ হলো, না কোনও সমাধান হলো?"

নানা বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি বুদ্ধিজীবীরা সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নানা আবার বলতে লাগলেন- আর এক রাজ্যের বুদ্ধিজীবীর আর একটা গল্প আছে। ঐ রাজ্যে কোন তাল গাছ ছিল না। তাই ঐ রাজ্যের লোকজন তাল চিনতো না। তখনকার দিনে যোগাযাগ ব্যবস্থা খারাপ ছিলো। তাই আশে পাশের রাজ্যে তাল থাকলেও কেউ সেটা জানতো না। একবার এক বর্ষাকালে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের তাল গাছ থেকে একটা বড় আকারের তাল ভেসে আসলো। বন্যার পানির ঢেউয়ে তালটা এক গ্রামের এক কৃষকের জমিতে উঠে এসে আটকা পড়ে আছে। কৃষক জমিতে গিয়ে দেখে একটা অদ্ভুত আকৃতির অচেনা জিনিস। সে ভয় পেয়ে গেলো। বাড়িতে এসে সে গ্রামের লোকজনকে একথা বললো। লোকজন গিয়ে দেখে সত্যিই একটা অদ্ভুত অচেনা গোলাকার জিনিস। দেখতে মানুষের মাথার মত। কিন্তু মানুষের মাথা নয়। কারণ এতে কোনো চোখ মুখ কান নাই। কোনো অলৌকিক জিনিস আকাশ থেকে পড়েনি তো? কোনও কোনও জটিল বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ করে ধারণা করতে লাগলো হয়তো পাশ্ববর্তী রাজ্যের লোকজন কোন ক্ষতিকর মারাত্নক জিনিস তাদের রাজ্যে পাঠাতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণকে ডাকা হলো। তারা পরামর্শ করে বললেন, "এটা একটা রহস্যময় জিনিস। মাঝে মাঝে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়।"

লোকজন একথা শুনে বললো, "কই আমরা তো কোনদিন শুনিনি।" একশত তিরিশ বছর বয়স্ক একবৃদ্ধ বললো,"এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও আমি শুনিনি বা দেখিনি এমন জিনিস মহাশূন্য থেকে পড়তে।"

লোকজন যখন বৈজ্ঞানিকের কথা বিশ্বাস করছে না, তখন বৈজ্ঞানিকেরা বললো, "আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এই দেশে এই ধরণের জিনিস পড়েছিলো। এরপর এবার আবার এইটা পড়লো।"

এতেও লোকজন সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা মনে মনে ভাবলো পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা ইনারা জানলেন কি ভাবে! এক মুখাড় লোক বলেই ফেললো, "এরা সব কানাকে হাতি দেখাচ্ছে।"

অবশেষে সবাই ঐ রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীণ এবং দক্ষ নামকরা বুদ্ধিজীবীর দ্বারস্থ হলো। তারা তাঁকে গিয়ে ঘটনাটা বললো। উনি বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা আগামীকাল আসুন আমি আপনাদের সংগে যাবো।"

উনি রাতে চিন্তা ভাবনা করলেন। উনি তাদের কাছে শুনছেন এই বিষয়ে কে কি বলেছে। এবং এটাও শুনেছেন, তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। তাই আন্দাজ করে কোনও কিছু বলা ঠিক হবে না। এমন কিছু বলতে হবে যেটার দ্বারা তাঁর নিজের সম্মান বাঁচে, আবার লোকজনের জানার আগ্রহ স্তিমিত হয়।

যাহোক পরদিন উনি গেলেন। বহু লোকজন জমা হয়েছে সেখানে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীর কথা শোনার জন্য। রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী। বেশ মোটাসাটো মানুষ। দেহের তুলনায়

মাথা আরো মোটা। গাল দু'টা ট্যাব ট্যাবা ফুলানো। চোখ দু'টা গালের তুলনায় ছোট ছোট। ঠিক হাতির চোখের মত। উনি অদ্ভুত জিনিসটার কাছে পৌছেই মাথা সদৃশ জিনিসটা দেখে হাসলেন, তারপর কাঁদলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। উপস্থিত লোকজন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন।

তারপর জনতার মধ্য থেকে একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন। "স্যার, আপনি প্রথমে হাসলেন। তারপর কাঁদলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। এর কারণ কি?"

তিনি তাঁর মোটা মাথা আর ট্যাবট্যাবা ফুলা গাল জাগিয়ে তুলে মিটমিটে ছোট দু'টা চোখে লোকজনের দিকে বিশেষ করে সাহসী লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন,"আমি প্রথমে হাসলাম এই জন্য যে, এই সামান্য ব্যাপারে তোরা আমাকে ডেকেছিস! পরে কাঁদলাম এই জন্য যে, আমি মারা গেলে তোরা রাজ্য চালাবি কি করে।" উনি এমন গুরুগম্ভীর ভাবে কথাটা বললেন যে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলো না। সবাই কেমন যেন চমক লেগে গেলো। এই ফাকে উনি দ্রুত গতিতে উনার সংগীদের নিয়ে কেটে পড়লেন। আসলে উনিও অদ্ভুত জিনিসটা চিনতে পারেন নি।

আর এক রাজ্যে এক বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির খুব দাম ছিলো। তিনি রীতিমত বুদ্ধির ব্যবসা করতেন। তিনি তাঁর চ্যাম্বারে বসে থাকতেন। দৈনিক তাঁর কাছে লোকজন বুদ্ধি নিতে আসতো। তাঁর একটা বুদ্ধির দাম ছিলো একশত এক টাকা। কেউ তাঁর কাছে বুদ্ধি নিতে আসলে তাকে তাঁর কাছে একশত এক টাকা জমা দিতে হতো। তারপর উনি একটা বুদ্ধি দিতেন। এরপর কেউ আরও একটা বুদ্ধি চাইলে তাকে আরো একশত এক টাকা জমা দিতে হতো। একদিন এক লোক তাঁর কাছে বুদ্ধি নিতে গেলো। সে তাঁর কাছে একশত এক টাকা দিলো। উনি বললেন,

"কখনো একা পথ চলিও না। সাথে সংগী রেখো।"

এরপর আরো একশত এক টাকা জমা দিলো এবং বুদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বুদ্ধিজীবী বললেন,

"শোবারে আগে বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে শোবে।"

লোকটা বুদ্ধিমান লোকের চ্যাম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর খুব খারাপ লাগতে লাগলো। সে ভাবলো, সামান্য দু'টা কথার জন্য এত টাকা দিতে হলো। এ সামান্য কথা তো সবাই জানে। তবে যেহেতু সে টাকা খরচ করে বুদ্ধি দু'টা কিনেছে, তাই সে বুদ্ধি ব্যবহার করে চলতে শুরু করলো।

সাকিল বললো, "আচ্ছা নানা, লোকটা কি বুদ্ধি ব্যবহার করে উপকার পেয়েছিলো?"

নানা বললেন,"এসব নৈতিক উপদেশের উপকারিতা আছে।"

অবসর জীবনের বিড়ম্বনা!

এম. শফীউল্লাহ
সদস্য নং: আ-২৪১৬
কেন্দ্রীয় সমিতি

অবসরে এসে কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি! এরূপ একটি অভিজ্ঞতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। এতে হয়তোবা কেউ উপকৃত বা সাবধান হতে পারবেন। কারণ আমার মত এ অবস্থার শিকার যে অন্য কেউ হননি আমার সে ভুল কেবল ক'দিন পূর্বেই ভেঙ্গেছে। তবে এ অবস্থার শিকার হয়ে কেউ সর্বস্বান্ত হয়েছেন কিনা বা এর কোন প্রতিকার সম্পর্কে কিছু আজও শুনতে পাই নি। আমি সম্ভবত কোন রকমের ভিক্টিম হতে হতে বেঁচে গেছি।

২০০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিক, আমার অবসরের দ্বিতীয় বছর। প্রেস ক্লাবের বিপরীত দিকের সেগুণ বাগিচায় পূর্ত ভবনের অফিসে যাচ্ছি এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথে দাঁড়াবো ঠিক এমনি সময়ে অত্যন্ত কায়দা করে বলল -একজন লোকের একণ্ঠস্বর আমার কানে এলো। আচ্ছালামো আলাইকুম, স্যার, কেমন আছেন?

লোকটার দিকে তাকিয়ে তাকে আদৌ স্মরণ করতে না পারলেও তাঁর চেহারাটা পরীক্ষায় কমন পড়া প্রশ্নের মত মনে হলো। তবুও বলে ফেললাম আমি তো আপনাক চিনতে পারছি না। কথাটা আমার শেষ হবার আগেই তিনি বলে ফেললেন, স্যার চিনতে পারলেন? প্রেস ক্লাবের দিকে নির্দেশ করে বললেন, আমি রুহুল কুদ্দুছ। এই সোনালী ব্যাঙ্কে চাকরী করতাম। আপনি সচিবালয়ে উপসচিব হিসেবে যোগদান করলে, আপনাকে আমি এ ব্যাঙ্কে হিসাব খুলে দিয়েছি, অনেক দিন ভীড়ের মধ্যে আপনার চেকের টাকা তুলে দিয়ে সাহায্য করেছি।

এখন কোথায় আছেন?- আমি জানতে চাইলাম।

স্যার আমার বড় ভাই জাপানে বিগত পনের বছর যাবত থেকে গত দু-তিন বছর দেশে কিছু কলকারখানা করছেন। আমাকেও নিয়ে যান সেখানে। কেবল গত সপ্তাহে আমি এসেছি। স্যার আপনি অফিস সময়ে কেন এখানে এসেছেন? মি. কুদ্দুছ জানতে চাইলেন।

আমার তো এখন অবসর জীবন, তাই এক পরিচিত লোকের নিকট কিছু কাজে এসেছি।"কবে, কিভাবে অবসরে গেলেন স্যার", তিনি জানতে চাইলেন। "দু-বছর হয়ে গেছে," আমি বললাম।

স্যার আপনাক দেখতে যুবক মনে হয়, আপনি রিটায়ার করবেন কেন? স্যার আমার ভাই সিনিয়র পজিসনে ক-জন কর্মকর্তা খুঁজছেন তাঁর কাপাসিয়া ও নারায়নগঞ্জের কারখানার করপোরেট অফিসের জন্য। অনেক ভাল সম্মানী, গাড়ির ব্যবস্থা ও উচ্চ বাসাভাড়ার ব্যবস্থাসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেবেন। চলুন স্যার, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেই", বলে তক্ষুণই রওনা দেয়ার ভাব করলেন মি. কুদ্দুছ।

উনার অফিস কোথায়"? জানতে চাইলে বললেন-উত্তরায়। দেখুন কুদ্দুছ সাব, এ মুহর্তে উত্তরা যাওয়া সম্ভব হবে না, বরং অন্য সময় চেষ্টা করব আমি বললাম।

অবশ্যই স্যার, আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন, আমি আগামী পরশুই আপনার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেব"- মি. কুদ্দুছ আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

রিটায়ার করার পর সমসাময়িক অনেকেই ভাল ভাল বেতনে চাকরী করছেন বলে খবর পাই। অথচ আমারই চাহিদা সবচে বেশি, তবুও কোনখানে কোন চাকরীর খবর পাই না। মি. কুন্দুছের এ খবর আমাকে বিচলিত করে তোলে। মনে হলো বিধাতা বুঝি আমার প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে এ লোকটিকে পাঠিয়েছেন। আমি কাল বিলম্ব না করে তাঁকে আমার মোবাইল নাম্বার দিলাম। আমার মোবাইলে কোন সমস্যার কারণে কল যদি না আসে ভেবে তাঁর নম্বরটা চাইলাম। না কল অবশ্যই যাবে বলে তাঁর ফোন থেকে আমার ফোনে কল দিলেন। সেদিন রাত এবং পরের দিনটা অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটল আমার। আমার বুড়ো গিন্নির চোখে আমার এ উত্তেজনা ধরা পড়লে বললাম: আগামী কাল আমার একটা চাকরী হবে, ইন্টারভিউতে উত্তরা যেতে হবে। কখন, কোথায় যেতে হবে তা ফোনে বলবে সকাল ৯টায়। বেচারী এ খবরে খুবই আশান্বিত হয়ে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করল। শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর অধীর আগ্রহে রাত পোহানোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। সময় যেন আর শেষ হয়না, কখন উত্তরার কল আসবে তজ্জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। মাঝে মাঝে আমার ফোনটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলাম। ৯টার ক-মিনিট বাদে ঠিকই উত্তরার কল এলো। সে কুদুছ সাহেবের গলা, 'স্যার আজমপুর বাস স্ট্যান্ডে নেমে আমাকে কল দিবেন, নম্বরটা.....'।

সকাল ১০টায় শাহবাগ স্ট্যান্ড থেকে বাসে রওয়ানা দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে আজমপুর পৌছালাম। নাম্বারটিতে কল দিলাম। উত্তর এলো:- স্যার একটু দাঁড়ান আমি আপনাক রিসিভ করতে ছুটে আসছি। আনুমানিক দুই-মিনিট, কুদুছ সাহেব এসে হাজির। স্যার আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য দুখিত, চলুন- বলে ব্রিজের উত্তরে ক-গজ সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম দিকের অস্পষ্ট গলির একটি বাড়ির পেছনের একটি নিরাপত্তা সিঁড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িটির দোতলায় উঠলেন, যেখান থেকে কোন জনমানব দৃষ্টি গোচর হয়না সামনে সোজা অস্বচ্ছ কাচের ঘের-অলা বন্ধ দরজা, তারই পাশে ডান দিকে একটি ছোট কক্ষের অর্ধখোলা দরজা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। কক্ষের মাঝখানে একখানা মাঝারি সাইজের টেবিল, তাঁর চার পাশে চারখানা চেয়ার, তন্মধ্যে দরজার বিপরীত দিকের অর্থাৎ টেবিলের বিপরীত দিকের চেয়ার খানা উঁচুমানের, সে চেয়ারখানার বাম পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট একজন লোক

আর তাঁর পেছনে একটি কাবার্ড। আমাকে ঠিক সামনের চেয়ারে বসতে আহ্বান জানালেন উপবিষ্ট ভদ্রলোক। আমার পরিচয় নিলেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কিছু বললেন না, তিনি বরং বহু পরিচিতের মত ড্রয়ার থেকে এক গুচ্ছ তাস বের করে গতকাল কোথাও তাসের জুয়াখেলায় কিভাবে জিতেছিলেন তা দেখানো শুরু করে দিলেন। তেরখানা তাসের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট তাসখানা বের করার কৌশল আমাকে কয়েকবার দেখিয়ে আমার পরীক্ষা নিলেন।

মি; কুদ্দুছ একটি টেলিফোন এনে আমার নিকট দিয়ে বললেন: 'স্যার আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন'। 'হ্যালো', অপর প্রান্ত থেকে: "আমি ইঞ্জিনিয়ার ওয়ালিউল হামিদ, আপনি মেহেরবাণী করে একটু অপেক্ষা করুন, একটু পরে আমি আসব।" এই বলে ছেড়ে দিলেন।

ঠিক অমনি একজন সঙ্গীসহ জনৈক সুবেশধারী অবাঙ্গালী তাঁর পরিচয়, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী পার্টনারের সঙ্গে তাঁর অবস্থান ইত্যাদি বলতে বলতে আমার বিপরীতে উঁচুমানের চেয়ারখানায় বসে তাঁর ব্রিফ কেইস থেকে ডলার, টাকা এবং রুপির বান্ডেল বের করে টেবিলে রেখে তাস খেলার প্রতিযোগিতা আহ্বান করলেন। তাঁর সঙ্গী আমার বাম পাশের চেয়ারে বসলেন। তাদের কথাবার্তার প্রথমেই আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা পরস্পর পূর্ব-পরিচিত, যদিও মাঝে মাঝে তারা অপরিচিতের ভান করছিল। আমাকে সুবেশধারী তাঁর সাথী করলেন বলে মনে হলো। তবুও বিষয়টা পরিষ্কার হবার জন্য আমি বললাম: 'দেখুন, আমি এ খেলার জন্য আদৌ প্রস্তুত নই, মাফ করবেন।' সাথী হিসেবে মনে করুন আমি কি হেরে যেতে বসেছি? আর এই দেখুন হারলেও ভয় নেই বলে তাঁর টাকার বান্ডেলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাস সাফল করা শুরু করে দিলেন - সুবেশধারী ভদ্রলোক। আমার অবস্থান খোলাসা করার জন্য আমি বললাম, আমি আপনাদের এ খেলায় সহায়তা করতে পারি যদি হার-জিতের দায়িত্ব আমার না থাকে। অর্থাৎ জিতলে দানের টাকা পার্টনার নেবেন আর হারলেও তা তিনি শোধ দেবেন। খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য তাদের পীড়াপীড়িতে আমি মারাত্মক অস্বস্তি বোধ করতে করতে এ কথাগুলো বললাম। এমন সময় আমার সুবেশধারী সাথী বললেন: 'আপনি বোধ হয় অভ্যস্ত নন এ খেলায়। তবুও একটি ট্রায়াল খেলা দেখুন। আমার ওপর ভরসা রাখুন'। অত:পর আমার পাশের ভভদ্রলোক টেবিলে তাস ছড়িয়ে দিয়ে উদ্দিষ্ট তাসটা বের করার জন্য ট্রায়ালে আমাকেই আহ্বান জানালেন। আসলে তাসের জুয়া বা তিন তাসের খেলায় আমার আদৌ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবুও আগে যে ভাবে দেখান হয়েছিল সেভাবে একটি তাস টেনে বের করলাম। সকলে অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে উঠে: আপনি জিতে গেছেন, ১৪ লাখ টাকা! সুবেশধারী আমার পার্টনার তাঁর হাতের কাছে রক্ষিত টাকার বান্ডেল থেকে চটজলদি গুনে নিলেন ১৪ লখ টাকা এবং আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন এমনভাবে যেন কটি কার্ড বা তুচ্ছ কিছু। আমি টাকাটা স্পর্শ না করেই বললাম: আমার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণ আছে, টাকাটা হবে আমার পার্টনারের, হারলেও তিনিই দেবেন। তাঁরা তিন জনই আমাকে এ খেলায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে যখন প্রায় হতাশ হলেন বলে মনে হল, তখন আমি দরজা খোলা দেখে বের হয়ে পড়লাম। কারণ আমার নিশ্চিৎ বিশ্বাস হল, আমি নির্ঘাৎ কোন দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়েছি। নিজেকে মুক্ত করার মানসে প্রায়ই দৌড়ে

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে অদূরের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। কুদুসকে আমাকে অনুসরণ করতে দেখেছিলাম। কিন্তু স্ট্যান্ডে পৌছে তাকে আর দেখলাম না।

এক বছর পরের ঘটনা। আমি কোন কাজে ডিএলআর অফিসে যাচ্ছি। কাওরান বাজারের ইনসিওরেন্স দালানটির ঠিক সামনে কুদুসের বয়সী একজন লোক ঠিক কুদুছের কায়দায় অভিবাদন পূর্বক আমার অবসর জীবন, আমার কিছু হতাশার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলল: স্যার আমি একটি প্রাইভেট করপোরেসনে গত সাত-আট বছর চাকরী করছি। এটি একটি বিদেশী পার্টনারের প্রতিষ্ঠান। তাঁরা প্রশাসনিক উঁচু স্তরে আপনার মত দুইজন লোক খুঁজছেন। এতটুকু কোনোর পর আর আমি অপেক্ষা করতে না পেরে লোকটার ঘাড়ে ধরে বললাম: 'আমার চাকরীর প্রয়োজন নেই। অন্য কোথাও দেখ এই বলে তাকে ছেড়ে দিলাম। একখানা রিক্সা যোগে আমি সাত রাস্তার মোড়ের দিকে রওয়ানা দিলাম।

তারই কিছুদিন পর। আমি এলিফেন্ট রোডের বাসা থেকে বের হয়ে ফুটপাথ ধরে ডান দিকে রওয়ানা দিয়ে বাটার সিগন্যালের কাছাকাছি পৌছেছি এমনি সময়: 'আচ্ছালাম, স্যার কেমন আছেন'? অপরিচিত-দরাজ গলার কণ্ঠস্বর। আমি তাকালাম, লোকটি বলে চললেন: 'আহ আপনার সুন্দর চেহারাটা কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছে'! এমন ধারায় সে আমার প্রশংসা করছে বা সমবেদনা জানাচ্ছে যেন সে আমার কতকালের পরিচিত বন্ধু। চেনাচেনির প্রশ্নে সে আমাকে হার মানিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ 'আচ্ছা, আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে কি'? সে বলল,' স্যার আপনাক সাহায্য করতে চাই, আপনি যদি ইচ্ছা করেন একটা ভাল চাকরীতে জয়েন করতে পারেন'। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিলাম এবং বলে দিলাম আর কাকেও যেন গায়ে পড়ে সাহায্য করতে না যায়।

তৃতীয়বারও এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমি এ বিষয় এতদিন মুখ খুলিনি। কারণ অন্য কোন অবসরে যাওয়া বন্ধুকে এ ধরণের কথা বলতে শুনিনি বিধায় আমার বোকামী প্রকাশ করতে রাজী ছিলাম না। সম্প্রতি আমার এক প্রতিবেশিকে, যিনি মাঝে মাঝে আমার বেড়ানোর সঙ্গী হন এবং যিনি বিসিএসআইআর-এর পরিচালক পদ থেকে সম্প্রতি অবসরে গেছেন, বেড়াতে বের হতে ডাকলে, তিনি ভয়ে ভয়ে বের হয়ে এসে হতাশার সুরে বলতে লাগলেন: আমার রাস্তায় বের হবার জন্য ছেলে-মেয়ে এবং স্বজনেরা মানা করছে। সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে কোন চক্র লেগে গেছে আমার কোন ক্ষতি করার জন্য! অতপর এলিফেন্ট রোডের আমার ঘটনার মত এখন রোডে অনুষ্ঠিত কাহিনী বর্ণনা করলেন তিনি। তাই আমি সিদ্ধান্ত করলাম, এ বিষয়টা আমার পাঠক বন্ধুদের জানাতেই হবে, নতুবা আমি অপরাধী হব।

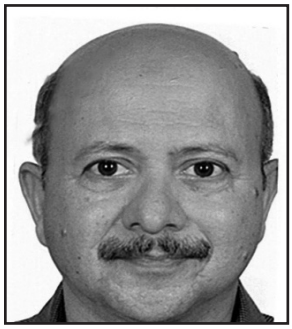

সেলিব্রিটির অটোগ্রাফ

প্রকৌশলী নাসিম আহমেদ
সদস্য আঃ ২৫২৮
কেন্দ্রীয় সমিতি

চাকরী করি বরিশালে। মাঝে মাঝে যাই ঢাকা। রাত ৮ টায় সুরভী লঞ্চের তিনতলায় উঠে ছোট্ট কেবিনটা খুঁজে নিলাম। সীটে আধশায়ো হয়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরেছি। দরজা খোলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলাম স্বামী-স্ত্রী-কন্যা দ্রুত হেঁটে গেল বারান্দা দিয়ে। সাদা সার্ট-কালো প্যান্ট-নীল শাড়ী। একটু পরেই মনে হলো ভদ্রলোক যেন পরিচিত। উৎসুক হয়ে উঠে গিয়ে তাঁদের দরজা অতিক্রম করলাম। আমার দুই দরজা পরেই তাদের কেবিন। ফেরার পথে পর্দার ফাঁক দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করেছি। নাহ, পরিচিত নয়। দুঃখিত হলাম। শ্রোতা না পেলে বেশি কথা বলা লোকদের অবস্থা যা হয়। কাগজ পড়ছি। সাড়ে আটটা। সুরভী ছেড়ে দিল। একটু পরেই হেঁটে গেলেন কেউ আমার দরজা পার হয়ে। তাঁকে দেখতে পেলাম না। চোখের কোণ দিয়ে নীলাভ একটা ছায়া শুধু অনুভব করলাম। কয়েক মিনিট পরেই ফিরলেন তিনি। ধীর পায়ে। ৫-৬ বছরের কন্যার হাত ধরে। পর্দার পাশ দিয়ে আমাকে খেয়াল করছেন তা বুঝতে পারলাম। সমস্যার কিছু নেই।

কাগজ পড়ছি। সাড়ে আটটা। সুরভী ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরের দৃশ্য। বিছানা থেকেই আনমনে অন্ধকারের নদী দেখছি। মন্থর গতিতে হেঁটে গেলেন তিনি। এবার একা। একটু পরেই ফিরলেন। চলার ভঙ্গীতে বুঝা গেল আমার কেবিনের ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। অস্বস্তি বোধ করছি। তৃতীয়বার আমার দরজা অতিক্রম করলেন। তারপর ফিরলেন। আমাকেই যে পর্যবেক্ষণ করছেন তা এতক্ষনে স্পষ্ট। কি ব্যাপার ? কিছু বলতে চান নাকি ভাবতে চেষ্টা করলাম।

কাগজ পড়ছি। আর আড়চোখে পর্দার ফাঁকে দৃষ্টি রাখছি। কিছুটা বিরতির পরে চতুর্থবার তিনি আমাকে নিরীক্ষন করলেন। একটু পরে ফেরার পথেও তাই। ভাবছি কি করা যায়। উঠে কথা বলব নাকি ? ঠিক হবে না।

আবার বিরতি। পঞ্চম রাউন্ড। তিনি গেলেন ও ফিরলেন উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে। বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে তাঁকে। ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছি। সবুরে মেওয়া ফলে জানি। দেখি আজ কি ফলে।

ক্ষণেক বিরতি। কাগজ পড়ছি। ষষ্ঠ রাউন্ড হলো। উদ্গ্রীব লাগছে তাঁকে।

আবার বিরতি। সপ্তম রাউন্ড। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, গতি লঘু, ভঙ্গিতে অস্তিরতা।

সময় গড়িয়ে যায়। আর আসলেন না তিনি। কিছুটা বিক্ষিপ্ত মনে কাগজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছি।

লঞ্চের সামনে তিন তলার খোলা ডেকে রেলিং এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। উন্মুক্ত পৃথিবী। বিশাল লঞ্চ চলছে মহিমান্বিতভাবে। ভরানদীর স্রোতের মতই সাবলীল। অসীম আকাশ। দিগন্ত বিস্তৃত বিপুল জলরাশি চারদিকে। দূরে বহুদূরে দু'একটা লঞ্চের আলো যেন মহাশুন্যে চলমান নক্ষত্র। আঁধারের আলোতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে লঞ্চ, তরল পৃথিবীর বুক চিরে। সকল সীমাবদ্ধতার আকর্ষণ অতিক্রম করে। মোহময় শব্দ। বাতাসে স্বর্গের শীতলতা। অনেকক্ষণ এরকম একরাত দাঁড়িয়ে থাকলে জীবনের হাজার রাত-দিনের গ্লানি মুছে যায়।

ফিরে এলাম ডেরায়। মন অভিভূত, অন্ধকার নদীর সৌন্দর্যে। বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছি বিছানায়। নদীর বাতাসে ক্ষুধা লেগেছে। ভাবছি রাতে কি খাবো।

হঠাৎ মৃদু টোকা দরজায়। চমকে তাকাই। সেই নীল শাড়ী। মা-মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়ের এক হাতে নোটবই খোলা। অন্য হাতে লতার মত সরু সুন্দর বলপেন। বাবার হবে।

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

'এক্সকিউজ মী। আমি একটু কথা বলতে চাই, আপনি কিছু মনে না করলে'। উচ্চারণ পরিষ্কার ও তরঙ্গায়িত। যেন বাঁশের বাঁশি। চোখের ভাষায় অধীর আগ্রহ।

-'বলুন, কি করতে পারি'?

-আমার মেয়েটা অনেকক্ষণ থেকে কাঁদছে। কিছুতেই থামাতে পারছি না। সিগ্ধ কণ্ঠস্বর। কেন?

-বলছে আবুল হায়াত আঙ্কেলের অটোগ্রাফ নেবো। দ্বিধাহীন সাহসী বক্তব্য তাঁর।

থতমত খেয়ে গেলাম কিছু সময়ের জন্য। ভেবে নিলাম ব্যাপারটা কি। বুঝলাম, মাথায় চুল কম ও চেহারায় মিল থাকার সাথে সম্পর্ক। ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলাম, ভুল ভেঙ্গে দেয়া উচিৎ। মনে এল, তাতে দুঃখ পাবে। মা লজ্জিত হবে। বাচ্চাটা তাঁর কেবিনে গিয়ে আরো কাঁদবে। এতক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, নিশ্চিত হয়ে যখন এসেছে, তাদের খুশীমনে বিদায় করাই আমার কর্তব্য।

-ভাবনার আর বেশি গভীরে না গিয়ে সহজভাবে বললাম, 'তা অনেকক্ষণ আগে বলেনি কেন'?

-ওর বাবাকে বলেছিলাম মেয়েকে নিয়ে আসতে আপনার কাছে। আসলো না।

-কেন?

বলেছে, বিশ্রাম নিচ্ছেন ভদ্রলোক। সেলিব্রিটি। এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না। মাইন্ড করতে পারেন।

নীরবে হাত বাড়িয়ে নোটবই ও কলম নিলাম। সুন্দর করে লিখলাম, "সুরভীতে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভাল থেকো লক্ষ্মী মেয়ে"। একটা ফুল এঁকে দিলাম। নীচে লিখলাম, আবুল হায়াত। তারিখ দিলাম। ফুলের মতই সুন্দর বাচ্চাটার হাতে নোটবই দিয়ে তাকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে

দিলাম।

-এবার খুশী তো ?

কিছু বললো না। নোটবই হাতে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল বাবার কাছে। কলম রয়ে গেল আমার হাতে। মায়ের চোখ আনন্দে পরিপূর্ণ। মুখে মৃদু হাসি। এরকম বিরল সুযোগে প্রিয় তারকার অটোগ্রাফ নিতে পেরে কন্যার চেয়ে মা-ই বেশি খুশী। দীর্ঘ সময়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরে সফলতার আনন্দ অনুভবে তিনি উদ্ভাসিত।

আপনাক অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মেয়ে অনেক খুশি হয়েছে। পা বাড়াবেন তাঁর কেবিনের দিকে। হালকা স্বরে বললাম, কলমটা নিবেন না?

নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে কলম নিলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির। ভাবছেন সুন্দর কলমটা সেলিব্রিটিকে উপহার দেয়া সমিচীন কি না। তাঁর চিন্তা থামিয়ে দিলাম।

-আরেকটু কথা বলি ? তাকিয়ে রইলেন আমার চোখে। উৎসুক এবং তীক্ষ তাঁর দৃষ্টি।

একটু হেসে বললাম, 'আবুল হায়াত সাহেব আমারও খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। শুধুমাত্র আপনার মেয়েকে খুশি করার জন্যই আমি সেই সেলিব্রিটির নাম লিখে দিয়েছি। আমার নাম নাসিম আহমেদ। আমি সড়ক ও জনপথের ইঞ্জিনিয়ার'।

-আকস্মিকতায় তিনি হতচকিত, রুদ্ধশ্বাস। বড় বড় চোখ নিয়ে স্থির ও নীরব, যেন পাথরের মূর্তি।

মুখের মৃদু হাসি এখনো লেগে আছে। পট পরিবর্তন এতই অভাবিত ও দ্রুত ঘটেছে যে, তিনি মুখভাব পরিবর্তনের সুযোগ পাননি।

তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনের আনন্দে খেলায় মগ্ন শিশুর খেলনাটি নিয়ে নিলে আহত শিশুটি যেভাবে তাকায়।

-তাঁর মনের কথাগুলো ভাবতে চেষ্টা করলাম।

এতটা দুঃখ পাবেন বুঝতে পারি নি। অনুশোচনায় ভরে গেলো মনটা। আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা মানুষটিকে দুঃখ দিলাম কেন ? খুশিমনে বিদায় দিতে চেয়েছিলাম। সংযত হলাম। সান্তনা দেয়ার প্রয়াসে সেই প্রিয় তারকার মতো হেসে বলেছি, 'আপনাকেই শুধু বললাম। কাউকে বলবেন না তো ?

কবিতা

“সাগরে যে পেতেছে শয্যা
শিশিরে তার কিসের ভয়।”

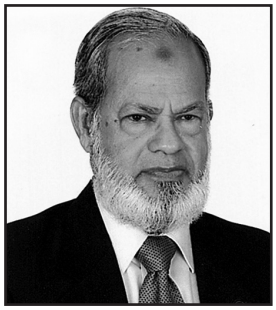

সঞ্চারিত সন্তান-বাৎসল্য

ডা: মোঃ ইমাম হোসেন
সদস্য নং-২০২৬
কেন্দ্রীয় সমিতি

স্নেহাস্পদ বউমা-

তুমি কন্যা থেকে জায়া হয়ে এখন জননী
সফল মাতৃত্বের গৌরবে তুমি গরবিনী।
নিজের শরীরে অন্য প্রাণের অস্তিত্ব-স্পন্দন অনুভব,
মেয়েদের সে এক অতুলনীয় স্বর্গীয় অনুভূতি!
তোমার 'হৃদয়ের টুকরা' 'এক নিরাপদ আশ্রয়' থেকে
কুটিল পৃথিবীর প্রবেশ দ্বারে, কিছুটা ভীত;
নিরাপদ হতে চায় তোমাদের কোলে।
মমতাময়ী মেয়েদের প্রতিচ্ছবি তুমি, সর্বংসহা।
অবুঝ শিশুর অব্যক্ত চাহিদা, আবদার,
পরম মমতায় হাসি মুখে পূরণ করে
ওকে সকল পঙ্কিলতার উর্ধ্বে তুলে ধর।
স্নেহময়ী আদর্শ মায়ের ভালবাসা দিয়ে,
সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওকে এগিয়ে দাও-
আমরা থাকব পাশেই।

অন্তজ শাওন

তুমি এখন বাবা- আমার মত, আমার পিতামহের মত
এ এক চির বহমান ধারা।
এইত সেদিনও আমি কেবলই বাবা ছিলাম, আজ আমি দাদুও বটে,
ঠিক আমার বাবার মত, পিতামহের মত এবং অগণিত পূর্বপুরুষের মত।
চেয়ে দেখ, কি অপার্থিব স্নেহসুখে মায়ের বুকে নির্ভয় তোমার প্রতিচ্ছবি।
আমার পিতৃ হৃদয়ের সঞ্চিত ভালবাসা আজ তোমাতে সঞ্চারিত।
পরম নির্ভরতায় তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে আগামীর আরেক বাবা
অনেক প্রশ্ন ও স্বপ্ন নিয়ে। পলে পলে ওর পৃথিবী সম্প্রসারিত হবে,
ক্রমেই শাণিত হবে ওর অনুভূতি, কোন কিছুতেই হয়ত তাঁর তর সইবে না।
ওকে সঠিক পথে পরিচালনা করাই হবে তোমাদের সাধনা।
আমার বিশ্বাস তোমরা সফল হবেই।

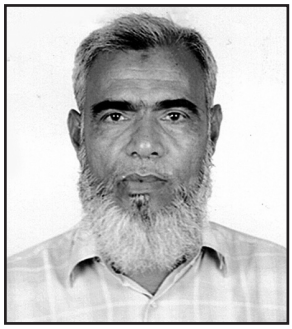

বিজয় দিবস

মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদার।
আজীবন সদস্য, সদস্য নং-১৫৩৬,
বরিশাল জেলা সমিতি

বিশ্ব কবি রবি ঠাকুরের বঙ্গ জননীর,
জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার রূপের হাসি আনতে গিয়ে
পাক-বাহিনী নিয়েছিল কেড়ে
লাখো লাখো কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা
বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক,
কত না মা-বোনের ললাটের সিঁদূর নাকের নোলক,
কত না ষোড়শীর লজ্জা রাঙা' আভরণ।
বিনিময়ে পেয়েছি বিজয় দিবস' ১৬ই ডিসেম্বর।
আবার হাঁটাহাঁটি করে গড়িয়ে এল বিজয় দিবস,
রক্তাক্ত ছাপ নিয়ে বাঙ্গালীর দ্বারে,
বিজয় উল্লাসে মোদের ফেটে যায় ছাতি
সাগরের মত বান ডাকে এই হৃদয় মন্দিরে।
চন্দ্র, সূর্য, আকাশের তারা,
বনের পাখি, বনফুল, বনলতা
বিজয় উলাসে হাসে তারা।
বিধবা মায়ের ফালগুণী নামের বোনটি আজ
রোকেয়া হল থেকে বেরিয়ে আসে
একগুচ্ছ রক্তজবা-জুই-চামেলী-কামিনী-কেয়া করবী নিয়ে
জাতীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে।
চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল,
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান,
প্রেম ডোরে গরিব মোরা শান্তি নিকেতন।
আপদে-বিপদে,ঈদ শারদীয় উৎসবে নবান্নের ডাকে।
এখন মাঠে সোনার ফসল ফলাবো মোরা
মিষ্টি হাসি হেসে।
হাতে নেব মোরা মুক্তাঙ্গনের ক্লিওপেট্রা
তাজমহল - একটি লাল গোলাপ।
সে আমার মায়ের একটি হাসি,
স্বাধীনতার ফুল বিজয় দিবস।

বিকিকিনি

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

কোথায় মুক্তি, কোথায় প্রাপ্তি,
সবকিছু যেন বাজারের সওদা।
তবে কেন সমাজ, সামাজিকতা,
ধর্মে কেন হক আদায়ের কথা।
কোথায় গেল সেবা, পরিসেবা,
সবকিছুই আজ বাজারজাত পণ্য,
মূল্য ছাড়া কিছুই যেন যায়না কেনা।
সে বাজারে নেই আসলের কোন ওয়াদা,
সব কিছুতেই যেন ভেজালের মহড়া।
আসল খুঁজে না কেউ,
ভেজালের প্রতিযোগিতায়,
এ যেন ভেজালই আসল।
যাচ-বাছনের নেই বালাই,
সবাই যেন বশংবদের ভূমিকায় হন্য।
হায়! কোথায় গেল সে প্রাণ, মহাপ্রাণ,
বিনা বেতনে যাঁদের সেবায় এ বঙ্গভূমি হয়েছে সুমহান।

ডুবুরী মন

মুহাম্মদ হারুন চৌধুরী
আ- ২০০১
কেন্দ্রীয় সমিতি

ভাগ্যের চুমকি পাথরে খুলেছে সাফল্যের দুয়ার দিনান্তে ক্লান্তিকর জীবনে বইছে
প্রশান্তির সুবাতাস,
উদয়াস্ত শ্রমের ফসল তুলেছি ঘরে,
হস্তগত আজ প্রাচুর্যের অঢেল সম্ভার।
বিপুল বিত্ত আর বৈভবে মোড়ানো জীবন নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকে বৃষ্টিস্নাত
রঙধনু আঁকা সুনীল আকাশ।
পূর্ণতার এই প্রফুল্ল লগনে কি যেন এক অপূর্ণতার আবিল নিয়ে বিষন্ন থাকে এই মন,
কোথায় যেন সব পেয়েও না পাওয়ার হাহাকাবে হু হু করে কেঁদে উঠে ক্ষয়িষ্ণু যৌবন।
বিয়াল্লিশটি বসন্ত কেটেছে বেঘোরে তবুও সম্বিৎ ফিরেনি,
ধ্যানমগ্ন ক্ষ্যাপা খুঁজেছে কেবলই সৌভাগ্যের পরশমণি,
কঠিন নির্ঘন্ট মেনে রোজগারি হালচাল,
অবকাশ মিলেনি কভু,
মন নিয়ে কাড়াকাড়ি, নীল খামে লেখালেখি কিংবা নিদাঘ দুপুরে খুনসুটি লুটোপুটি
সাপ লুডু খেলবার।
ভার্সিটির সোনালী অঙ্গন সেতো তারুণ্যের প্রদীপ্ত ভুবন,
করিডোরে চোখাচোখি অকারণ ঢলাঢলি অনেক দেখেছি আমি মোহময় মুভির
মতো, লাস্যময়ী ললনার বাঁকা চাহনি,
হৃদয়ে ঝড়তোলা তরঙ্গের ছলাৎ ছলাৎ;
সেও তো দু'দশক হলো স্মৃতির সেলুলয়েডে এখন বন্দী।
বিদগ্ধ সুজনেরা চারপাশ ঘিরে থাকে,

রেঁস্তোরা, কফি হাউস আর পরিপাটী বসার ঘরে,
ঘুরে ফিরে একই কথা "কি এমন বয়স তোমার,
পুরুষ মানুষ তুমি, নিশ্চিন্তে বসতে পার বিয়ের পিঁড়িতে যখন তখন।"
আপ্লুতমন দ্বিধান্বিত থাকে,তবুও যেন ছুঁতে চায় ভালবাসার সুষুপ্ত গগন।
তৎপর আত্মীয়জন, বন্ধুবান্ধব -পড়শী সুজন সবে মিলে হৃষ্টচিত্তে পাত্রীদেখা চলে ;
রেঁস্তরা, শপিংমল আর লংড্রাইভের ডামাডালে খুঁজে ফিরি তারে আমি, ভালবাসব
যারে, আমারি মতো আপন করে,
ধন নয় মান নয় শুধু আমরা দু'জন।
দেখা হলো অনেক পাত্রী; নায়িকা সেলিব্রেটি প্রায় ডজন।
বয়স গৌণ বিষয়-- মন নয় ধন চায়,
রূপ দিয়ে রূপা চায়-- হৃষ্টচিত্তে সমর্পণে রাজী গৃধ্নু গুরুজন।
বিফলে গেল যত আহ্লাদি মাতামাতি, বেকার যত হাল ফ্যাশোনের মোড়কে
সাজানো রগরগে যৌবন।
কোথাও মিলেনি তারে;
একে একে হাল ছেড়ে হতাশায় ফিরে যায় শুভাকাঙ্খীর ঢল।
তারপর কেটেছে অনেক প্রহর
দিনদিনান্তে ফিরে আসে নতুন বছর।
অকস্মাৎ এ কেমন চমক? আমারই দুয়ারে দাঁড়িয়ে যে আমারই প্রিয়জনা। আহা মরি
রূপসী ত নয়, তবুও কেন যেন মনে হয় পেয়েছি তারে খুঁজি ফিরি যাব আমি মনের গভীরে।
প্রেমাতুর মন মাধুরী ছড়ায়,
তন্বী শ্যামা শিখর দশনায় আর হরিণ চপল চকিত চাহনিতে।
রয়েছে নিবিড় অপত্যবন্ধনে আমার অধীন জ্যেষ্ঠ অধিকারীর দুহিতা যে সে
এবার সুস্থির মন; আর ভান নয় ঠিকঠাক দিনক্ষণ বাজল সানাই,
স্বাগত মধুর লগন।
সহসা ফুরিয়ে যায় মধুময় রেশ তাল, সব যেন হতে থাকে ভুলভাল বেসামাল,
তরুণীর মন চকিত চঞ্চল সারাদিন বাজে রিনিঝিনি।
এই হাসি এই ভাব, দু'চোখে নেমে আসে বরষার জল।

নিশুতি রাতে জেগে উঠি প্রবল তাড়ায়,
এই চলো ছাদে যাই,
দু'জনে আকাশে দেখব আজ তারার মেলা।
অবাক বিস্ময়ে থাকি,
এখন রাতের তৃতীয় প্রহর ভোরে হতে দেরী নেই,
বাইরে শীতল হাওয়া, শুয়ে পড়ো, অন্যদিন হবে যাওয়া।
গ্যারেজে দাড়ানো থাকে দামী গাড়ী লিমুজিন,
আচমকা অনুনয় করে," এই চলো আজ ঘুরব দুজন, পথঘাট -অলিগলি পদতলে ব্যস্ত
শহর, থাকবে সাথে রিক্সাবাহন।
সব যেন হতে চায় এতাল বেতাল
অনায়াসে ফুটপাতে ফুচকা খাওয়া কিংবা বেডরুমে উদ্বাহু নেচে নেচে উচ্চগ্রামে
বাজনার তাল। প্রতিক্ষণ হতে হয় বিরাগভাজন, ওর চাওয়া আমার নয়,
আমারটা ওর নয়- বিপরীত যত হালচাল,
কোথাও বেঁধেছে গেলো, দুজনার মাঝে নিয়ত বেড়েই চলেছে প্রভেদের কঠিন দেয়াল।
প্রেমের এই ধারাপাত পড়িনি কখনো-- প্রজন্মের উপাখ্যান, গতায়ু দিনের অর্ধেক দিয়ে কি কবে
রাঙাতে পারি চনমনে মৃন্ময়ী তরুণীর প্রাণ? হায়রে ডুবুরী মন।
আমিত এক দিকভ্রান্ত নোঙ্গর হারানো নাবিক
খুঁজে ফিরি নিরন্তর অতলান্ত
মনের অজানা হদিস, কোথায় সে বাতিঘর?
যেতে হবে আর কতদূর?
দুজনার মাঝে উথাল পাতাল নাচে গহীন সমুদ্দুর।

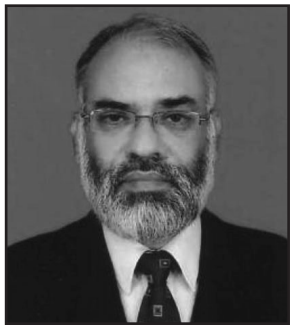

দুটো সনেট

কৃষিবিদ এ এইচ ইকবাল আহমেদ।
আজীবন সদস্য: ২৪০৮
কেন্দ্রীয় সমিতি

১.নতুন আশায়

সময়ের পাড়ে মাথাকুটে ধুঁকে ধুঁকে
ডুবে যেতে থাকি ক্রমান্বয়ে গাঢ় দুঃখে।
কত আর ক্ষত করি খুঁড়ে নিজ বুক
নইতো মাতাল বা নিরেট উজবুক।
কালের তরঙ্গ এসে হেসে খেলে তীরে

স্মৃতির জমানো চিহ্নগুলো ঢাকে ধীরে।
অস্তাচলে ম্রিয়মান দিনান্তের রবি
আঁধারে মিলায় উজ্জ্বল দিনের ছবি।
তবু খুঁজে ফিরি ক্ষীণতর কোন আলো

যদি কিছু পাই সারাবো নিকষ কালো।
তোলপাড় করা গর্জন বিদীর্ণ করে।
দীর্ঘশ্বাস ফুসে ওঠে হৃদয় কন্দরে।

রক্তিম দিগন্তে দেখে চাঁদের কিরণ
নতুন আশায় বুক বাঁধে এ জীবন।

২. পুরানে নতূনে

জীবন যেন বা কোন প্রবল বৈশাখী
ঝড়ের দাপটে ঝরে পড়া ডাঁসা আম
বোঁটার গোড়ায় এঁটে থাকা শক্ত রাখী
রুখতে পারে না তাঁর সুপ্ত মনোষ্কাম।

ভরা কাটালের তোড়ে প্রবল জোয়ার
সাগরের লোনাপানি ঠেলে ঢুকে নদে
ডুবায় বিস্তীর্ণ চর খাঁড়ি নিচুপাড়
কখনো বাড়ায় থাবা ব্যস্ত জনপদে।

সময়ের দূরবীণে দেখি অবসরে
দু দন্ড বাঁচার জন্য চলছে সংগ্রাম।
পুরানো দেয়ালে ফের পড়ে চূণকাম
আগামীর চিহ্নাবলী জমছে জঠরে।
আজকের সূর্যোদয়ে চেয়ে দেখলাম
পুরানো নতূনে মিলে চলে পরস্পরে।

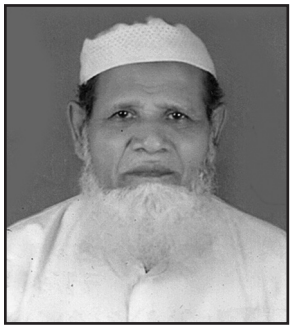

বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মোঃ সাইদূর রহমান
আজীবন সদস্য নং-৬৮০
কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা

মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
বাংলাদেশের মহাপবিত্র মহাকালের স্বাধীনতা,
মনের মাঝে লুকিয়ে আছে সুপ্ত
স্বাধীনতার যত স্মৃতিকথা যত
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
একুশে ফেব্রুয়ারীর সূত্রে গাঁথা।
মাতৃভাষা বাংলাভাষার স্বাধীনতা,
শহীদদের রক্তঝরা স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
ঢাকা ঘোড়দৌড় বিশাল মাঠে
সাত মার্চে উচ্চারিত বজ্রকণ্ঠে
বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
জাতির পিতার ভাষণে নির্দেশিত
আরও রক্ত দিয়ে পরাধীনতার বিরোধিতা,
আমজনতার ইস্পিত সংগ্রামী স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা,স্বাধীনতা,
মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর ছাড়িয়ে,
জল-স্থল-বন-বাদারে ছড়িয়ে
ফেটে পড়া মহা বিদ্রোহের স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
ধন সম্পদ সব লুটিয়ে দিয়ে
নিজ দেশ থেকে দেশান্তর হয়ে,
সশস্ত্র সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
তাজা রক্ত আর অবারিত অশ্রু ঝরিয়ে
সিথির সিঁদূর মুছিয়ে দিয়ে,

পঙ্গু জীবনে স্মৃতিবাহী স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
সব হারিয়ে পথ দেখিয়ে
যারা চলে গেলো লোকান্তরে,
তাদের পূন্য স্মৃতিঘেরা স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
লাল সবুজের পতাকা বুকে নিয়ে
অনাগত আশা প্রাণে জাগিয়ে,
মোদের স্বাধীন চেতনার স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
শহীদদের মহিমান্বিত আত্মত্যাগের স্মরণে
স্মৃতিস্তম্ভ শ্রদ্ধায় ফুলে ফুলে রাঙিয়ে,
যুগে যুগে স্মৃতিবহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
হবোনা কোনদিন বিপথগামী পথহারা
যদিও সব হারিয়ে হয়ে যাই সর্বহারা,
বুক ফুলিয়ে রক্ত দিয়ে রুখবো পরাধীনতা,
রক্ষা করবো মাতৃভূমির স্বাধীনতা।
মহান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
বাংলার ভাষা শহীদদের স্বাধীনতা,
বাংলার স্বাধিকারের শহীদদের স্বাধীনতা,
হে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতা,
হে মহাপবিত্র মহাকালের স্বাধীনতা,
মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

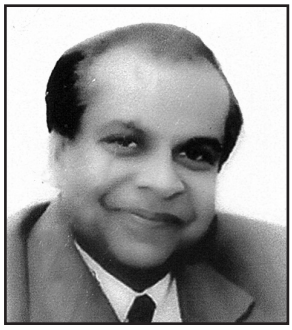

সময় গেলে সাধন হবে না

আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী
সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি

লালন শাহ; বাউল লোকায়ত মতাদর্শের এক সিদ্ধ জন,
"সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকিতে দিনের সাধন কেন জানলে না"-
লালন সঙ্গীত আজ বিশ্ব ঐতিহ্যে বিরাজমান।

ভব থেকে অনুভবে, অভাব থেকে ভাবে বিস্তৃত যিনি,
অবক্ষয়, অনৈতিকতা, হীনমন্যতার বিরুদ্ধে যিনি,
ভাবের ঐশ্বর্য ও অতীন্দ্রিয়ের ঔদার্যে উদ্ভাসিত যিনি,
উষ্ণ হৃদয় স্বজন; হৃদিক সাধক লালন।

নূরতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, রসুলতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, গোষ্ঠলীলা,
নিতাইলীলা, স্থুলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ, সিদ্ধিদেশ;
তত্ত্ব, লীলা আর দেশভিত্তিক ভাব যার,
আত্মপ্রত্যয়ী, তত্ত্ব লীলাময়ী সাঁইজী লালন।

এ জীবনে জ্বেলে গেলে যত মঙ্গলদীপ আলোক,
রেখে গেলে যত কালাম সে যে অমর অশোক,
আত্মদর্শন, কমল-কৌন্টায় অজর গান অন্ত:প্রাণ,
মরমী সঙ্গীতজন সাঁইজী লালন- দোল পূর্ণিমায় তোমায় স্মরি।

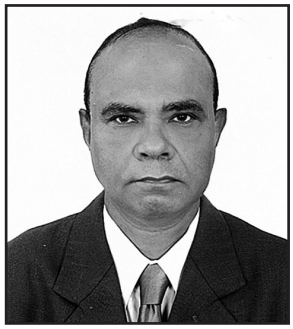

সক্রেটিসের জবানবন্দি

কাজী নাসিরুল ইসলাম
সদস্য নং ২৪২৭
কেন্দ্রীয় সমিতি

(খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ সন। এথেন্সের আদালতে মহামান্য সক্রেটিস এর বিচার চলছে। ৫০০ জন জুরী সমন্বয় গঠিত বিচারক মন্ডলী। অভিযোগকারীদের পক্ষে মেলিটাস, এনিটাস, লাইকন এবং সক্রেটিসের শিষ্যবৃন্দ প্লেটো, ক্রিটো, ফিডো এবং অন্যান্যরা উপস্থিত)

মহামান্য আদালত,
হ্যা, আমি সেই দীনহীন
শীর্ণকায় কুদর্শন সক্রেটিস
আমার তো একটিই জামা
তাই তেমন পরিচ্ছন্নও নই
আপনাদের মত
(বিচারক মন্ডলী এবং জুরিগণ নড়ে চড়ে বসলেন)।

তবে ধর্মাবতার,
পোষাক তো মানুষের বাহ্যিক রূপ মাত্র
এর বেশী কিছু নয়।
আসল রত্ন, সে তো লুকিয়ে আছে
আমাদের হৃদয়ের গভীরে।

মেলিটাস- বন্ধু আমার,
তুমি যে সব অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে এনেছো
তা কী তুমি নিজেই বিশ্বাস কর?
তুমি বিশ্বাস কর বলে আমি বিশ্বাস করিনা
কারণ বিশ্বাসের ভিত যে অনেক কঠিন
সে তো যুক্তি, সত্য এবং ন্যায় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তুমি বলেছো, আমি নাকি
এথেন্সের দেব-দেবীকে বিশ্বাস করিনা
আবার জেরায় বলেছো, আমি নতুন দেব দেবী সৃজন করেছি।

আর আমি যদি নতুন দেব-দেবীই সৃজন করে থাকি
তাহলে আমি নাস্তিক হলাম কিভাবে?
তাহলে কি একথাই সত্য নয়, যে আমি দেবতায় বিশ্বাস করি?
(হতবাক মেলিটাস, আনোতাস, লাইকন এবং উপস্থিত সবাই)
হাঃ হাঃ হাঃ,কী অদ্ভুত সব অভিযোগ তোমাদের!

তবে হ্যাঁ, ডেলফির এ্যাপালো মন্দিরের সেই দৈববাণী
তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়
দেবী পাইথিয়া চেরোফেনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,
আমার চেয়ে জ্ঞানী নাকি আর কেউ নেই!
মান্যবর, আসলে আমি জানি
যে, আমি কিছুই জানি না।
আর ঐ এথেনীয় পন্ডিত বুদ্ধি বিক্রেতারা
জানেনা যে তারা কিছুই জানে না,
আমি তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছি মাত্র
তাই তারা আমার ওপর প্রতিহিংসায় মেতেছে।

আমার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ,
আমি নাকি এথেন্সের যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছি।
আমার অপরাধ, আমি এথেন্স বাসীর কাছে
নিজের অজ্ঞানতা প্রদর্শন এবং
জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা
ব্যাখ্যা করার জন্য আবির্ভূত (বিধি আদিষ্ট) হয়েছি।
তাইতো আমি এথেনীয় যুবকদেরকে
বারংবার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে একটি কথাই
বোঝাতে চেয়েছি যে, তোমরা কিছুই জাননা।
সবার আগে নিজেকে জানো,
ন্যায় পরায়ণতা এবং আত্মজিজ্ঞাসা মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক
প্রশ্নশূণ্য জীবন অর্থহীন বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।

মহামান্য জুরিগণ এই কী আমার অপরাধ?
আমি কোন ত্রিকালদর্শী নই, মহাজ্ঞানী মহাজনও নই,
আমি এথেন্সের পন্ডিতদের মত বুদ্ধি বিক্রেতাও নই,

বিক্রি করার মত কোন জ্ঞান যে আমার নেই।
তাইতো আমি নগরীর পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে
একটি কথাই শুধু বলে যাই যে,
তোমরা জ্ঞানের অহমিকা করো না
তোমরা আসলে সবাই অজ্ঞান
মনে রেখো, সত্য বলা আর সুপথে চলাই
গভীর জ্ঞানের পথকে উন্মোচন করে দেয়।

মহামান্য বিচারক মন্ডলী, আমি যা করেছি
তার জন্য কি আমি শাস্তি পাবার উপযুক্ত?
দীন-হীন এই আমি কোনদিন অর্থ উপার্জন
বিলাসী জীবন-যাপন, উচ্চপদ মর্যাদা, রাজনৈতিক আসন চাইনি
অথবা কোন ষড়যন্ত্র করে কিছু পাবার চেষ্টাও করিনি
শুধুমাত্র নীতির দৃঢ়তাই আমার মূলমন্ত্র।
আমার নিজের বা অপরের মঙ্গল সাধন হবে না
এমন কিছু গ্রহণ করার কথা কোনদিন ভাবিনি
সব সময় একথাই বোঝাতে চেয়েছি, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে
নিজের আত্মার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেয়া শ্রেয়
এরপরও আমি কী পেতে চলেছি?
এই কী আমার প্রাপ্য ছিল?

আমার মত একজন দরিদ্র মানুষ, যে সারা জীবন
এথেনীয়দের নৈতিক শিক্ষা দানে ব্যয় করেছে
বিনিময়ে গ্রহণ করেনি কিছুই।
সে তো অবশ্যই আপনাদের কাছে পুরস্কারের দাবী রাখে
তাই আমি কী রাষ্ট্রীয় খরচে জীবন-যাপনের আশা করতে পারি না?
অলিম্পিক বিজয়ীদের মত সম্মান পেতে পারি না?
আমিতো এ দাবী করতেই পারি যে,
এথেন্সের সিটি হলে আমার সম্মানে ভোজ সভার আয়াজন করা হোক
(বিচারক মন্ডলী বিস্মিত-রাগান্বিত এবং আদালত প্রাঙ্গনে মৃদু গুঞ্জন),

প্লেটো, ক্রিটো, ফিডো, তোমরা ক্ষমা চাইতে বলছো
কেন? আমিতো কোন অপরাধ করিনি,

তাছাড়া বিচারক মন্ডলীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া অনুচিত
কারণ, তারা শপথ নিয়েছেন ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য নয়
বরং আইনের বিধান অনুযায়ী
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের দায়িত্ব।

হ্যা, আমি মাঝে মাঝে একটি দৈব কণ্ঠস্বর শুনতে পাই
হয়তবা এই কণ্ঠস্বরই আমাকে ন্যায়-নীতির প্রতি দৃঢ়চিত্ত করেছে।
মাননীয় আদালত, আমি শুধু
একটি কথাই বলে যেতে চাই,
জ্ঞানের অন্বেষণ করা কি অপরাধ?
আর তা যদি অপরাধ হয়,
তাহলে ধর্মাবতার, আমাকে
যে শাস্তি দেন- তাই আমি সাদরে গ্রহণ করবো।

(প্লেটো রচিত The last days of Socrates এর ছায়া অবলম্বনে)

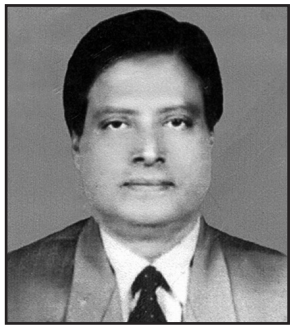

প্রবীণের বেদন

মকবুল হোসেন শওকত
সদস্য নং ১৩
জয়পুরহাট জেলা সমিতি

ছোট্ট গৃহাঙ্গনে উপবিষ্ট বৃদ্ধ ক,জন, শীতল বৃক্ষছায়
বিষন্ন বদন, মলিন বসন, দৃষ্টি অসহায়।
সীমাহীন বেদনায় ক্লান্ত হৃদয়, চেতনায় মুক,
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় আন্দোলিত বুক।
কাটে সময় দুর্ভাবনায়, সমাহিত স্বপন,
ছিন্ন অন্তর, শংকিত জীবন, বিপর্যস্ত বন্ধন।
দেয়ালে ঝুলছে ছোট্ট বোর্ড, "বৃদ্ধ নিবাস"
গৃহহারা পথিকের তরে কারো মহতী প্রয়াস।
জীবন পথের শেষ প্রান্তের পথিকের
ফেলে আসা দালান, কোঠা ক্ষণিকের
বালাখানা- সবই মিথ্যে, মরীচিকার মায়া
জীবনের কঠিন বাস্তবতায় মাথার উপর একটু ছায়া
এই স্বর্গ, এই আশ্রম। মায়ার সংসারের অভিশপ্ত নিঃশ্বাস
করেছে লুণ্ঠন ওদের ঠিকানা, আশা, বিশ্বাস।
সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সকল কষ্টার্জিত উপার্জন
যাদের তরে, আজ তারা কেউ নয় আপন।
আজ আশ্রমে ওসমান কাজীর পাশেই হরি লাল রায়।
কঠিন নিয়তি মিলিয়েছে তাদের একই স্রোতে, এক মোহনায়।
সুখে দুঃখে একে অন্যকে দেয় সাহস,
সান্ত্বনা ভুলিয়ে দেয় জীবনের যত ব্যাথা যত যন্ত্রনা।
শৈশব, বৈশোরে, যৌবন পেরিয়ে আজ এরা প্রবীণ
মরমে মরমে অনুভবে বাজে তাই চিরবিদায়ের বীণ।
অতি আপন একটি পরশের আশায় তৃষিত নয়ন
খুঁজে ফিরে বার বার অতি আদরের পুত্র-কন্যা-স্বজন।
যে নির্যাষে নিজ হাতে গড়া কত আপন মায়াবী মুখ,
দর্শনে তাদের না জানি কত সুধা, কত শান্তি, কত সুখ!
কিন্তু হায়! সময় বহিয়া যায়, আসে না কেউ, আসে অন্তিম ক্ষণ
"বিদায় পৃথিবী তোমাকে ছেড়ে যাই", কাঁদে হিয়া, কাঁদে ব্যথিত মন।

বন্ধন

কাজী নুসরাত সুলতানা
আজীবন সদস্য: ২৩০০
কেন্দ্রীয় সমিতি

আঁখির আড়ে যত দূরেই যাস না কেন তবু,
পারবি কি তুই মোর নাগালের বাইরে যেতে কভু?
যখন যেথায় যেমন থাকিস
যদি আমায় ভালই বাসিস
জাগবে নাকি অনুভবে কেবল অনুক্ষণ,
কারো আঁখি আড়াল হতে করছে নিরীক্ষণ?
কারো মনের স্নেহের বাণী
অদৃশ্য কার চাবুকখানি
মাথার' পরে ছত্রী হয়ে জাগছে নিশিদিন
বাঁধন হয়ে রাখল বেঁধে কারো স্নেহের ঋণ?
কারো আশা কারো স্বপন
করতে তোরে হবে পুরণ
স্মরবি নাকি করেছিলি এমনি অঙ্গীকার?
জ্বালবে না কি পথের আলো স্মরণ-শিখা তার?
এমন যদি নাইরে হবে
কেমন ভাল বাসিস তবে
কেন তবে প্রাণ ভরানো মিষ্টি ডাকের ছল?
কেন তবে মন কাড়ানোর পাতিস কথার কল?
অনেক বড় হতেই হবে
অবাক হয়ে দেখবে সবে
উঠবে ভরে তখন সেদিন গর্বে আমার বুক
আমার আদেশ দিতেই হবে আমায় তোর সে সুখ।
আমার আদেশ করতে পালন
করতে তোরে হবেই যতন

একটি কথা জাগবে মনে কেবল নিশি দিন
চড়া সুদে শুধতে হবে আমার স্নেহের ঋণ।
বর্ম হয়ে এ ঋণ যে মোর
রক্ষা কবচ গড়বে রে তোর
সুখে দুঃখে তোর চেতনায় রইব আমি ছেয়ে,
যে কাজ করিস দেখব এসে অবচেতন বেয়ে।
সত্যি যদি ভালই বাসিস
প্রাণের টানেই কাছে আসিস।
পারবি নে তুই আমার শাসন এড়িয়ে যেতে কভু,
অনেক দূরে আঁখির নাগাল ছাড়িয়ে গেলেও তবু।

নির্বাক প্রকৃতির সবাক ছন্দ

মোঃ বদিউজ্জামান ভূঁইয়া
আঃ সদস্য-৯৯
ময়নসিংহ জেলা সমিতি

বয়সের ভারে ক্লান্ত অবসন্ন নিঃসঙ্গজীবনে,
নির্বাক প্রকৃতি ক্লান্তি হরণের এক নতুন বারতা নিয়ে
আমাকে কাছে টেনে নেয়।
আমিও কেমন এক মায়াবী মোহে
সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখি।
এই যে নীরবে বহমান নদী-নালা-খাল-বিল
উদার উন্মুক্ত আকাশ,
তৃণলতা, পত্র পুষ্পে সজ্জিত গাছের সারি
সুবজ সৌরভে দেয় মুগ্ধতার আবেশ।
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের প্রকৃতি,
নীরবে-নিভৃতে সপ্তসুরের ব্যঞ্জনা ছড়ায়।
বৈশাখে বহ্নিশিখা, জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁঠালের মধুরস
আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টিভেজা গাঁয়ের পথ-ঘাট
নরম তুলোর মত সাদা পানসিতে সওয়ার
হয়ে আসে শরতের সকাল,
শিহরণে কাঁপায় কাশবন।
হেমন্তে দোলায়মান পাকাধানের ছড়া
গ্রাম বাংলার ঘরে আনে নবান্নের আনন্দ
তুষারের চাদর পরে শীত আসে
শুকনো পাতা ঝরার নূপুর বাজিয়ে
নয়ননন্দিত নন্দিনী হয়ে আসে বসন্ত।
নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলে আমার অনুভবে
ধরা দেয়, নির্বাক প্রকৃতির সবাক ছন্দ।

স্বাধীনতা-১৮

প্রফেসর অরুণ প্রকাশ শিকদার
সদস্য নং ২২২২
কেন্দ্রীয় সমিতি

অমৃতের পুত্র আমি আজন্ম স্বাধীন
কোন গ্রহে নক্ষত্রে কতকাল ছিনু পরাধীন!
ছোট এই পৃথিবীর ছোট এক দেশে
জন্মেই দেখি কেন পরাধীন বেশে?
কোন সেই সমতট হরিকেল থেকে
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গর চর্যাপদ মেখে।
ভারতের বার্মা থেকে ইরানের ভূমি
স্বাধীন যাত্রায় কোন প্রমাদ না গণি।
কত রূপে সম্মুখে কত দেশ রাজ
কালস্রোত বয়ে গেল ভাঙ্গিল সমাজ।
কতবার লুণ্ঠিত, সে ভারত ভূমি
তার মধ্যে জেগে ছিনু তুমি আর আমি!
নাদির-হালাকু-বর্গি-ইংরেজ সাথে
শেষদিকে এসে দেখ খানেরাও লোটে।
মঙ্গলপান্ডে থেকে সীতারাম ক্ষুদিরাম
সূর্যসেন বিনয় বাদল দিনেশ প্রীতিলতা নাম।
সিরাজ ঈশা খাঁ বিক্রম আসাদ মতিউর
সালাম বরকত থেকে এল সপ্তবীর।
সকলের শক্তি মিলে হল এক নাম
সর্বশেষ সৃষ্টি হল মুজিবুর রহমান।
তেইশ বছরের স্বপ্ন ন'মাস গর্ভজ্বালা
ধাত্রীমাতা ইন্দিরার ছোটোছুটি পালা।
অকুনি শকুনি কত সপ্তম নৌবহর
সবারে জিনিয়া হল স্বধীনতা ভোর।
সেই দিন হতে আজ ৪৭ বছর

৪৭-সালে কু-স্বাধীন হয়েছি একবার।
১৮-শুভ এ সালে, বসে স্বাধীন স্বদেশ
১৮-ধাপ উন্নয়নে পেয়েছি সন্দেশ।
দেহের ১৮-মোকাম সর্বজনে কয়
১৮-অধ্যায়ে যত গ্রন্থ লেখা হয়।
যুগে যুগে দিল জ্ঞান দূর হতে ভয়
১৮-সালে তাই উন্নত ধাপ পায়।
'চিত্ত করি ভয়শূন্য উচ্চ করি শির'
নাগরিক চলে যদি সে স্বাধীনবীর।
অর্থ বিত্ত সাথে যদি চিত্তের উন্নতি
প্রসারিত হয় দ্রুত পাবে ঠিক গতি।

বিশ্বজয়

এম এ লতিফ
আজীবন সদস্য নম্বর ৯২২
কেন্দ্রীয় সমিতি

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভালোবাসার উৎস
কিন্তু আদিগন্ত এর ব্যাপ্তি,
ভালোবাসার নেই কোন প্রকার ভেদ,
শুধু পাত্র-পাত্রীর বেলায় রয়েছে এর প্রভেদ
রয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ের ভালোবাসা, রয়েছে পারিবারিক ভালোবাসা,
সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ভালোবাসা, পিতা-মাতার জন্য সন্তানের
স্ত্রীর জন্য স্বামীর ভালোবাসা, স্বামীর জন্য স্ত্রীর,
নাতি-নাতনীদের জন্য দাদা-দাদী, নানা-নানীর ভালোবাসা
প্রেমের সংশ্রবে রয়েছে অনেক কাহিনি
যা সুবিদিত অনাদিকাল থেকে,
যেমন, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ইউসূফ-জুলেখা, রাধা-কৃষ্ণ
আর রোমিও-জুলিয়েটকে ঘিরে রয়েছে অনেক কাহিনি যা খ্যাত যুগ যুগ ধরে,
আর উদ্বুদ্ধ করেছে সব কালের প্রেমিক-প্রেমিকাকে।
ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধন মানব হৃদয় থেকে দূরীভূত করেছে
হিংসা-দ্বেষ, হৃদয়ের কলুষতা, ক্রোধ, দ্রোহ,
বিদূরিত করে প্রতিহিংসা স্পৃহা।
শক্তি দিয়ে জয় করা যায় এক বা একাধিক দেশ,
যেমন করেছিলেন আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন প্রমুখ,
কিন্তু শক্তি দিয়ে কখনও বিজয় হয়না মানব হৃদয়।
ভালোবাসা দিয়ে বশ করা যায় পরম শত্রুকেও,
এমনকি পোষ মানানো যায় বন্য পশু-পাখিদেরও,
যুদ্ধ নয়, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বয়ে যায় শান্তির সুবাতাস,
ভালোবাসার জন্য পরম কাংক্ষিত সিংহাসন ত্যাগেরও রয়েছে ইতিহাস।
তাজমহলের কঠিন পাথরের মনোরম শৈলীর অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে
সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়ের পরম আকুতি,

শুধু কেবল মাত্র ভালোবাসার দ্বারাই সম্ভব মানুষে-মানুষে, দলে-দলে,
দেশে-দেশে বিদ্যমান বৈরিতার অবসান।
প্রেমই বহু অমর করিতার প্রধান উপজীব্য
অবিনাশী কবিতার পংক্তিমালায় বিধৃত হয়েছে ভালোবাসার কথা,
সুমধুর গানের সুরে অনুরণিত হয়েছে ভালোবাসার বারতা,
ভালোবাসার দ্বারাই সম্ভব মানব হৃদয় জয়,
এর জন্য প্রয়োজন হয় না কোন অর্থ ব্যয়,
তাই একমাত্র ভালোবাসাই করতে পারে বিশ্বজয়।

অবসর এসে গেল

গাজী মিজান
আঃ সদস্য নং-২৪৩০
কেন্দ্রীয় সমিতি

প্রতিদিন ঘুম ভাঙলে জীবনের একটা পাতা ঝরে
সেই ঝরে পড়া শব্দ ক্যালেন্ডারে ওঠে না
কারো ঘুম ভাঙাতে পারে না।
পিপড়েও জাগে না তাতে--
তবু দিনরাত্রি বুনে বুনে শব্দগুলো শুধু ইতিহাস গড়ে।

দেখতে দেখতে তিনটি দশক গেলো চলে
তিনটি দশক ধরে সহকর্মীর চোখে প্রাণবন্ত ভালবাসা
কিংবা সহনশীল উদারতা, আর মাঝে মাঝে কাতরতা
দেখে দেখে অফিসের দেরাজ খুলেছি।
প্রত্যহের আবর্জনা ঝেড়েমুছে ফরাস পেতেছি--
রামের চৌহদ্দি কেটে সীতাবন্দী রেখেছি সেখানে।

এইভাবে একত্রিশটি ক্যালেন্ডার আলতো ভাবে নামিয়ে
পিছনে তাকিয়ে দেখি-- সীমাহীন বালুর সৈকত
ঢেউয়ের মতন কিছু বুনো ব্যাকুলতা
মুছে দিচ্ছে আঁকিবুকি করা নরম মলাট --
আক্রোশে-বিদ্বেষ নয়, এক প্রকার খেলার নিয়মে--
কালো চশমা চোখে -- যার যার আকাশ দেখতে গিয়ে।

আনন্দ ভ্রমন

খন্দকার রাইছা আমজাদ (লিলি)
সদস্য ন- ৪১৮
নেত্রকোণা জেলা সমিতি

যাত্রা শরৎ আলোর শিউলী ঝরা রাতে, রাঙামাটি পৌছি আঁকাবাকা পথে রোদেল প্রাতে
বৃহস্পতি, দশই মার্চ দু'হাজার এগার সন, হৈ চৈ মিষ্টি মধুর কলতান চঞ্চল বুশরা রেজবিন।
ত্বরিৎকর্মা সবার প্রিয় এরশাদ-মীরা, তরুণ কান্তি চিরসবুজ বারী-ডোরা
চুপচাপ শান্ত কোলাহলে নীরব, সে যে মৌন মুখর তাকী আর সাকিব
কুসুমকান্তি যুগল খালেক, ঝর্ণা, আছি সাথি লিলি-রেহানা সবমিলে বারোজনা।
রাঙামাটি রেস্টহাউজে নয়নাভিরাম দর্শনের পর যাত্রা শুরু দূর্গম এলাকা বরকলে
অপূর্ব বন্ধন অতি সুন্দর শোভন প্রকৃতির কোলে দিগন্ত বনান্তের ধ্যান ভেঙে নিমেষে
নীলাকাশ তলে পাহাড় ঘেঁসে স্পীড বোটখানি মৌনতা ভেঙে নদীতে ভেসে
পৌঁছে দিল আমাদের আবেগঘন আবেশী পরিবেশে।
ক্লান্ত দুপুরে দ্বীপ রেস্তোরা পেদাটিং টিংয়ে আপ্যায়ন, মজাদার খাবারের করেছে আয়োজন
দেখা হলো নাইনিয়ার চর, সেথা চিরনিদ্রায় আব্দুর রউফ শ্রেষ্ঠবীর।
ঘুরা হলো গিরিছড়া যেখানে অতন্দ্র প্রহরীরা দেশ রক্ষায় দিচ্ছে পাহারা।
পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এসএসটিলা, ভাল ফল পেতে পরিশ্রম মেলা
গৌধুলী লগ্ন, হ্যালিপ্যাডে হ্যালিক্যাপ" হলো রেজবিন, বুশরা।
ফানুস উড়াতে যখন সবাই মাতোয়ারা, তখন গাইলো
আলো আঁধারে বুশরা, আজ জোসনা রাতে সবাই গেছে বনে ।
গীত মুখরিত, বন বীথিকা উচ্ছাসী নবীন ক্যামেরা চলছে ক্লিক ক্লিক
বারীভাইও কম যায়নি মধুর স্মৃতি নিতে ব্যস্ত ক্যামেরাতে ঝিলিক।
ভাল লাগলো উপজাতীয় নৃত্য রুনুঝুনু, চলার পথে ঝুলন্ত ব্রীজে লাগলো বন্য অনন্য

মুগ্ধমনোহর বৌদ্ধবিহার নীরবতা ভেঙে কৌতুহলী বানর করছে কিচির মিচির।
আসল কথা গুরুগম্ভীর ছোটসাব, তাফহীম ডিরেক্টর ব্যস্ত হয়ে সামলাচ্ছে নিরন্তর।
মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টামী ভরা চোখ মায়াবী, ছাগলছানার সঙ্গে করছে খেলা মোদের ফারাবী
সাঁঝের বেলা নাস্তার টেবিলে গল্পের আসর যোগ হলো মজাদার কেক পাপিয়ার।
বেড়ানো শেষ, ফেরার পালা, বরকলে আনন্দ হয়েছে মেলা।
সদাপ্রস্তুত বরকলের ছাব্বিশতম বর্ডারগার্ড" দূর্গম এলাকায় কর্ম, প্রকৃতির কোলে বাস।
কাজে তৎপর অধিনায়ক হান্নান খান, মনোমুগ্ধকর তোমাদের অতিথি আপ্যায়ন।
মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা, সুস্বাস্থ্যলাভে ভালবেসে ভালবাসা নেবে
সুন্দর জীবন গীতিময় অনুরণিত হবে।
বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, দেশ ও দশের তরে হবে নিশ্চয়
স্মৃতিমন্থন বারবার করবে আগমন অনেক দিনের চেনার মত বরকলের আনন্দ ভ্রমন।

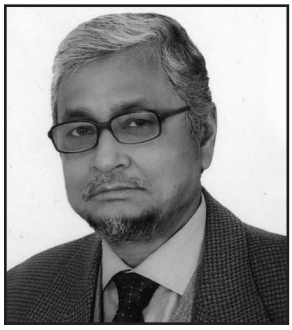

বিড়ম্বনা

এ, কে, এম শফিকুল ইসলাম
আজীবন সদস্য ১৬৫৩
কেন্দ্রীয় সমিতি

কবিতা লিখতে গেলে কত চড়াই উৎরাই যে পার হতে হয়, তাঁর কোন ইয়ত্তা নেই।
যেমন ধরুন, ছন্দমিল, আন্তমিল, শব্দচয়ন, বাক্য বিন্যাস এ সবই আত্মস্ত করতে হবে
এবং লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

কবিতাটির থিম কি হবে, কোথায় কতদূর তাকে টেনে নিয়ে যেতে চান আপনি,

ধরুন আপনি প্রকৃতির কোন একটি বিষয় নিয়ে কল্পনার পরিধি যতটা সম্ভব

বিস্তৃত করে জম্পেশ করে বসেছেন।

দীর্ঘ একটি কবিতা পাঠককে উপহার দেবেন বলে, বেশ অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছেন।

হঠাৎ মনে হল কোন ছন্দ বা শব্দ চয়নে কোন কবির রচিত কোন কবিতার, বাক্য বিন্যাসে
হয়তোবা কিছুটা ছায়া পড়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে।
তখন আপনি কি করবেন?

আবার নতুন করে নতুন কোন থিম নিয়ে হয়তো লেখার চেষ্টা করবেন।
তাই থাকনা কবিতা লিখার এত ঝকমারি,

আসুন কবিতা আপাতত স্থগিত রেখে রবি ঠাকুরের "শেষের কবিতার" অমিত ও লাবণ্যের

শাশ্বত প্রেমের রসায়নে অবগাহন করি।

এবং করোটির ভেতরের সমস্ত কোষ পরিশুদ্ধ করে আগামী পাঠকের জন্য

সময়োপযোগী কবিতার নতুন খসড়া প্রণয়নে ব্রতী হই।

তাই আসুন, মানুষের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটাতে এবং হৃদয়বৃত্তির অবনমন ঠেকাতে
নতুন ভাষায় নতুন শব্দ চয়নে, কবিতার সংসারে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করি।

মা

হাবীবুর রহমান আহমদ
নেত্রকোণা জেলা শাখা।

মাগো, তুমি চলে গেছ দুরে-বহুদুরে
তোমার কোমল হাতে ছোয়া রয়েছে অমলিন
শুধু তুমি নেই আমার পাশে
আমার জন্যে তোমার শয্যা
কাটিয়েছ কতো নির্ঘুম রাত,
আমার আহার যুগিয়েছ
জোটেনি তোমার ভাত।
আজও পুকুরে শাপলা ফোটে
জামগাছে শালিকেরা বসায় আড্ডা
ঘরের পাশে পাতা বাহারে
জোনাকিরা আলো জ্বালে সাঁঝে
কবুতরেরা বাকবাক্কুম ডেকে যায় ঘরের চালে
লতানো লাউগাছে প্রজাপতি উড়ে চলে
ওরা বলে বাড়িটা শূন্য চারধারে
আর আমি তোমার পাদুকা রেখেছি সযতনে
রোজ দেখি আমি সজল নয়নে
সূর্য যখন শেষ দুপুরে
চলে গেলে তুমি,
সান্ত্বনা আর কোথায় পাব
কার সে পদচুমি।

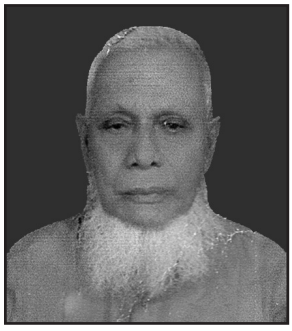

স্বাধীনতা মোর

আ,ক,ম এরশাদুন নবী আনছারী
সদস্য, কুড়িগ্রাম জেলা শাখা

স্বাধীনতা মোর হৃদয়ের এক কাঙ্ক্ষিত অনুভুতি,
শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি
স্বাধীনতা মোর অন্তরতম নিজেকে জানার দ্যুতি।
স্বাধীনতা মোর জলধারাবুকে সুবিশাল এক নদী,
শত বাধা আসে যদি,
স্বাধীনতা মোর বাধা অবহেলে বয়ে যায় নিরবধি।
স্বাধীনতা মোর জলধির জল অবিরাম বহমান
জোয়ার ভাটার টান
স্বাধীনতা মোর মুক্তা মানিক ঝিনুরেক মহাদান
স্বাধীনতা মোর পর্বতোপরি শৃঙ্গ আকাশ ছোঁয়া,
জানেনা সে মাথা নোয়া
স্বাধীনতা মোর স্বত্বাধিকার, যায়না কিছুই খোয়া।
স্বাধীনতা মোর সুনীল আকাশ-নাই শুরু, নাই শেষ
মহাজাগতিক দেশ
স্বাধীনতা মোর দিগন্ত হয়ে আমাকে রেখেছে বেশ।
স্বাধীনতা মোর এদেশের মাটি উর্বরা পলিময়,
আমরা করেছি জয়।
স্বাধীনতা মোর আমাকে করেছে নির্ভীক, নির্ভয়।
স্বাধীনতা মোর আঙিনায় ফোঁটা একটি গোলাপ ফুল,

চামেলী, চাঁপা, বকুল
স্বাধীনতা মোর মৃগনাভী বাসে হরিণী-মন-আকুল
স্বাধীনতা মোর প্রেমের কবিতা প্রেয়সীর লেখা চিঠি
হাসি মুখ মিটি মিটি
স্বাধীনতা মোর ভালবাসা ভরা পত্র লেখার দিঠি
স্বাধীনতা মোরদেশের সীমানা-চিহ্ন চিরস্থায়ী
নিজেরাই নিজে দায়ী
স্বাধীনতা মোর স্বদেশ মাতার শিশুরা দুগ্ধপায়ী
স্বাধীনতা মোর এদেশের সব মানুষের ঘরে ঘরে
বিজয়ের গান করে
স্বাধীনতা মোর এদেশ, জাতিকে বিশ্বে তুলিয়ে ধরে।
স্বাধীনতা মোর আনিতে যাগারা নিঃশেষে দিল প্রাণ,
রক্ত করিল দান
স্বাধীনতা মোর আনিল যাহারা, তারা মহামহীয়ান।

স্মৃতি কথা

প্রবীণদের অবহেলা করবেন না,
তাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করুন।

মসজিদে নববী (নবীর মসজিদ)

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ সামসুজ্জামান চৌধুরী
আজীবন সদস্য নং-১৫০৩
কেন্দ্রীয় সমিতি

দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি গাড়ীর বহর। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ নীচে সুপ্রসস্ত মসৃণ রাজপথের দু ধারে রুক্ষ, শুষ্ক, ধুসর পর্বতমালা, গন্তব্য সোনার মদীনা। বিদায়ী তাওয়াফ শেষে হোটেলে পৌছে শোনা গেল আজ এশার নামোজর পর মদীনা রওনা হতে হবে। বাঁধা-ছাদা করে অপেক্ষার পালা। গাড়ী আর আসে না। আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে গেল রাত। আসি আসি করে গাড়ী এলো সকাল ৯ টায়। মালপত্র যাত্রী নিয়ে মিসফালা থেকে গাড়ী ছাড়লো তখন ঘড়িতে ১১টা বাজে। মিসফালাতে পাঁচ-ছয় হোটেলে আমরা ছিলাম ৩৬৪ জন বাংলাদেশী সবাই চলেছি একসাথে মক্কা শহর ছেড়ে বাস চলেছে মদীনার পথে, সবার মনে এখন চিন্তা কখন পৌছাবো মদীনায় আর কখন দাঁড়াব গিয়ে রসূলে পাক (সাঃ) এর রওজার সামনে। ভাবছিলাম মক্কা থেকে মদীনা এতটা দীর্ঘ পথ একমাত্র সাথী হযরত আবু বক্কর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে কখনও উটের পিঠে কখন পায়ে হেঁটে রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) পাড়ি দিয়েছিলেন। তখন পথ ছিল দুর্গম তাঁর উপর ছিল দুশমনের ভয়। একটু যেন তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ করে ইতিহাসের পাতা থেকে অতীত এসে ভীড় করল চোখের পাতায়।

১৪ নববী সাল, মক্কায় মুসলমানদের উপর কুরায়েশদের অত্যাচারের মাত্রা এতোই বৃদ্ধি পেলো যে, মক্কায় তিষ্টানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মদ (সাঃ) তখন তাদেরকে মদীনায় হিজরতে অনুমতি দিলেন। এদিকে আবু জেহেল প্রমুখ প্রধান প্রধান কুরায়েশ নেতাদের পরামর্শে মহানবী (সাঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) কে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন এবং হিজরতের হুকুম নাজিল করলেন। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বিলম্ব না করে হজরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন এবং প্রিয় সঙ্গী, সহচর সিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বক্কর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে শহর থেকে ৪ মাইল দূরে গিরি ছাওর গুহায় আত্মগোপন করলেন।

মক্কা ত্যাগ করার সময় মক্কা শহরকে পশ্চাতে রেখেই য়াছরিবের (মদীনার) দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন একটি শহর থেকে বের করে এনেছ যে শহরটি আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়, এখন তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমাকে তুমি এমন একটি শহরে আমার বাসস্থান করে দাও যে শহরটি তোমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়।"

তিনদিন তিন রাত্রির পর ছাওর গিরি গুহা হতে রওনা হয়ে সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে ৮ দিন পর ৮ই রবিউল আউয়াল ১৪ই নববী সাল মদিনা হতে কয়েক মাইল দূরে কুবায় এসে পৌছালেন। কুবায় ৮ দিন থাকার পর ১৬ই রবিউল আউয়াল সূর্যাস্তের তিন ঘন্টা পূর্বে মহানবী তাঁর উটনী কাসওয়ায় আরোহণ করে মদিনার পথে যাত্রা করলেন। কয়েক শত নারী পুরুষ অনুসারী কেউ উটে কেউ ঘোড়ায় চড়ে, অনেকে পায়ে হেঁটে তাঁর অনুসরণ করেন। পথে সব গোত্রের লোকেরা এই আশা করতো যে, মহানবী তাদের সঙ্গে থাকবেন। এসব গোত্রের মধ্যে মহানবীর দাদাকূল এবং মাতৃকূলের গোত্রও ছিল। সেজন্য তারা মহানবীর উটের সামনে এমনভাবে ভীড় জমালো যে উট থেমে যেতে বাধ্য হয়। মহানবী তাদের বললেন, "আমাকে এমন একটি শহরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে শহরটি অন্যান্য সকল শহরের উপর শাসন করবে এবং সকল শহর সেই শহরের প্রতি অনুগত থাকবে"। আরও বললেন, "একে ছেড়ে দাও, কেননা ইতোমধ্যেই সে সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে গেছে"। জানা যায় যে, মহানবী শহরে পদার্পণ করার সাথে সাথে শহরের প্রতিটি এলাকা এক অদ্ভুত আলোচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কালো চোখের এবং ফর্সা রং এর মেয়েরা ছাদে ছুটে গিয়ে নাচতে গাইতে শুরু করে-

"উদিত হয়েছে চাঁদ

বিদ্যা পর্বতের উপত্যাকা থেকে।

যতদিন মানুষ ইবাদত করবে আল্লাহর

ততদিন পর্যন্ত তাকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ।"

অতঃপর মহানবী তাঁর হাতের ডালিম গাছের ডাল দিয়ে উটের ঘাড়ে মৃদু স্পর্শ করলেন এবং লাগামে টান দিলেন। উটনী চলতে শুরু করল। চলতে চলতে এক সময় উটনী বনুমালিক ইবনে নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় গিয়ে একটি অনাবাদী জমির উপর বসে পড়ল। একটু পরে উঠেই আবার কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হলো। তারপর আবার ফিরে এসে পূর্ববর্তী স্থানে বসে পড়লো। এবার উটনী বসে গা ঝাড়া দিল, ঘাড় নীচু করে ফেললো এবং লেজ দুলাতে লাগলো। মহানবী উটের পিঠ হতে অবতরণ করে চারবার এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন ঃ

"হে আল্লাহ আমাকে এমন একটি গৃহে বিশ্রামের স্থান করে দিন যে গৃহে আপনার রহমত প্রাপ্ত। কারণ আপনি মাসুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য সার্বোত্তম।" অতঃপর তিনি নিকটস্থ আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে অবস্থান নিলেন। মহানবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ ভুখন্ড কি তোমার?"

আবু আইয়ুব উত্তর দিলেন, "এর মালিক সাহেল ও সুহায়ল নামক দুইটি ইয়াতিম বালকের, তারা আমার অভিভাবকত্বে আছে।" আল্লাহর নবী উত্তর দিলেন "এটিই হবে আমার গৃহ, আমার এবাদতের স্থান এবং আমার চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান"। এখানেই মহানবী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর স্থায়ী বিশ্রামের স্থান হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ কোটি মুসলমানদের

তীর্থ স্থানের মধ্যমনি হিসাবে বিরাজিত রয়েছে। নি এটিই মসজিদে নববী বা নবীর মসজিদ। হজরত মহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, "আমি ভুখন্ডটি মূল্য দিয়ে কিনতে চাই।" হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তখনই তাঁর মূল্য পরিশোধ করলেন। মহানবীর নির্দেশে জমিটির উপর অবস্তিত খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হলো। মূর্তি পূজারীদের কবরগুলি ভূমির সাথে সমান করে দেওয়া হলো।

মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করলে হজরত জিবরাইল (আঃ) আবির্ভূত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলে গেলেন যে, মসজিদের ছাউনি যেন তাঁহার ভ্রাতা হজরত মুসা (আঃ) এর ছাউনির মত হয়। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, মুসার ছায়া কি? মহানবী বলেন, "তিনি দাঁড়াইলে ছাদ মস্তক স্পর্শ করিত।" এটির অর্থ এই যে, মুসা আলাইয়িস সাল্লামের মসজিদ যে রূপ মাত্র শুধু ছায়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল সে রূপ মসজিদে নববীও শুধু ছায়ায় জন্য নির্মিত হবে, জাকজমকের জন্য নয়।

রসুলুলাহ (সাঃ) ও সাহাবীগণ মসজিদ নির্মাণ কাজে আত্মনিয়াগে করলেন। তিনি তাদেরকে প্রস্তর আনতে নির্দেশ দিলেন। শাহেন শাহে দু-আলম নিজেও প্রস্তর বহন করে আনতেন এবং তিনি কেবলার দেয়ালের রেখা ঠিক করে দিলেন। প্রস্থর বহনকালে সাহাবীগণ এই কবিতা পাঠ করতেন এবং স্বয়ং রাসুলুলাহ (সাঃ) তাদের সাথে তা আবৃত্তি করতেন।

"আখিরাতে, মঙ্গল ব্যতিত মঙ্গল নাই।

আল্লাহ আনসার ও মোহাজিরনেরকে রহম কর।"

হিজরির প্রথম বৎসর মসজিদ নির্মিত হল। নির্মিত হল অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে, পাথরের দেওয়াল, খেজুর পাতা ও তৃণের ছাউনি, খেজুর গাছের খুটি, মাটির ভিটি, মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর। বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে পানি পড়ত। মুসল্লীগণ ভিজে যেতেন। খেজুরের শাখা জ্বালিয়ে মসজিদে বাতি দেওয়া হতো। হজরত তামীমদারী (রাঃ) নবম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণের পর সমজিদে জয়তুন তৈলের লণ্ঠনের ব্যবস্থা করেন। এটিতে রাসুলুলাহ (সাঃ) আনন্দিত হয়ে বললেন, "তুমি আমাদের মসজিদকে যেরূপ আলোকিত করেছ, আল্লাহ তোমাকে সেরূপ আলোকিত করুন। আমার কন্যা থাকলে তোমার কাছে বিবাহ দিতাম।" মসজিদে মাটির উপরেই নামাজ পড়া হত। এক রাত্রি বৃষ্টিতে মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে গেল। নামাজ পড়ার সময় কেউ কেউ নিজ বসবার স্থানে কাঁকর বিছিয়ে দিলেন। মহানবীর (সাঃ) এটি মনপুতঃ হল। তারপর সমস্ত মসজিদে কাঁকর বিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে মসজিদের কেবলা ছিল বায়তুল মাকোদ্দিসের দিকে। উহার তিনটি দরজা দেওয়া হয়েছিল। একটির নাম বোব রহমত, একটির নাম বোব জিবরাইল, আর একটি পশ্চাদ দিকে। বোব জিবরাইল দিয়া রসুলুলাহ (সাঃ) মসজিদে প্রবেশ করতেন। কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তিত হলে পশ্চাতদিকের দরজা বন্ধ করে উত্তর দিকে নতুন দরজা দেওয়া হয়। মিম্বর ঃ রসুলুলাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে নামোজ মুসলার (জায়নামাজ) ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে খেজুরের খুটিতে হেলান দিয়ে জুম্মায় খুতবা প্রদান করতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দূর হতে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যেত না। হজরত ইবরাহিম আলায়হিস সাল্লামের একটি মিম্বার ছিল। রসুলুলাহ (সাঃ) নির্দেশে তিন সোপান বিশিষ্ট একটি মিম্বার প্রস্তুত হল। রাসুলুল-

াহ (সাঃ) বললেন, "আমার এই মিম্বার বেহেস্তের একটি নহরের মুখে ও উহার পায়াগুলি বেহেশতে অবস্থিত। আমার গৃহ ও মিম্বারের মধ্যে বেহেশতের একটি উদ্যান রয়েছে।" মসজিদ নির্মাণ কার্য শেষ হলে তার সংলগ্ন উম্মেহাতুল মুমিনদের জন্য কাঁচা ইট দ্বারা হুজরা তৈরী করা হয়। পরে তা মসজিদে নববীর সামিল হয়ে যায়। হজরত আয়েশা গৃহে রসুলুলাহ (সাঃ) রওজা শরিফ বর্তমান। খায়বারের বিজয়ের পর মসজিদের আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়। হজরত ওমর (রাঃ) এর খিলাফতের সময় তিনি মসজিদ পুনঃ নির্মাণ সাধন করেন। কিন্তু কোন পরিবর্তন করেন নাই। তার জামানা থেকে মসজিদে মোটা চাটাই বিছানো হয়। হজরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতের সময় কারুশিত্ম খচিত প্রস্থর দ্বারা স্থম্ভ ও প্রাচীর ও শাল কাঠের খুটি দ্বারা মসজিদের ছাদ পুনঃ নির্মিত হয়। ইসলামের রওনক বৃদ্ধিই তার উদ্দেশ্য। এর পর যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। মক্কা তথা মদিনার শাসনভার অনেকবার পরিবর্তন হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে সময় সময় কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। সেম্তদী শাসন আমলে মসজিদের আকার আয়তন পরিবর্তন ও শোভনীয় করা হয়। এরপর প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সৌন্দয্যমন্ডিত ও আধুনিকায়নের কাজ চলছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ), লেখক- যয়নুল আবেদীন রাহনুমা

সাইয়্যেদুল মুরশালীন, লেখক- আব্দুল খালেক।

ইসলামের ইতিহাস, লেখক- মৌঃ আকবর শাহ খান নাজিরাবাদী

History of Madina Munawwarah by Shaik Safiur Rahman Mobarakpuri

স্মৃতিও কাঁদায়

নিত্য গোলাপ বিশ্বাস
আঃ জীঃ সঃ নং- ৬২
অবসর কল্যাণ সমিতি, নড়াইল শাখা

ষাটোর্ধ গোপেস বাবু ছিমছাম সুঠাম দেহের অধিকারী। সদা হাস্য সদালাপি নির্ঝনঝাট জীবন যাপনে অভ্যস্থ। মোটা মুটি স্বাস্থ্য সচেতন ছোট পরিবার স্বস্থিতেই চলছিল তাঁর দিন গুলি। বন্ধু বান্ধব, শুভাকাংখি এটিত কম নয়। তাঁর মধ্যে আবার দু-একজন বেশ আন্তরিক। তাদের সাথে পারিবারিকসম্পর্ক ও বিদ্যমান। মাঝে মধ্যে আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া চলে তাদের সাথে। গোপেস বাবুর ঐ রূপ একজন সমমনা সতীর্থ যোগেস বাবুর সাথে সখ্যতা হয়। প্রায় দিনই উভয়েই মধ্যে দেখা সাক্ষাতও ভাব বিনিময় হয়। আবার দুজনে একসাথে কোথাও বেড়িয়ে আসেন। যোগেস বাবু ও সদ্য হাস্য সদালাপি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তিনিও দেখতে হালকা পাতলা ছিমছাম স্বাস্থ্য সচেতন সুদর্শন এবং এলাকায় সম্মানীয়। গোপেস বাবু ও যোগেস বাবুর কর্মজীবনে আলাদা পেশা ছিল। বর্তমান মতের কিছুটা পার্থক্য হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মতের মিল আছে। সে জন্য উভয়েই মাঝে মধ্যে একে অপরের খোঁজ খবর নেন। কখনও কখনও দুজনে আড্ডা দেওয়ার সময় উভয়ে অতীতের স্মৃতিমন্থন করেন। শিশু কৈশোর যৌবন এবং কর্ম জীবনের অনেক সুখ দুঃখ বঞ্চনা প্রাপ্তি নিয়ে উভয়ে স্মৃতিচারণ করেন। একদিন যোগেস বাবুর বাড়ীর আঙ্গিনায় উভয়ে চা ও মুড়ি খাওয়ার আড্ডা দেওয়ার সময় তাঁর অতীত জীবনের একটি মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ করছিলেন যা হৃদয় বিদারক; মনে রাখার মত। ঘটনাটি এই রূপ। যোগেস বাবু কর্মজীবনের প্রারম্ভে কোথা থেকে একটি কুকুরের বাচ্চা এনে তাঁর বাড়ীতে ভৃত্যের মত পাহারা দিতে শুরু করল। যোগেস বাবুর প্রথমে কুকুরটির আগমন ভাল লাগছিল না। একটা উটকো ঝামেলা, কুকুরটিকে তিনি তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কুকুরটি পেটের তাগিদেই হোক, আর কোন ঋন শোধের জন্যই হোক, তাকে তাড়িয়ে দিলেও ঘুরে ফিরে আবার যোগেস বাবুর বাড়ীতে এসে খুব আনুগত্যের সাথে বাড়ী পাহারা দিত। যা বাবু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

এভাবে যোগেস বাবু কুকুরটির প্রতি আস্তে আস্তে নমনীয় হয়ে যান। প্রথমে কুকুরটিকে নিচ উচ্ছিষ্ঠ দেওয়া হতো। কয়েক দিনের মধ্যে কুকুরটির আচরণ পাল্টাতে থাকে। যেমন- যোগেস বাবু সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাহিরে আসলে কুকুরটি যোগেস বাবুকে সামনের দু পা বাড়িয়ে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করে এবং লেজ নাড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে। এ সব দেখে যোগেস বাবুর কুকুরটিকে বেশ ভাল লাগতে শুরু করে এবং তাঁর খাবারের তালিকায় উচ্ছিষ্ঠতার পরিবর্তে নিদৃষ্ট মেনু তৈরী করে খাবার দিতেন এবং তাঁর জন্য একটি জায়গাও বরাদ্দ হল। এর মধ্যে বাবু ভাল বেশে কুকুরটির একটি নামও রাখা হয়। কুকুরটির গায়ের রং কাল বলে তাঁর নাম রাখা হয় কালু।

কালু বলে ডাকলে কুকুরটি স্বতস্ফুর্ত ভাবে সাড়া দেয় ও আদেশ পালনের জন্য উদগ্রিব হয়ে থাকে। যোগেস বাবু বাড়ীর বাইরে গেলে কালু তাঁর পিছে পিছে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে, বাড়ী ফিরে যায়।

যখন বাবুর বাড়ী ফেরার সময় হয় কালু তখন বাড়ীর বাহিরে রাস্তার পর এসে বাবুর অপেক্ষায় বসে থাকে। বাবুর সাথে কালুর দেখা হওয়ার সাথে সাথে দু পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে মুখ নিচে নামিয়ে কুর্নিশ করে ও আনন্দে লেজ নাড়িয়ে বাবুকে শ্রদ্ধা জানায় এবং বাবুর আগে আগে বাড়ীতে চলে আসে। কুকুরটি দিনের বেলায় খাওয়া দাওয়া করে কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়। কোন অপরিচিত বাড়ীর মধ্যে আসলে ঘেউ ঘেউ করে বাড়ীর লোকজনকে জানিয়ে দেয়। এরপর সারা রাতভরে বাড়ীতে যাতে কোন অনাকাংখিত মানুষ বা জীবজন্তু না আসতে পারে, তাঁর জন্য অতন্ত্র প্রহরীর মত পাহারা দেয়। এভাবে যোগেস বাবুর সাথে কালুর প্রভূ-ভৃত্যের খেলা চলতে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে একটি অব্যক্ত আত্মিক প্রেম গড়ে উঠে। অনেকক্ষন একে অপরকে না দেখলে অস্বস্থি বোধ করে।

কয়েক মাস পর একদিন যোগেস বাবু বাড়ীর লোকদের কালুর প্রতি খেয়াল রাখার কথা বলে এবং কালুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কয়েক দিনের জন্য তাঁর এক অত্মীয় বাড়ী বেড়াতে যান। কালু বাবুর সেই বিদায় কথা বুঝতে পারে নাই। তাই সে নিদৃষ্ট সময় রাস্তার পর বাবুর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু দুপুর যায়, বিকাল যায়, সন্ধ্যা আসে, বাবুর দেখা নাই। সে বিষন্ন বদনে বাড়ী ফিরে আসে এবং একটি অব্যক্ত স্বরে বাড়ীর অন্যদের কাছে জানতে চায়, তাঁর প্রভু কোথায়? পরের দিন এখন ভাবে কালু রাস্তায় তাঁর প্রভুর অপেক্ষায় বসে থেকে, শেষে বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়।

পরের দিন কালু আনমনা হয়ে রাস্তার পর শুয়ে তাঁর প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি টেম্পু এসে কালুর পিছনের দুটি পা পিষে দিয়ে দ্রুত চলে যায়। তখন কালু গুরুতর আহত হয়ে বাড়ীর পাশে একটি ঝোপের মধ্যে এসে মৃত্যু যন্ত্রনায় ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে বাঁচাতে আসে নাই। ২/৩ দিন হয়ে গেল কালুকে কেউ খাবারও দেয় নাই যত্নও করে না। কালু তখন মৃত্যু পথ যাত্রী। তাঁর প্রভুকে এক নজর দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে। যোগেস বাবু কয়দিন পর বাড়ীতে আসে কিন্তু কালুকে দেখতে পায় না। কালু তাঁর প্রভুর উপস্থিতি টের পেয়ে ভাঙ্গা গলায় হাউ হাউ করে তাঁর অবস্থানের কথা প্রভুকে জানায়। বাবু তখন দ্রুত কালুর কাছে যেয়ে দেখে সে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে। বাবু তখন মর্মাহত হয়ে কালুর পাশে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কালু মাজা উচু করে উঠতে পারে না। প্রভুর পরম আদরে আপ্লুত হয়ে শেষ বারের মত সামনের পা দুটি বাবুর পা স্পর্শ করে কুর্নিশ জানায় এবং প্রভুর মুখ পানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সে সময় কালুর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষন পরে কালুর দুটি চোখ ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে আসে। যোগেস বাবু কালুর মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর প্রাণ পাখী উড়ে যায়। কালুর নিথর নিস্পন্দ দেহ পড়ে থাকে। বাবুও শোকে মুহ্যমান হয়ে অব্যক্ত একটা চাপা কান্না নিয়ে কালুর পাশে বসে থাকে। যোগেস বাবু অতীত স্মৃতি চারণ করতে করতে তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। গোপেস বাবুও নির্বাক হয়ে স্মৃতি কথা শুনতে শুনতে তাঁর দু চোখ জলে ভরে উঠে। বাতাস ভারি হয়ে যায়। এরপর দু জনে নির্বাক হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

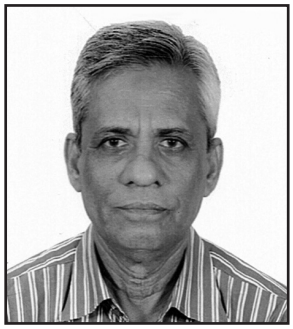

সুখের স্মৃতি অমলিন

নাজিবুল্লাহ সুজন
আজীবন সদস্য নং ২৪৫৩
কেন্দ্রীয় সমিতি

আমার চাকুরির বয়স গড়িয়ে গড়িয়ে যখন দশ বছরে পা দিয়েছিল সেই সময়ে একটা বদলির চিঠি পেলাম। এই চিঠি যে আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা ছিল তা নয়। দশ বছরের চাকরি জীবনে ইতিমধ্যে ছয়টি কর্মস্থল ঘুরে এসেছি। কিন্তু এবারের চিঠিটা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিলো। সাড়ে তিন বছর বেশ ভালই ছিলাম। নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা চত্বর পাকা সড়কের পাশে হওয়ায় বেশ ভালই কাটছিল দিনগুলো। কৃষি অফিসার হিসাবে সুন্দর গোছানো গাছ-গাছালিতে ঢাকা উপজেলা চত্বরে কৃষি বিল্ডিং-এ সংসার পেতেছি। স্ত্রী সেলিনা আশে-পাশের ভাবীদের সাথে বেশ সখ্যতা তৈরী করে ফেলেছে। মেয়ে নদীকে ক্যাম্পাস সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিয়েছি। ছেলে সাক্ষরের বয়স কিছুদিন আগেই এক বছর পূর্ণ হলো। এই অবস্থায় বদলির কাগজটা পেয়ে বেশ চিন্তাই হলো। সেলিনা আমার চিন্তার রশি কিছুটা হলেও আলগা করে বললো, 'তুমি অতশত চিন্তা না করে নতুর কর্মস্থলে চলে যাও। আমি না হয় কিছুদিন মায়ের কাছে ঢাকায় কাটাব'। আমি বললাম, কতদিন থাকতে হবে সেটা তো অজানা। সেলিনা বললো, 'তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবে'। বুঝলাম সেলিনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। আমিও মনে মনে সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম।

সে তো হলো। কিন্তু কিছুতেই জানা যাচ্ছিল না আমার নতুন কর্মস্থলে পৌছাব কেমন করে। বাংলাদেশের মানচিত্র খুলে দেখলাম ঝালকাঠি জেলার মধ্যেই কাঠালিয়া উপজেলা। একমাত্র নদী পথেই যাওয়া সম্ভব। দক্ষিণাঞ্চলে যাদের বাড়ি সেইসব বন্ধু-বান্ধব বা কলিগদের জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পাওয়া গেল না। শুধুমাত্র একজন বলতে পারল কাঠালিয়ায় যেতে হলে সোজা ঢাকার সদরঘাটে গিয়ে বরগুণার লঞ্চে উঠলেই কাঠালিয়া পৌছানো যাবে। আর দেরী না করে সব ব্যবস্থা সেরে একদিন খোঁজ খবর নিতে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে উপস্থিত হলাম। সদরঘাটে কোনদিন আগে এসেছি বলে মনে পড়ে না। নদীর পাড় ঘেঁষে পাস্টুন আটকে থাকা বিশাল লঞ্চ গুলোকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আরিচা ঘাটের লঞ্চ দেখেছি, আমার ধারণাও ছিল সেরকম। লঞ্চ যে এতবড় হয় আমার ধারণা ছিল না। সেখানে গিয়ে জানলাম বরগুণায় যে লঞ্চগুলো যাবে সেটাই কাঠালিয়ায় পৌঁছে দিবে। বিকাল পাঁচটায় সদরঘাট থেকে লঞ্চ ছেড়ে যাবে আর কাঠালিয়ায় পৌছুবে পরেরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ। কাউন্টার থেকে আমাকে কেবিনের টিকেট কাটার পরামর্শ দিল। বললাম, আগামী কালের ভালো একটা টিকেট দিন। টিকেট বিক্রেতা বুঝে ফেলেছে আমি এই লাইনে নতুন যাত্রী।

তাই যথেষ্ট সহযোগিতা পেলাম। সে-ই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বললো কীভাবে আমি কাঠালিয়ায় পৌছুতে পারবো।

পরেরদিন বেশ কিছু সময় হাতে রেখে বিকাল পাঁচটার অনেক আগেই সদরঘাট এসে পৌছালাম। বুড়িগঙ্গা নদীর নাম শুনেছি কিন্তু এত কাছে থেকে কোনদিন দেখা হয় নি। এই নদীকে কেন্দ্র করেই ঢাকা গড়ে উঠেছে। শত শত বছর পেরিয়ে নানা রকম উত্থান পতনের পর আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। কিন্তু বুড়িগঙ্গা আজ সত্যি সত্যি বুড়ি হয়ে মৃত্যুর দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক পাঁচটা বাজতেই তিনতলা বিশাল লঞ্চ এসে পল্টুনে ভিড়ে গেল। অমনি যাত্রী ওঠাও শুরু হয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করেই তিনতলায় আমার জন্য নির্ধারিত কেবিনে পৌছুতে হলো। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় যতটা মন খারাপ লাগছিল লঞ্চে ওঠার পর কিছুটা সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেলাম। আরিচা ঘাটে ছোট লঞ্চে চড়ে নদী পার হওয়ার অভিজ্ঞতার কাছে এর কোন তুলনা হয় না। এই বিশাল লঞ্চে সবকিছুই আছে। রীতিমত বাসাবাড়িতে বসবাস করার অনেক সুবিধা লঞ্চে যাত্রাকালীন ভোগ করা যাবে। একজন বয় এসে বললো, স্যার রাতের খাবার খাওনের সময় হইলে বইলেন। রুমে খাওন আনমুনে।

এরি মধ্যে লঞ্চ ঘাটের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে মাঝ নদীর দিকে এগুতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর পাড়ের দৃশ্যগুলো রাতের আঁধারে ঢেকে গিয়ে দৃশ্যমান কিছু থাকল না। কিন্তু সেটাও এক আলাদা রকম অনুভূতি সৃষ্টি করলো মনের ভিতরে। লঞ্চের মাথায় লটকানো সার্চ লাইটের আলো নদীর বুকে খুঁজে খুঁজে বিশাল এক যানকে পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে ভেঁপুর আওয়াজ মেয়েলি কণ্ঠের আর্তনাদের মতো মনে হলো। কেবিনে বিছানা পাতা রয়েছে। আমার সেখানে একা থাকার ব্যবস্থা করা হলেও বাহিরে ছোট্ট পরিসরটায় কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার পেতে নদীর ঢেউয়ের শব্দ শোনার জন্য অনেক রাত অবধি বসে থাকলাম। লঞ্চ বিভিন্ন জায়গায় ভেড়ানোর পর চাঁদপুর ঘাটে ভিড়তেই মানুষের হৈ-চৈ শব্দে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। যারা কেবিনের ভিতরে ছিল অনেকেই বের হয়ে এল হৈ-চৈ শব্দে। তারপর আবার ভেপু বাজিয়ে লঞ্চ চাদপুর ঘাট ছেড়ে গেল। কিছু সময় পরে লঞ্চ ভেসে চলল বিশাল জলরাশির মধ্যে। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে থাকলাম। দুই নদীর মিলনস্থলের কথা শুনেছি। মনে হল এটা সেই জায়গা। চারদিকে পানি ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছে না। প্রচন্ড ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে লঞ্চটি যে এগুচ্ছে বুঝতে পারলাম। বয়কে ডেকে কেবিনে রাতের খাবার এনে রেখেছিলাম। আমি যখন রাতের খাবার খাচ্ছি, আশে পাশের কেবিনের যাত্রীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন। খাবার গ্রহণ শেষ করে বিছানায় শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছি। লঞ্চ ডুবির দুশ্চিন্তায় আমার চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এসেও বার বার ফাঁকি দিচ্ছে।

সকাল বেলা ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন সকালের রোদ কেবিনের দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। হাত ঘড়ি দেখে বুঝলাম অনেক আগেই সকাল হয়েছে। দেরি না করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার মনের ভিতর গুঁজে রাখা কথাটা ভেসে উঠল। সকাল এগারটায় কাঠালিয়া ঘাটে লঞ্চ ভিড়বে। অতএব সময় মাত্র ঘন্টা তিনেক আছে।

বেশ শঙ্কা নিয়ে অবশেষে কাঠালিয়ায় পা রাখলাম। লঞ্চ ঘাটের বাহিরে হাতে গোনা কয়েকটি রিক্সা আর ভ্যানকে অপেক্ষা করতে দেখলাম। রিক্সা নিয়ে একটা ইট-বিছানো রাস্তা দিয়ে চলে এলাম উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে। দোতালায় কৃষি অফিসে হাজির হয়ে পরিচয় দিতেই সমস্ত অফিস বেশ নড়েচড়ে উঠল। খাতির যত্ন ও শুরু হলো। মধ্যবয়সী পিয়নকে বলতে শুনলাম, মোগ বড় স্যার আইয়া পড়ছে। অফিস রুমের ভিতরে বসে কণ্ঠ শুনে বুঝলাম সে বেশ গর্ব করে কথাটা শোনাল কাউকে। খোঁজ নিয়ে জানলাম অফিসের দায়িত্বে বিষয়বস্তু কর্মকর্তা বিনয় বাবু কর্মস্থলে নাই। শুনে অবাক হলাম উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসাবে আমিই প্রথম যোগদান করলাম। প্রথম দিনেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। অফিসার কোয়ার্টারের নীচতলার একটা ফ্ল্যাটে মেস করে কিছু অফিসার থাকে। সেখানেই আমার জন্য ব্যবস্থা হলো। পরে শুনেছিলাম বিনয় বাবু আমার জন্য আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্রথম একজন উপজেলা কৃষি অফিসারের দুর্গম এই উপজেলায় পোষ্টিং হয়েছে এটা শুধুমাত্র এই অফিসেই না, উপজেলার অন্যান্য অফিসেও আলোচনার বিষয় হয়েছিল। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী অফিসারের সাথে পরিচিত হতে গিয়ে এটা বুঝলাম।

সপ্তাহ ঘুরে ছুটির দিন চলে এলো। কিন্তু সহজে কোথাও যাবার উপায় নেই। ঝালকাঠি যেতে লাগে পাঁচ ঘন্টা। সেটাও শুধুমাত্র লঞ্চে চড়ে যেতে হয়। আর ঢাকায় যে স্ত্রী ছেলে-মেয়ে রেখে এসেছি সেখানে যাওয়ার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। উপজেলার ভিতরে ঘুরতে নৌকা নয়তো পায়ে হেঁটে চলতে হয়। মোটর সাইকেল পর্যন্ত চলে না, আর বাসতো দূরের কথা। মাঝে মাঝেই অপ্রশস্থ খালের উপর সুপারি কিংবা নারিকেল গাছের কান্ড শুইয়ে দেয়া হয়েছে। এর উপর দিয়েই পার হতে গিয়ে আমার তো গলদমর্ম অবস্থা। কারও সাহায্য ছাড়া কোন সময় পার হয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। তারপরেও আমার মাঠ কর্মী ব্লক সুপারভাইজারদের কাজ দেখার জন্য অফিস ছেড়ে মাঝে মধ্যেই বাহিরে যেতাম। কৃষকের সাথে সভা করা বা তাদের সমস্যা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে গ্রামে গেলে একটা বিষয় আমার মনে দাগ কেটেছিল। কৃষকদের বাড়ি থেকে না খেয়ে আসার উপায় নাই। মোটামুটি অবস্থা সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে গেলে পোলাও আর মুরগি রান্না করে চটপট হাজির করবেই। কয়েকদিনের মধ্যে এলাকার কৃষি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলাম। দেশের প্রায় অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ হলেও কাঠালিয়া উপজেলায় কোথাও উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ নাই। অথচ অধিকাংশ জমি সেচের আওতায় আনা বেশ সহজ বলে মনে হলো। মাথার ভিতর চিন্তাটা ঘুরপাক খেতে লাগল। উপজেলায় উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ শুরু করলে বড় একটা দৃশ্যমান বিষয় যেমন হবে তেমনি এলাকার কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবে। এদিকে কিছুদিন আগেই অষ্টাশির ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল কাঠালিয়া উপজেলায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ টাকা অলসভাবে পড়ে আছে। এই অর্থ খরচের জন্য আমি বিনয়ের সাথে আলাপ করতেই বিনয় জানালো, স্যার আপনি নতুন, তাই বুঝতে পারেন নাই এখনও। এলাকার কিছু মানুষ আর অফিসের মাঠকর্মী আছে তারা দুর্নীতি দমন বিভাগে কিছু লিখে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত থাকে সবসময়। সাবধানে কাজ করবেন। দরকার হলে কিছুই করবেন না। আমি তো অবাক। বিনয়কে বললাম, তুমি কিভাবে চালিয়েছ? বিনয় বললো, যেটুকু না করলে না সেটুকুই করেছি স্যার। কৃষি পুনর্বাসনের টাকাও

এভাবে পড়ে আছে। খরচ করলেই দুর্নীতি দমন বিভাগের সামনে হাজির হতে হবে।

আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। এখানে পোষ্টিং হওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে বেশিদিন এখানে থাকতে না হয়। কিন্তু যে কটা দিন আছি কাজ ছাড়া থাকা তো অসহনীয়। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আলাপ করলাম। উনার মুখের ভাষা অর্ধেক বুঝি আর অর্ধেক আন্দাজ করে নিই। আঞ্চলিক ভাষায় সবসময় কথা বলেন। এতটুকু বুঝতে পারলাম চেয়ারম্যান সাহেবের কোন অমত নাই। তবে এতটুকু বললেন, দেইখেন ধানবীজ আর সার কেনতে অইলে মোর শালাডারে এটটু কাজ কাম দিয়েন।

কাজ শুরু করে দিলাম। ঝালকাঠিতে গিয়ে সহকারী পরিচালক সাহেবকে বলাম, স্যার কিছু লো-লিফট পাম্প কিনতে চাই। বিএডিসির সাথে কথা বলেন। সহকারী পরিচালক সাহেব আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে? আমি আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম। উনি একটু উৎসাহিত হলেন আমার কথায়। হয়তো ইতিপূর্বে কেউ এভাবে উদ্যোগ নেয় নাই বলে প্রথমে অবাক হালেও পড়ে উৎসাহ দেখালেন।

ঝালকাঠি জেলার বিএডিসির সেচ অফিস থেকে লো-লিফট পাম্প কেনা হল অবশেষে। কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর অর্থ দিয়ে বীজ-সার নিয়ম মেনেই কেনা হল। স্থানীয় কিছু উদ্যোগী ব্যবসায়ীকে দিয়ে বীজ সারের দোকান খোলা হল। উচ্চফলনশীল বোরো চাষের উপযোগী এলাকা নির্বাচন করে এলাকা ভিত্তিক কৃষক দল তৈরী করা হলো। ব্লক সুপারভাইজারদের এতদিনের অলস মাথার মধ্যে কাজ কিছু ঢোকাতে পারলাম। প্রতিটি লো-লিফট পাম্পের মৌসুমী ভাড়া নির্ধারণ করে উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদন নেয়া হল। কৃষক গ্রুপকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজতলা তৈরীর কাজ শুরু করে দিলাম। যাই হাক চাষীদের মধ্যে এক ধরণের উৎসাহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। বিষখালি নদী আর খালের পাড়ে লো-লিফট পাম্প বসিয়ে সেচের ব্যবস্থা করে জমি তৈরী করা হলো। মাটিতে রাসায়নিক সারের ছোঁয়ায় ধানের চারা রোপনের কিছুদিনের মধ্যে মাঠ সবুজ হয়ে উঠল। এলাকার কৃষকরা শুধুমাত্র নয়, সর্বস্তরের মানুষ এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এতদিন তারা জমিগুলো দেখেছে বিরান মাঠ। শীতকালে যে ধান চাষ হতে পারে এটা কৃষকদের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল। সেই বর্ষা মৌসুমে কিছু ধান বীজ ছিটিয়ে সামান্য ফলন পেয়ে এসেছে। আমার অফিসের মাঠ কর্মীদের কাছেও নতুন অভিজ্ঞতা। কৃষি বিষয়ে লেখাপড়া করলেও তাদের অধিকাংশ এখন এলাকায় দীর্ঘদিন চাকুরি করায় বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। তবে তাদের মনে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম বলেই হয়তো সমস্যা হয়নি। দুই এক জায়গায় কৃষকদের আগ্রহ কম থাকায় ব্যর্থ হলেও প্রায় এলাকাতে ফসলের অবস্থা বেশ ভাল।

এরিমধ্যে চার মাস পার হয়ে গেল। কৃষকদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারছি তাদের মনের মধ্যে কি হবে, কি হবে এরকম একটা অনুভূতি কাজ করছে। অনেক মাঠ ধানের শীষ বের হবো বের হবো করছে। আমি যতটা পারছি সরেজমিনে দেখা-শোনা করছি। যত ঘুরছি ততই অবাক হচ্ছি নদীমাতৃক এই উপজেলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। বিষখালি নদী শুধু নয়, ছোট ছোট খালগুলোতও জোয়ার ভাটা

হয়। নদীতে ইলিশ মাছ ধরার দৃশ্য আমার কাছে একেবারেই নতুন বিষয়। বাজারে শুধু ইলিশ মাছ আর কিছু অদ্ভুত আকৃতির মাছ ছাড়া অন্যকিছু পাওয়া দুষ্কর। শাকসবজির বড় আকাল। গরু বা খাসির স্বাস্থ্য দেখে মাংস খেতে রুচি হয় না।

একদিন অফিসে এসে দেখি, অফিস রুমের সামনে জটলা দিয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন এগিয়ে এসে আমার কাছে জানতে চাইলো, স্যার মাসে জমিতে কি ধান চাষ করাইলেন? আমি বললাম, কেন বেশী ফলন পাবেন এরকম জাতের ধান চাষ করেছেন। ফসলের অবস্থা তো বেশ ভাল। আমার কথায় মানুষগুলোকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখলাম। পরে উপস্থিত ব্লক সুপারভাইজার আমাকে বললো, স্যার কিছু ধানের শীষ আগাম বের হয়ছে। অন্যান্য গাছগুলো থেকে আদৌ শীষ বের হবে কিনা কৃষকদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার ব্লক সুপারভাইজার কনফিউজড। সাধারণ কৃষকদের শেখাবে যে ব্লক সুপারভাইজার তারই জ্ঞানের অভাব রয়েছে। আমি কৃষকদের আস্বস্ত করে বললাম, আপনাদের ফসলের যদি কোন ক্ষতি করে থাকি তবে সবার ক্ষতিপূরণ আমি দিয়ে যাব। কথাটা বলার জন্যই বলতে হল। এত ক্ষতিপূরণের টাকা যে আমি দিতে সক্ষম না সেটা কৃষকদের সামনে প্রকাশ করলাম না। কৃষকদের বললাম, আপনারা জমিতে সেচের ব্যবস্থা ঠিক রাখবেন, এই অবস্থায় ধান গাছে পানির প্রয়োজন বেশি। আর যেসব শীষ আগাম বের হয়েছে সেগুলোকে টেনে উঠিয়ে ফেললে পরবর্তীতে বীজ সংরক্ষণ করতে পারবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি ধানের জমিতে পুষ্ট শীষ সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল। সবাই বেশ খুশি। এত লম্বা পুষ্ট শীষ তো কেউ আগে দেখে নি। বিনা সেচে শুধুমাত্র বৃষ্টির পানিতে দেশী-জাতের ধান আবাদ করেছে আগে। এলাকায় গিয়েও বুঝতে পারলাম কৃষকরা এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। কৃষকদের সাথে মেলমেশা করে একটা বিষয়ে আমি অবাক হলাম। মানুষগুলোর মধ্যে ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা বাসা বেঁধে আছে। পীর ভক্তিতে মানুষগুলো অনেক এগিয়ে আছে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে। তবে শুধু যে পীর বা ধর্মগুরুদের ভক্তি করে তা নয়। যাকে পছন্দ করে তাকেই পীর মনে করে। তবে কি কারণে জানিনা এই এলাকার মানুষদের কাছে পুলিশের খুব কদর। কথাই প্রচলিত আছে, মোরে চেন, মোর দাদায় চহিদার। অন্যান্য চাকুরির মানুষদেরও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি কদর করে। বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছি বলেই হয়তো এই তুলনা করতে পারলাম।

যাই-হোক দেখতে দেখতে সাত মাস কেটে গেল। কৃষকরা তাদের মাঠে এবারে এত বেশী ফলন পেয়েছে যে, তাদের কৃষি বিভাগের ওপর আগের চেয়ে অনেক আস্থা বেড়েছে। আমার তৃপ্তি ছিল কাজের মধ্যে। দেশে পিছিয়ে পড়া একটা উপজেলায় কৃষকদের মাঠে উচ্চফলনশীল ধানের চাষাবাদ শুরু করতে পেরে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করছিলাম। এতকিছুর পরেও ঢাকায় আমার পরিবারের কাছে মনটা বারবার ছুটে যেত।

আমার প্রচেষ্টায় অবশেষে একদিন বদলির অর্ডার হাতে পেয়ে গেলাম। খুব যে মনের মত পোষ্টিং পেলাম তা নয়। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল শৈলকূপা

উপজেলা সন্ত্রাসীদের আখড়া। সেখানকার মানুষ আত্মহত্যা করে কথায় কথায়। বিশেষ করে মেয়েরা। সারা পৃথিবী জুড়েই না-কি শৈলকূপার নাম ডাক। খুশির মধ্যেও যেন মনের ভিতর বিপদের ছায়া অনুভব করলাম। সে কথা না হয় পরে বলা যাবে। অফিসের সহকর্মীরা অনুরোধ করল শৈলকূপায় না যেতে। কিন্তু আমার পরিবারের কথা ভেবে তাদের অনুরোধকে মেনে নিতে পারলাম না।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। একদিন সকালে আমার অফিস রুমে সহকারি কমিশনারের সাথে কথা বলছিলাম। এমন সময় বিনয় হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হল। কোন ভূমিকা না করেই বললো, স্যার বাহিরে খুনাখুনি হওয়ার অবস্থা হয়েছে। আপনি পারবেন এটা ঠেকাতে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কারা খুনাখুনি করবে? কথা শেষ হতে না হতে একজন মধ্যবয়সি মানুষ আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিল, স্যার মোরে বাঁচান। আপনার বিএসরা মোরে মারার জন্য হাতে চাকু লইছে। মানুষটাকে চেনা চেনা মনে হল। মনে পড়ল কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা দলিলের ফটোকপি এনেছিল সত্যায়িত করতে। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার অফিস সহকারী এই লোকটিকে দলিলের ফটোকপি সত্যায়িত হয় না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

সহকারী কমিশনারকে বললাম, "দেখেন তো ভাই কি করা যায় এখন? সহকারি কমিশনার মানুষটিকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আট দশজন ব্লক সুপারভাইজার রুমে ঢুকে। সবাই আমার অতি চেনা। একজন নেতা গোছের হুংকার দিয়ে উঠলো, স্যাররে এই মানুষটা বেয়াদপ কইছে। মাসে সাদা জামা লাল হয়ে যাইবে। মানুষটি এবার শব্দ করে কান্নাকাটি শুরু করলো, স্যার মোরে বাঁচান। মোরে এরা মাইরা ফেলাইবে।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে বেয়াদপ বলেছেন? আর যদি বলেই থাকেন তো সবার সামনে বলতে গেলেন কেন? লোকটি কাতর কণ্ঠে জানাল, হ, কইছি স্যার। আমার মাফ কইরা দেন আপনারা। আর কোনদিন ভুল হইবে না।

আমি আমার বিএসদের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনারা একটু শান্ত হন। আমার প্রতি আপনাদের এত ভালবাসা আমার জানা ছিল না। আমার বিদায়কালে এমন কিছু করবেন না যাতে সবাই আমরা বিপদে পড়ি।

আমার কথায় যেন ওদের মধ্যে উষ্ণ আবেগের তেল ছিটা লাগলো, 'স্যার ওরে ছাইড়া দেন। ওরে মাইরা খুন কইরা ফেলামু।'

কয়েকজনের হাতে সত্যি সত্যি চাকু দেখে আমার খুব ভয় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মানুষ খুনের কেসে পড়ে চাকরি হারাতে না হয়। সহকারি কমিশনারকে অনুরোধ করলাম, "আপনি একটু সামলান। আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না কি করা যায়!" সহকারি কমিশনার সাহেব ধমকের সুরে লোকটিকে বললেন, "আপনি একজন অফিসারকে কিভাবে বেয়াদব বলেন? আমি আপনার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নিলে তো আপনার চাকরি থাকবে না।" তিনি ব্লক সুপারভাইজারদের হাতে ধারাল অস্ত্র দেখেও কিছু বললেন না। বরং তাদের পক্ষ নিয়েই কথা বললেন, "আপনাদের সাথে আমি আছি।

একজন কর্মকর্তাকে খারাপ কথা বলার শাস্তির ব্যবস্থা আমি করব। আমি এই অসভ্য লোকটির বারটা বাজাব। আপনারা দয়া করে চলে যান।" এই কথাতেই কাজ হল। ক্ষিপ্ত ব্লক সুপারভাইজাররা অফিসকক্ষ ত্যাগ করল। বিনয় বাহির থেকে যা শুনেছিল তা আমাদের কাছে বর্ণনা করলো। পশু সম্পদ কর্মকর্তার অফিস সহকারী এই লোকটি আমার কাছে জমির দলিল সত্যায়িত করতে না পেরে ক্ষুব্ধ ছিল। গতকাল উপজেলা হিসাব রক্ষন অফিসে আমি যখোন গিয়েছিলাম তখন আমাকে দেখিয়ে একজন অডিটরকে বলেছিল, উত্তরাঞ্চলের এই অফিসার বেয়াদপ, তাঁর কাজ মোটেই কইরেন না। আর এই কথা শুনেছিল সেখানে উপস্থিত একজন ব্লক সুপারভাইজার। তারপর আজকের এই ঘটনা। বিনয়ের কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমার প্রতি এত সম্মান ভালবাসা এটা আমার ধারণার বাহিরে ছিল।

এই শ্রদ্ধা ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখলাম আমার বিদায় অনুষ্ঠানের দিনে। যতটুকু সাধ্য সবকিছুর আয়োজন করেছে আমার অফিসের সহকর্মীরা। খাসি জবাই করে খাওয়া দাওয়া করালো উপজেলা পরিষদের অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিদের। বরিশাল থেকে আঞ্চলিক পরিচালক সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছে। তিনি এই আয়োজন আর উপজেলায় উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদনের সফল কাহিনী শুনে তো অবাক। প্রধান অতিথির ভাষণে বলেই ফেললেন, "আগে জানলে এই কৃষি অফিসারকে এখান থেকে বদলির সুপারিশ করতাম না।" আমি বললাম, "স্যার যদি কোনদিন জেলার দায়িত্বে আসি তবে এই দক্ষিণাঞ্চলেই আসব।"

কাঠালিয়া ছেড়ে আসার দিনে লঞ্চঘাটে সকাল সকাল উপস্থিত হলাম। সকাল দশটা নাগাদ বরগুণা থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ ঘাটে এসে ভিড়ল। অফিসের সহকর্মীরা ছাড়াও অনেক মানুষ এসেছে আমাকে বিদায় জানোত। তাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক। কিভাবে যে তারা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। লঞ্চের ওঠার আগে বেশ কিছু মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল। ওদের অনেকের চোখে পানি দেখে আমার চোখের পানি আটকাতে পারলাম না। ঘাট ছেড়ে মাঝ নদীতে লঞ্চ চলে এলে মানুষগুলোর মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেল।

আজ দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। চাকুরি জীবনও শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। অথচ কাঠালিয়ার মানুষগুলোর মুখ আর ধানক্ষেত আজও স্মৃতির পাতায় লেপটে আছে। মনের আঙিনায় প্রশান্তির বাতাস বয়ে যায় আজও। সুখ অনুভব করি যখন ভাবি এই চাকরির সুবাদে কিছু কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পথ দেখিয়েছিলাম। তাদের এমন কিছু শিখিয়েছিলাম যা তারা বংশানুক্রমে মাঠে ফসল উৎপাদনে ভবিষ্যতেও অনুসরণ করবে। হয়তো এতদিনে আরও উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া তারা পেয়েছে। তবুও শুরু তো আমিই করেছিলাম, এটাই আমার পরম সুখ। আর এই সুখের স্মৃতি আমার কাছে চিরদিন অমলিন।

ভ্রমন কাহিনী

প্রবীণদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না,
বরং তারা আমাদেরই ভবিষ্যৎ ছবি।

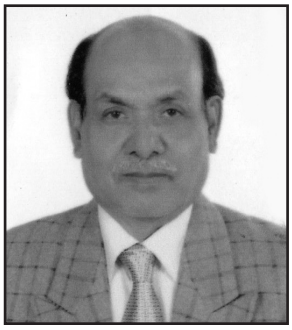

হিমালয়ের কন্যা "নেপাল"

অধ্যাপক মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
আঃ সদস্য নং- ২৩৬৯
কেন্দ্রিয় সমিতি

ফ্লাইটের সময় ছিল দুপুরে। কিন্তু আবহাওয়া ভালো না হওয়ার কারণে ঢাকা থেকে নেপালের সেই ফ্লাইট ছাড়তে ছাড়তে হয়ে যায় রাত। বিমান যখন মাঝ আকাশে তখন মাঝে মাঝেই অন্ধকারের বুক চিড়ে আলো ছড়াচ্ছিল বজ্রপাত। মাঝে মাঝে বেশ ঝাঁকুনিও দিচ্ছিল বিমান। সেটা ছিল এপ্রিল মাস।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাঠমান্ডু চলে আসলেও বিমানটি অবতরণ করতে পারছিল না। কাঠমান্ডুর উপর দিয়েই চক্কর দিচ্ছিল। কারণ সেই খারাপ আবহাওয়া। ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি আর বজ্রপাত। বেশ অনেকক্ষণ আকাশে চক্কর কাটার পর রাত সাড়ে ৯টার দিকে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমরা অবতরণ করি। আমি, আমার বউ মনজিলা বেগম, ছেলে অনিক ও বৌমা নিপা।

অনেকক্ষণ পর একটু প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিলাম। যদিও এটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, তবে সত্যি কথাটা হচ্ছে আমরা সবাই ভয় পেয়েছিলাম। বেশ ভয় পেয়েছিলাম।

বিমান বন্দরটা সুন্দর, ছিমছাম। কিন্তু খুব ছোট্ট। খুব বেশি সময় লাগল না অন অ্যারাইভাল ভিসা নিতে। সব কাজ সেরে যখন বিমান বন্দরের বাইরে আসলাম তখন রাত প্রায় ১১টা।

বিমানবন্দর থেকে হোটেলে গেলাম। হোটেলের নাম 'দা মাল্লা হোটেল। পাঁচ তারকা হোটেল বলে ভাড়া একটু বেশি। বিমানবন্দর থেকে বেশিক্ষণ লাগল না ১৫/২০মিনিট। রাতে ভালো ঘুম দিলাম।

সকালে গাড়ি এসে হাজির। নাস্তা সেরে রওনা দিলাম আমরা পোখরার উদ্দেশ্যে। কাঠমান্ডু থেকে পোখরার দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার। চাইলে কেউ বিমানেও যেতে পারে। পোখরাতে ছোট একটি বিমানবন্দর রয়েছে। কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম মাইক্রোতে রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে।

পোখরাক বলা হয় নেপালের রানী। পোখরার প্রাকৃতিক সেন্তুন্দর্য্যের শোনা তুলনাই হয় না। কাঠমান্ডু থেকে পোখরা যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ি আর আঁকাবাঁকা। মুগ্ধ হয়েদেখতে লাগলাম। কি দারুণ!

রাস্তার ধারের দোকানগুলো খুবই সাদামাটা কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। প্রাকৃতিক সৌদর্যের মাঝে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন, আর বয়ে চলেছে ঝিরঝির বাতাস। ভাবুন তো একবার কি রকম অনাবিল প্রশান্তি পাওয়া যেতে পারে!

চোখের সামনে দেখা যায় সারি সারি পাহাড়। নিচে বয়ে চলেছে নদী। নদীর উপর দিয়ে আবার ঝুলন্ত সেতু। শুধু মাত্র হেঁটে পারাপারের জন্য। স্থানীয়রা ওপাশ থেকে এপাশে আসে এই সেতু দিয়ে। আহা! কি যে সুন্দর!!

এই সব দেখতে দেখতে খাবার খেতে খেতে এক সময় পৌঁছে গেলাম নেপালের রানীর শহরে। পোখরার সমতল এলাকাটিও সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে।

আমরা যে হোটেলে উঠলাম তাঁর নাম পোখরা গ্রান্ড। এটাও পাঁচ তারকা একটি হোটেল। খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে দুপুরে হোটেলেই খাবার সেরে নিলাম। বিকালে বের হলাম ঘুরতে। পোখরার মার্কেটের দোকান গুলোর দিকে মনে হয় শুধু তাকিয়েই থাকি। পর্যটকদের মাথা ঘুরিয় দেওয়ার মতো একেকটা দোকান। সারি সারি বাহারি পণ্যের জিনিস সাজানো। কোনটা রেখে কোনটা কিনি এমন অবস্থা।

খানিকক্ষণ পরেই শুরু হল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়েছে। শুধু পানি আর পানি। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গলগল করে পানি বয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হল। উপায় নেই। সারি সারি দোকান হলেও এক দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য দোকানে যাব সেটার ব্যবস্থা নেই। বেরুলেই ভিজতে হবে। দোকানে বসে বসে ঝুম বৃষ্টির শব্দ আর বৃষ্টি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল দাদা বাড়ির কথা!

সবাই বলল ঝড় বৃষ্টিতে আকাশ পরিষ্কার হয় যাবে। বায়ুমণ্ডলের ধুলাবালি চলে যাবে। যার ফলে সকালে অন্নপূর্ণা পরিষ্কার দেখতে পাব। খুশি হয়ে গেলাম। যাকে দেখব বলে পোখরা আসা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাব এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে!

চারটার দিকে পুরো হোটেল হঠাৎ সরগরম হয়েউঠল। সবাইকে ডেকে দিচ্ছে। যার যার ভাড়া করা গাড়ি চলে এসেছে। অন্নপূর্ণার জন্য রওনা দিতে হবে। চা দিয়েগেল রুমে। চা খেয়ে ঘুম ঘুম চোখেই রেডি হলাম। সাড়ে ৪টার বাজার মধ্যেই রওনা দিয়েদিলাম। প্রচুর লোক। পুরো হোটেলের লোক একসঙ্গে বের হলে যা অবস্থা হয় আর কি! সারি সারি গাড়ি। হৈচৈ। ভিড়ের মধ্যে আমরা আমাদের ড্রাইভার বিজুকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

গাড়ির ভিড় বেশ খানিকটা ফাঁকা হওয়া পরই পেলাম বিজুকে। তুমুল উত্তেজনা নিয়ে রওনা হলাম। অন্ধকার। পাহাড়ি রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। বুকের ভেতরে ধুকপুক ধুকপুক করছে।

আমরা যাচ্ছি সারাংকোট এলাকায়। পোখরা পাহাড়ের একটি গ্রাম সারাংকোট। এখান থেকেই দেখা যাবে অন্নপূর্ণাকে। আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও অন্ধকার। এরই মধ্যে প্রচুর পর্যটক চলে এসেছে। গাড়ি আমাদের যেখানে নামিয়ে দিল সেই জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু।।

গাড়ি এর বেশি আর উপরে উঠবে না। বাকি রাস্তা আমাদের হেঁটেই যেতে হবে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। ধাপ ধাপ করা সিঁড়ি আছে। একটু পর পরই বাড়ি। বাড়ি থেকে ডাক আসছে তাদের ছাদে বসে

অন্নপূর্ণা দেখার আহবান। প্রতিটি বাড়ির সামনেই আছে চায়ের দোকান। সরগরম। অনেকেই যাচ্ছে। আমরা আরও উপরে উঠতে লাগলাম। যত উপরে উঠতে লাগলাম ভিড় একটু একটু করে কমতে লাগল। অবশেষে বেশ খানিকটা উপরে উঠে একটা বাড়ির ছাদে উঠলাম। প্যাঁচানো সিঁড়ি। চেয়ার পাতা আছে সারি সারি। কেউ চা খাবে কিনা খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। হালকা শীত পড়েছে। ছাদে উঠে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের গ্লাস হাতে জড়িয়ে বসে পড়লাম।

আহ! জীবন অনেক সুন্দর। সত্যি সুন্দর!

ধীরে ধীরে ফরসা হতে লাগল চারপাশ। সূর্য বাবাজি তখনও উঁকি দেয়নি। তখনও অনেক মানুষ আসছে। বসছে। উঠছে। আসলে ঠিক কোন দিকে যে তাকাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনটা যে অন্নপূর্ণা কিছুই তো দেখা যাচ্ছিল না। শুধু অন্ধকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফর্সা হতে থাকল চারপাশ। এই সময়টুকুতে সব কিছু এত দ্রুত ঘটে যায়! পুবের আকাশ লাল হতে লাগল ধীরে ধীরে। কালো কালো অবয়ব গুলো ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

সূর্যের প্রথম আভাটা যখন অন্নপূর্ণায় পড়ল মনে হচ্ছিল যেন একটা সোনার খনি। সাদা পাহাড়ে যখন আলো পড়ল ধোঁয়া উঠতে থাকল। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। উফ কি অসহ্য রকমের সুন্দর! প্রকৃতির কি লীলা! অপূর্ব।

বরফ ঢাকা শ্বেত শুভ্র শরীরে সূর্যের আলোয় সোনালি আভা দেখে দুচোখ বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে। করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে সবাই। আমি তো শুধু হা করেই দেখছিলাম। স্থানীয় একজন জানাল, সামনে যে পিরামিড আকৃতির পর্বত দেখা যাচ্ছে সেটা অন্নপূর্ণা-১ । আর একটু পর 'মৎসপুচ্ছ'ও দেখা যাবে। হা করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছবি তোলার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বেশি তুলতে পারলাম না। মনে হল ছবি তোলার দিকে মন যোগ বেশি চলে যাচ্ছে। এই সৌন্দর্য ঠিক মতো উপভোগ করতেই পারছি না। বাদ দিলাম ছবি তোলা।

সূর্যোদয় তো আমরা কতই দেখি। তবে এই সূর্যোদয়ের যেন কোন তুলনাই নেই! একে দেখার জন্য মানুষের ভিড়, কোলাহল কি নেই? এর সৌন্দর্য লিখে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সত্যি চাই। সুনীলের সেই কবিতার মতো। আর সেই পাহাড় হবে এইটা, যেটাকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে আলোকিত হয়গেল চারপাশ। সুন্দর মিষ্টি রোদ গায় পড়তে লাগল। শীতের মধ্যে খুব ভালো লাগতে লাগল কেনো জানি। এখনও যখন অন্নপূর্ণা দেখার কথা ভাবি এক ধরনের আনন্দ হয় মনে। বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই ধীরে ধীরে নামতে শুরু করতে লাগল। বসার জন্য ভাড়া চায়ের বিল মিটিয়ে আমরাও নামতে লাগলাম। নিচে ছোট ছোট স্যভিনিয়রের দোকান সাজিয়ে বসেছে স্থনীয়রা। সেখানে আছে হরেক রকমের জিনিস। সবথেকে ভালো লাগল ওদের হাতে বোনা কাপড়। খুব সুন্দর। অন্নপূর্ণা

মানে অন্নদাত্রী বা অন্নের দেবী। এক সময় এই পর্বতকে শষ্য ভান্ডারে দেবী মনে করা হত। তাই তাকে এই নামে ডাকা হয়।

সারাংকোট এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। লালমাটির দোতলা, দেড় চালা বাড়িই বেশি। বাড়ির সামনে আছে পাথর দেওয়া ছোট ছোট দেয়াল। ইটের ঘর চোখে পড়ল অল্প কয়েকটা। প্রতিটা বাড়ির সামনে ছোট ছোট গাছ। আমাদের পাহাড়ের নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে একটা নদী। দেখা যাচ্ছে মানুষের বসতি। রাতে এখান থেকেই মিটিমিটি আলো জ্বলতে দেখেছিলাম। দূর থেকেই অন্নপূর্ণাকে দেখতে হল। যারা অন্নপূর্ণার জয় করতে যায় তাদের শুভকামনা জানালাম মনে মনেই।

ঘোরাঘুরি শেষে ফিরতে লাগলাম। ড্রাইভার বিজু জানাল এই গ্রামেই তাঁর বাড়ি। আর পরিবার থাকে এখানেই। পাহাড় থেকে নামতে নামতে হাতের ইশারায় দেখিয়েও দিল তাঁর বাড়ি। তাঁর বাড়িতে যেতে অনুরোধও করল। আহা কত মায়া ওদের। এই বিজুকেই খুশি হয়ে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে চেয়েছিলাম আমরা। নিল না। বরং খুব আহত চোখে তাকিয়ে থাকল।

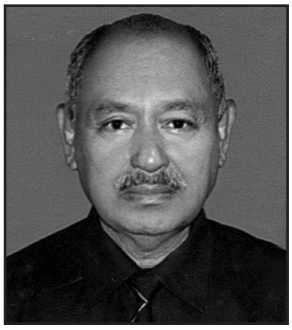

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

নির্মল কুমার বর্মণ
সদস্য, লালমনিরহাট
জেলা সমিতি

ভ্রমণের প্রতি অনেকের মত আমার আগ্রহ প্রচুর। কিন্তু সময় সুযোগ এবং অর্থের টানাটানি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও সকল বাধা পেরিয়ে অতীতের মতো এবারে ভারতে বেড়ানোর ভিসা করে নিলাম। ২০১৭ সালের জুন মাসে। ভিসা পাবার পর ভাবছি- কখন কোথায় কিভাবে ভ্রমণ শুরু করব। আলোচনা করছি- প্রস্তাব রাখছি। আবার পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছু। শেষমেষ আমার সহধর্মনীর উপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়ে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি রওয়ানা হব। আমার স্ত্রী সাধনা রায় জলপাইগুড়িতে বসবাসরত আমার বন্ধুবর কুমারেশ দত্তের সাথে Whatsapp-এ দীর্ঘ আলাপ-সালাপে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ চুড়ান্ত হল। একমাত্র পুত্র সন্তান তীর্থ রামজৌ ফিল্ম সিটি, মাইশোর, ওটি, ভ্রমণ সঙ্গী হবে জন্য সুচী সেভাবেই করা হলো। সে অনুসারে ভ্রমণের তিনমাস আগেই রেল টিকেট কাটা হয়ে গেলো। সিনিয়র সিটিজেন সুবিধা পাওয়া গেল। আমরা বাংলাদেশ ছাড়লাম ১৮ অক্টোবর ২০১৭।

১. হায়দ্রাবাদ

১৯ অক্টোবর নিউ জলপাইগুড়ি রেল জংশনে বিকাল ৩টায় গৌহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেনে চেপে বসলাম। ২১ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় সেকেন্দ্রাবাদ জংশনে পৌছে স্বল্পদূরে পুরাতন জেলখানা রোড On Green হোটেলে উঠলাম। হোটেল ভাড়া ১৪৫০/- টাকা। চেক আউট সময় ২৪ ঘন্টা। দ্রুত গোসল-নাস্তা Royal Travels Hydrabad Daily City Tour Bus -এ সকাল ৮টায় উঠলাম। গাইড রসিদ খান।

হোসেন সাগর লেক পেরিয়ে মুশি নদীর পাড়ে গভঃ সিটি কলেজ, ওসমানি হাসপাতাল আফজাল গঞ্জ, চার মিনার, জামিয়া মসজিদ, আবিদস চন্দন নগর, ডায়মন্ড জুবিলি স্কুল, চিরাগ আলী লেন, কারিমাদবাদ কো-অপ হাউজিং, জহরলাল নেহেরু একুইরিয়ম, পলিটেকনিক জহরদার টাওয়ার, রুটি বাউলি গাদার বে, সালার জং মিউজিয়াম, সুধা কার মিউজিয়াম, NTR গার্ডেন, গোলকুন্ডা ফোর্ট, নবাব নিজাম আলী খান নির্মিত চৌমহলা প্রাসাদ- প্রবেশ ফী ২৫ টাকা, বিদেশীদের জন্য ১৫০ টাকা, থ্রি-ডি দেখে রাতে ফেরা। রাত ১০টায় তীর্থ ঢাকা দমদম-হায়দ্রাবাদ উড়ে এসে ট্যাক্সি হোটেলে এল।

চার মিনারের পশ্চিম দিকে লাদ বাজার কেনাকাটার বড় বাজার। মহিলাদের বোরখা, পোষাক,

বিবাহের সামগ্রী প্রচুর পাওয়া যায়। সালারজং মিউজিয়াম শহরের মুশি নদীর অপরপারে অবস্থিত। সুলতান মির ইউসুফ আলী খান পৃথিবীর কাছে সালারজং নামে খ্যাত। তিনি তাঁর সম্পদ, আর্ট, শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। হোসেন সাগর লেক এর প্রায় মাঝখানে লর্ড বুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ জ্বলজ্বল করছে। ১৬ মিটার উচু, ৩৫০ টন ওজন পাথরের মূর্তি। এটা এশিয়ার সর্ববৃহৎ মূর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গোলকুন্ডা ফোর্ট- গোলা মানে Shepherd এবং কোন্ডা মানে পাহাড়। গোলকুন্ডা-কে সুলতান কুলি কুতুব শাহ রাজত্বের রাজধানী হিসেবে চালু করেন। তিনি ফোর্টের মসজিদে নামাযরত অবস্থায় নিহত হন। ফোর্টটির বাইরের দেয়াল প্রায় ১১ কি.মি লম্বা। হিরাজহরত, কোহিনুর অলংকারী এখান থেকে উৎপত্তি ও সরবরাহ হতো বলে কথিত আছে।

অন্ধ্রের রাজধানী হায়দ্রাবাদ। সেকেন্দ্রাবাদ টুইন সিটি। মাসেল ও উপনিবেশিক শাসন আমলের স্থাপত্যের নিদর্শনের শহর। হায়দ্রাবাদ ভারতের ৫ম বৃহত্তম নগরী। হায়দ্রাবাদের উত্তরে সেকেন্দ্রাবাদ শহরটি গড়ে উঠেছে। হোসেন সাগর লেকের পাড়ে। হাইটেক সিটি হিসাবে গড়ে উঠছে ক্রমাগত।

সুলতান মাহমুদ কুলি কুতুব শাহ্ রাজত্বের পর বাদশা নিজাম যিনি আসফ জাহি রাজা নামে পরিচিত হন। ১৯৪৮ সালে নিজাম রাজত্বের প্রদেশ হিসাবে হায়দ্রাবাদ স্বীকৃত হয় এবং ১৯৫৬ সালে অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হিসাবে হায়দ্রাবাদ স্বীকৃতি লাভ করে। কথিত আছে শহর নির্মাণের পর সুলতান মোঃ কুলি স্থানীয় বানজারা বালিকা-ভাগমতির প্রেমে পড়েন এবং শহরের নাম করণ করেন ভাগ্যনগর। ভাগমতির ধর্মান্তরের পর তাঁর নামকরণ হয় হায়দার মহল। সর্বশেষে এ শহরের নাম হয় হায়দ্রাবাদ।

২. রামোজী ফিল্ম সিটি

২২ অক্টোবর রবিবার একটি ট্যাক্সি ১৩০০/- টাকায় Reserve করে হোটেল থেকে প্রায় ৬০ কি.মি. দূরে রামোজী ফিল্ম সিটি-তে গেলাম সকাল ১০ টায়। প্রতিজন প্রবেশ ফী ১২৫০/- টাকা। ফিল্ম তৈরীর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সরঞ্জাম, দৃশ্যাবলি, বাগান, হলরুম, পাহাড়-পর্বত, খাদ্য, দোকান-পাট কি নেই সেখানে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, এটি এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফিল্ম জগত। ১৫০০ একর পর্বত ঘেরা এ জগৎ। পরিবার পরিজন নিয়ে সারাদিন ঘুরে দেখে শুনে শেষ করা যেন যাবে না। একস্থান থেকে অন্য স্পটে যেতে কর্তৃপক্ষের বাসে হরহামেশাই চলাচলের সুবিধা পাওয়া যায়। শুধু হেঁটে সব স্পট দেখা কোনামেতেই সম্ভবপর নয়। পুরো এলাকা জটিল ও রহস্যজনক মনে হয়। 'বাহুবলি' সিনেমা কাস্টিং দর্শকগণের আমেজে সরগরম সারাদিন। বিকেল বেলাটা Eureka, Movie Magic, Dome Theatre দেখে দেখে যেন প্রাণ জুড়ায়। Live সংগীত, Live অভিনয় আর Film তৈরীর কলাকৌশল হাতে শেখানো দৃশ্য দেখে দেখে সন্ধ্যের ঘনঘটা। কিন্তু মন সায় না দিলেও ঐ Taxi তে এলাম উত্তর কাচেগুডা রেলস্টেশনে। রাত ৮ টার ট্রেন ধরে ব্যাংগালোর যাত্রা।

৩. ব্যাংগালোর

২৩ অক্টোবর Yeswantpur পৌঁছলাম, সকাল ১১ঃ৩০ মিনিটে। Taxi নিয় জহরলাল নেহেরু স্ট্রিট, মন্ত্রীমল, সেসাদীপুরামে হোটেল গোপী রিজেন্সি-তে উঠলাম দুপুর ০১ঃ৩০ মিনিটে। হোটেল

ভাড়া ৮০০ টাকা, চেকআউট ২৪ ঘন্টা। বিকেলে মেট্রো রেলে মন্ত্রীমল থেকে মহালক্ষমী স্ট্রিট নেমে কিউ আর রেলিং ধরে পাহাড়ের উচুতে ইস্কন মন্দির দর্শন করা হলো। বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের পক্ষে এভাবে মন্দির দর্শন সম্ভবপর নয়। হোটেলে ফেরা রাত ০৯ঃ০০ টায়।

৪. মাই শোর

২৪ অক্টোবর ভোর ৫ টায় উঠে Majesty Bus Stop থেকে Satelite Bus Stop -এ সকাল ০৬ঃ৩০ টায় বাস ধরে সকাল ১০ঃ০০ টায় মহিশূর পৌছলাম। বাসভাড়া প্রতিজন ১২৫ টাকা। হোটেলে উঠলাম HBR International Near Suburb Stand। দ্রুতই প্রস্তুত হয়ে সিটি টুর প্রত্যেকে ১৫০ টাকার বিনিময় চামুন্ডা মন্দির, মহিশুর প্যালেস, সেন্ট জোসেফ চার্চ, টিপু সুলতান মসজিদ, সমাধি, ওয়াটার গেট, রাজমহল, ১২০০ বছরের পুরোনা রাজনাথ মন্দির, বৃন্দাবন বাগান, ড্যাম, জলপ্রপাত দেখে রাত সাড়ে নয়টায় হোটেলে ফেরা।

৫. উটি

২৫ অক্টোবর সকাল ৭টায় মহিশূর থেকে উটি পথে রওনা হলাম। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা বাসে লাগেজ নিয়ে সিটে ভালোভাবে বসতে হয়। উচুনিচু, ডানে বামে লক্ষ্য রেখে সাবধান থাকতে হয়। ঘন্টাখানেক সমতল রাস্তা পেরুবার পর পাহাড়ী রাস্তায় টাইগার জোন, এলিফেন্ট জোন দেখে সাবধানে বাস চলে। হরহামেশাই হরিণ, বানর, ময়ূরের দেখা মেলে। ঘুরোনা-প্যাচানো, উচুনিচু পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে পথচলা প্রায় ৫ ঘন্টা। এ পথচলা বাসে দার্জিলিং যাত্রাকে হার মানিয়ে দেয়।

উটি পৌঁছলাম লোয়ার বাজারের অপ্সরা হোটেলে দুপুর ০১.০০ টায়। হোটেলে উঠে দ্রুত বেড়িয়ে Udagamandalam (Ooty) স্টেশনে বিকেল ২টায় টয় ট্রেন ধরে Connor স্টেশন গেলাম। সেখানে ট্যাক্সি ৭০০ টাকায় ভাড়া করে Sims Park (Boating), Tea Factory সাইট সিন করলাম। পরে বাসে করে উটিতে হোটেলে রাত ৮টায় ফিরলাম। পরদিন ২৬ অক্টোবর সকালেই হোটেল বদলিয়ে একই এলাকায় হোটেল ডি বি প্যারাডাইসে উঠলাম। হোটেল ভাড়া ১১০০ টাকা, চেক আউট দুপুর ১২.০০টা। এরপর সিটি টুর বাসে চেপে বসলাম। প্রতিজন ২২৫ টাকা। পাইন ট্রি, ফরেস্ট বোটিং, পাই ক্যারা ড্যাম, লেক, জলপ্রপাত, বোট হাউজ, জয়ললিতা স্মৃতি বিজড়িত রোজ গার্ডেন, ইউকেলিপ্টাস পাতা হতে ঔষধী তেল, সমবায় বিপনী বিতান রোদ-বৃষ্টি, ঠান্ডার মধ্যে দেখে হোটেলে ফেরা। ভ্রমণের গাইড মোঃ রফি জানালো It is the reality of Ooty about the sun rain hot cold. Nobody can predict Ooty. উটির কোনা হোটেলে সিলিং ফ্যান দেখা যাবে না।

তীর্থকে রাত ১০ঃ৩০ সময় ৭৫০ টাকা ভাড়ায় ব্যাঙ্গালুরুর বাসে বিদায় দিলাম। আগামীকাল সকাল ৯টায় ব্যাঙ্গালুরু থেকে আকাশপথে ঢাকা ফিরবে রাত ৮টায়। রাতে বেশ ঠান্ডাই অনুভূত হচ্ছিল।

6, Ernakulam

২৭ অক্টোবর সকাল ৭টায় বেড়িয়ে উটি বাস স্টপে তামিলনাড়ুর কোয়েমবাটুর দুপুর ১টায় পৌঁছলাম। ভাড়া প্রতিজন ১৬২ টাকা। টিপ টিপ বৃষ্টি হলো। পথে ওয়েলংটন কোন্নুর পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় গাছ পড়লে জ্যামে পরলাম। অবশ্য ঘন্টাখানেকের মধ্যে পুনরায় গাড়ি চলল। সুপারি বাগান, নারিকেল বাগান চোখে পড়েছে। ৭০ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ৬০ কিলোমিটারই পাহাড়ি দুর্গম রাস্তা। তবে সম্পূর্ণ মসৃণ। গাড়ি সুষ্ঠুভাবে চলছিল। কোয়েম্বাটোরের বাস স্টপ থেকে পুনরায় কোচিন বাস স্টপ ৫ কিলোমিটার যেতে অটো ১৫০ টাকা ভাড়া লাগলো। বাসে উঠার জন্য টোকেন ১০ টাকা প্রতিজন। টোকেন নিয়ে বাসে উঠতে হলো। বাস বিকাল ২টায় ছাড়ার পর প্রতিজন ১৬০ টাকা ভাড়া দিয়ে কৈরালার Thrissur হয়ে লাক্ষাদ্বীপ সাগরতীরের শহর এরনাকুলাম পৌছলাম রাত ৮টায় এবং অটো দিয়ে Kosseri Lane Vytila Thammanam Road Zn এর কার্তিকা হোটেলে উঠলাম। ভাড়া ১২০০ টাকা। চেকআউট ২৪ ঘন্টা।

7. Thiruvanthapuram

২৮ অক্টোবর সকালে বেড়িয়ে Ernakulam আর Kochi এর দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য ট্যাক্সি রিজার্ভ করলাম ৮০০ টাকায়। Mattanchery Palace Museum- প্রবেশ ফী ৫ টাকা। ভাস্কো-দা-গামা চার্চ, কোচি পোর্ট ও এয়ারবেজ সমুদ্রবন্দর, জাহাজ, সুবাস বোস পার্ক, মেরিন ড্রাইভ দেখে হোটেলে ফেরা হল দুপুর ১টায়।

বিকাল ০২ঃ৪৫ মিনিটে হোটেল ছেড়ে দিয়ে অটোতে ১ কিলোমিটার দূরে হাব্বা বাসস্টপে এসে সাড়ে তিনটায় বাস ধরে করোলার রাজধানী Thiruvanthapuram পৌছলাম রাত ১০ঃ৪৫ মিনিটে। ভাড়া ১৬৭ টাকা প্রতিজন। পথে লাক্ষাদ্বীপ সাগর, আরব সাগর তীরের শহর Alappuzha Kallam অটো নিয়ে Thampanur এলাকার রাজারাম ট্যুরিস্ট লজে উঠলাম। ভাড়া ১,০০০ টাকা। চেকআউট ২৪ ঘন্টা।

৮. কন্যাকুমারী

২৯ অক্টোবর হোটেলে রেস্ট নিয়ে বিকাল ২টায় রওনা দিয়ে স্টেশনে ট্রেন দেরী দেখে পাশেই বাসস্টপে কন্যাকুমারীর বাস ধরলাম। পথে Amaravila, Malamanak, নুরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, টাখুলে হয়ে নাগরকয়েল পৌছলাম সন্ধ্যা ৬টায়। নাগরকয়েলে আমার সহযাত্রী বন্ধু কুমারেশ দত্ত বাস ফেল করল। গাড়ী চালক ও কন্ট্রাক্টরকে বললেও ওরা বাস থামাল না। ৪৫ মিনিট পর পরের বাসে বন্ধুটি কন্যাকুমারীতে এলো- সন্ধ্যা ৭টায়। ভারত সাগরতীরে হোটেল সানরাইজে উঠলাম। ভাড়া ৪০০ টাকা। চেকআউট বিকাল ৫টা।

৯, মাদূরাই

৩০ অক্টোবর সকাল ০৮ঃ৩০ টায় লাইনে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ রক এবং মন্দির দেখার জন্য ১৮০ সিটের ছোট স্টিমারে ১০-১২ মিনিটে পার হয়ে রকে উঠার জন্য প্রতিজন ৪০ টাকার টিকিট নিতে হলো। রকে পৌঁছে পুনরায় মন্দির দেখার জন্য ২০ টাকা টিকিট নিতে হলো। স্বপ্নদূরে অন্য রকে পাথরের তৈরী ১৩৩ ফিট উচ্চ স্মৃতি স্তম্ভ তামিল বিখ্যাত কবি থিরুভালাতার স্থাপনের কর্মযজ্ঞ ২০০০ সাল থেকে চলছে। তিনি তামিল বেদ লেখক নামে খ্যাতি অর্জন করেন। হোটেলে ফিরলাম। ১১ টায়।

কন্যাকুমারী ভারত ভূমিস্থলে সর্বদক্ষিণের শেষপ্রান্ত সীমায় অবস্থিত। কন্যাকুমারী হল আরবসাগর ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের এই তিন মহাসমুদ্রের সঙ্গমস্থল। এটি জনপ্রিয় তীর্থস্থানও বটে। তিন সমুদ্রের সম্মিলনের কারণে অবগাহনে অতিশয় পুণ্য বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। কন্যাকুমারী একমাত্র স্থান যেখান থেকে পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় এমন জায়গা থেকে একসঙ্গে সূর্যাস্থ চন্দ্রদোয়ের অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। কথিত আছে, শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য দেবী পরাশক্তি কুমারী রূপে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলে তিনি চিরকাল কুমারী কন্যারূপে থাকার সংকল্প করেন। সেই থেকে স্থানটির নাম কন্যাকুমারী।

তীরভূমি থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে সমুদ্রের বুকে এক প্রস্তরময় দ্বীপে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এই ভাবগম্ভীর স্মৃতিসৌধ। ভারতীয় ধর্মের বিজয়াভিযানে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি কন্যাকুমারীতে আসেন ১৮৯২ সালে। এই যুগলদ্বীপের একটিতে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। ১৯৭০ সালে স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করা হয়। ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এটি। বিবেকানন্দ রক বেলুরের শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরের স্থাপত্যের অনুরূপ। প্রবেশ পথটিও অজন্তা ইলোরা মন্দিরের শৈলী অনুসরণ করা হয়।

কন্যাকুমারী পুলিশবক্সের সামনে থেকে দুপুর ১টায় বাস ধরে নাগরকয়েল এলাম। ১০০ টাকা অটো ভাড়া করে স্টেশনে এসে ০৫ঃ৩০ মিনিটে ট্রেন ধরে মাদূরাই রওনা হলাম। ট্রেন ভাড়া প্রতিজন পুরুষ ৬৫ টাকা, মহিলা ৬০ টাকা। মাদুরাইতে রাত ১০টায় পৌছে অটো ভাড়া করে টাউনহল রোডের অশোকা হোটেলে উঠলাম। ভাড়া ডাবল ৭০০ টাকা। চেকআউট ২৪ ঘন্টা।

১০. রোমশ্বরাম

৩১ অক্টোবর রোমশ্বরাম দেখতে ট্যুরিস্ট গাড়ীতে উঠলাম সকাল ৭ টায়। ভাড়া প্রতিজন ৪০০ টাকা। ড্রাইভার + হেল্পার + Guide যথাক্রমে ২০ + ২০ + ৪০ = ৮০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হলো। প্রায় ২০০ কি.মি. সড়ক মাদুরাই- রোমশ্বরাম। রোমশ্বরাম একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এটি ৩ কি.মি, ইন্দিরাগান্ধী সড়ক ব্রীজ, পামবন রেল ব্রীজ দিয়ে সংযুক্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলনস্থল। বলা হয় ভারতবর্ষ প্রধান চারটি ধামে যাত্রা ব্যতীত জীবনযাত্রার পূর্ণতা পায়না। উত্তরে বদরিনাথ, পশ্চিমে দারকা, পূর্বে পুরী ও দক্ষিণে রোমশ্বরাম। রোমশ্বরাম থেকে শ্রীলংকার দূরত্ব সমুদ্রপথে মাত্র

৪০ কি.মি।

কথিত আছে, শ্রীরাম কর্তৃক স্থাপিত জোতির্লিঙ্গের কারণে এর নাম রোমশ্বরাম হয়েছে। আরোও কথিত আছে ভগবান শ্রী রোমশ্বরোমর পূজার্চনার আগে ও পরে স্নান করতে হয়। রোমশ্বরাম মন্দিরের ভেতর বাইশ কুন্ড, তীর্থ ও মন্দির, মন্দিরের বাইরে একত্রিশ তীর্থস্থান অবস্থিত। মহালক্ষী তীর্থ, সাবিত্রী তীর্থ, সেতুমাধব তীর্থ, সরস্বতী তীর্থ, গায়ত্রী তীর্থ, গন্ধমাধবন তীর্থ ইত্যাদি। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের প্রতিটিতে গিয়ে কুন্ডের জল মাথায় ছিটিয়ে স্নানের স্বাদ নেয়া। মন্দির প্রধানত সকাল ৪টা-দুপুর ১টা এবং বিকাল ৩টা-রাত ৯টা পর্যন্ত ভক্তগণের জন্য খোলা থাকে।

রামেশ্বরাম দেখে ফেরার পথে এ.পি.জে আব্দুল কালাম সমাধিক্ষেত্র দেখে রাত ৯ টায় হোটেলে ফিরে অটো নিয়ে প্রায় ১০ কি.মি এসে Mattuthavani বাসস্ট্যান্ড থেকে চেন্নাই রওনা হলাম। ভাড়া ৫৫০ টাকা প্রতিজন। বাস ছাড়ল রাত ১১টা নাগাদ- শ্রী রাম ট্রাভেলস।

১১. চেন্নাই

১ নভেম্বর চেন্নাইতে সকাল সাড়ে সাতটায় পৌছলাম সেকুন্ডু বাসস্টপে। অটো নিয়ে হোটেল তামিল রেসিডেন্সি-জহরলাল নেহেরু রোড, ওরুন বাকমে উঠলাম। ভাড়া ১৩০০ টাকা। চেকআউট ২৪ ঘন্টা। সারাটাদিন টিপ টিপ বৃষ্টি। হেঁটে হেঁটে বিরাটকায় চেন্নাই বাস টার্মিনাল দেখলাম।

পরদিন সকালেই অটো নিয়ট্রিপলিকেন হাইওয়ে রোড হোয়াইট হাউজ রেসিডেন্সি হোটেলে উঠলাম। উঠে বের হলাম সমুদ্র সৈকত মেরিনা বীচ, আন্না স্কয়ার, জয় ললিতা সমাধি, এম.জি.আর মেমোরিয়াল, এপোলো, শঙ্কর নেত্রানালয়, বীরলা পানেটরিয়াম দেখে হোটেলে ফেরা বিকেলেই।

বিকাল ৪টায় মুষলধারে বৃষ্টি হলো প্রায় ২ ঘন্টা। রাস্তা প্রায় ৩ ফুট জলের নিচে চলে গেল। এর মধ্যে গাড়ি, অটো চলছে তো চলছেই। সকাল হতেই রাজপথ জলশূন্য হয়ে গেল।

৩ নভেম্বর সকালে সিটি দেখবো। ঘুরলাম-ফিরলাম। হোটেলে সকাল ১১ টায় আকস্মিকভাবে বন্ধুবর দত্ত জানালো আমাদের ট্রেন রিজারভেশন রাত ৮টায় নয়, বরং সকাল ৮টায়। ট্রেন মিস হয়ে গেছে। পরে ঐ হোটেলে আই.আর.সি.টি.সি.এস এর রিজারভেশন কাটা হলো। সিনিয়র সিটিজেন সুবিধা পাওয়া গেলো না। উপরন্ত ২২০০ টাকা বেশি দিতে হলো। ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস এসিতে ৩,৩০০ টাকার ট্রেন টিকেট ৫,৫০০ টাকায় কেটে চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছলাম বিকাল ৫টায়। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ট্রেন যথা সময় রাত ৯টায় ছাড়ল খোরদা রোড। চেন্নাই থেকে খোরদা রোড, দূরত্ব ১২০৪ কি.মি।

১২. পুরী

৪ নভেম্বর বিকাল ৫ টায় খুরদা রোড জংশনে নেমে সাথে সাথে একটি লোকাল ট্রেন পেয়ে পুরী পৌঁছলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায়। অটো নিয়ে সাগরতীর চক্রতীর্থ রোডে Hotel Sea Fresh এ

উঠলাম। ভাড়া ১১০০ টাকা। চেক আউট সকাল ৮টা।

রাতেই জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শনে গেলাম। মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে কিউ আর ঘুরানো পেচানো রেলিং ধরে মন্দির প্রাঙ্গণ পৌঁছলাম, কিন্তু ভীড়ের কারণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। পান্ডার মাধ্যমে প্রসাদ পেলাম মাত্র। কথিত আছে, গঙ্গা হতে গদাবরী পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের ১২ বছরের রাজস্ব ব্যয়ে ১২০০ শতাব্দীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরের উচ্চতা ২১৪ ফিট, আকার পঞ্চরথের মতো।

পরদিন ভোরে উঠে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের জলে স্নান সারলাম। ভাটার টানে সমুদ্র বক্ষে হারিয়ে যাবার ভয় তো সকলেরই হয়। বালু আর লবণ জলে কাপড়-চোপর, শরীর ভিজে গেল। হোটেলে এসে রেডি হয়ে গাইডেড ট্যুরে বাস ধরলাম। প্রতিজন ভাড়া ১৮০ টাকা এবং স্থান দর্শনের জন্য চিড়িয়াখানা ৪০ টাকা, কো নার্ক সূর্য মন্দির ৩০ টাকা, গাইডের নাম দেব মহাপাত্র। সাগর তীরের চন্দ্রভাগা লাইট হাউজ, কোনার্ক সূর্য মন্দির, উদয় গিরী, ধবল গিরী, নন্দন কানন, চিড়িয়াখানা দেখা হলো।

ভ্রমণপথে ভগবতী নদী, কুর্শাভদ্র নদীর উপর নির্মিত ব্রীজ পেরুতে হলো। নদী দু'টি বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। গোল্ডেন বীচ দেখা হলো। কোনার্ক সূর্য মন্দির পুরী থেকে চলিশ কিলোমিটার- পনের শত বছরের পুরোনো, রথযাত্রার আদলে তৈরী তিন দুয়ার সিংহ, হাতি, অশ্ব। কথিত আছে, এই মন্দির তৈরীতে বারো হাজার শ্রমিক বারো বছরে দিনরাত পরিশ্রম করে বারো বছরের রাজস্ব ব্যয় করে তৈরী করা হয়। ধবলগিরী বুদ্ধ মন্দির, হাতিশালা উদয়গিরী দেখা হয় কিন্তু জৈন ধর্মের খন্ডগিরী আর দেখা হয় নাই। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর শহর ঢুকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের নন্দন কানন চিড়িয়াখানা দেখা হলো। এটি এশিয়ার বৃহত্তম চিড়িয়াখানা। পঞ্চাশ একর জায়গার মধ্যে ২৫টি সিংহ থাকা, সাদা বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র, বিভিন্ন পশু-পক্ষি, জীব-জন্তু দেখা হলো।

১৩, হাওড়া

৬ নভেম্বর সকালে হোটেল থেকে হেঁটেই প্রায় ৫০০ গজ দূরত্বে পুরী স্টেশনে এসে পূর্বেই কাটা রেল টিকিটে এসি চেয়ার কার ধরে হাওড়া রওনা হলাম। ট্রেনেই বেড টি থেকে লাঞ্চ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেল। হাওড়া পৌঁছলাম দুপুর ২ টায়। ভাগিরথি নদীর উপর নির্মিত হাওড়া ব্রীজ হেঁটে-বেড়িয়ে এলাম। ব্রীজের পাদদেশে বাসস্টপ আর কাঁচা-পাকা বাজারে ঢুকে দরদাম জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর অপেক্ষা শেষে বিকাল ৫টায় কামরূপ এক্সপ্রেস ধরে জলপাইগুড়ি রোড রওনা হলাম।

১৪. জলপাইগুড়ি

৭ নভেম্বর সকাল ৭টায় জলপাইগুড়ি রোড পৌঁছলাম। বন্ধুর গাড়িতে চড়ে তাঁর বাড়িতে রাজবাড়ি পাড়ার বাড়িতে পৌঁছলাম সকাল ০৭ঃ৩০ টায়। আর তারপর দ্রুত দেশে ফেরার চিন্তায় বাঁধ সাধল কৌশিক ও দেবা আর বৌমা, সাথে বন্ধু পত্নিও বটে। তবে শেষমেষ দেশে ফেরা হলো ৯ নভেম্বর, ২০১৭।

সিঙ্গাপুরে এক চক্কর

প্রফেসর খোন্দকার ইনামুল কবীর
সদস্য, যশোর সমিতি, আ-২৪১

আগেই জেনেছিলাম, ঢাকা-সিঙ্গাপুর ৪ ঘন্টার আকাশ চারণ। ১৭ মে ২০১৭। হযরত শাহজালাল থেকে Regent Airways যখন উড়াল দিল, হাতঘড়ি নির্দেশ করলো 11-45 AM. প্রায় কাঁটায় কাঁটায় ৪ ঘন্টা আকাশ চারণের পর 'চাঙ্গে' বিমান বন্দরে অবতরণের পর ঘড়িতে দেখি 15-40 PM. অর্থাৎ ৫ মিনিট আগেই পৌঁছেছি। ও সময় সিঙ্গাপুরের প্রমাণ সময় বিকেল ১৭-৪০। বাংলাদেশ থেকে ২ ঘন্টা বেশি ; দ্রাঘিমা হিসেবে 30° পূর্ব (বাস্তবে নয়)। বিমানে পাড়ি দিয়েছ 1600 মাইল। ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পূব-দক্ষিণ হয় বার্মা ও শ্যাম ছুয়মাত্তাবান উপসাগর পাড়ি দিয়ে মালাক্কা প্রণালী ডাইনে রেখে মালয়েশিয়ার দক্ষিণের Tip স্বপ্নের দেশ সিঙ্গাপুর যার পশ্চিমে ভারত মহাসাগর আর পূর্বে প্রশান্তর সহাসাগরের দক্ষিণ চীন সাগর। প্রধান দ্বীপ সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে প্রায় ৬০টি ছোট ছোট দ্বীপ (hgb Kusu Island, Pulau Ubin প্রভৃতি) যার বেশ কিছু মনুষ্য সৃষ্ট। সিঙ্গাপুরের উত্তরে ১ কিঃমিঃ চওড়া জোহর প্রণালী আর দক্ষিণে সিঙ্গাপুর প্রণালী দ্বারা ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথকীকৃত। সিঙ্গাপুরের অবস্থান 10°9 উত্তর থেকে ১২৯ উত্তর থেকে 103°36 পূর্ব থেকে 104°25 (ঢাকার অবস্থান 90° পূর্ব দ্রাঘিমা)।

সিঙ্গাপুরের বর্তমান আয়তন প্রায় ৭১৮.৩ বর্গ কিঃমিঃ। ১৯৬০ সালে ছিল ৫৮১ বর্গ কিঃমিঃ যা ২০৩০ নাগাদ ৭৩৩ বর্গ কিঃমিঃ এ উন্নীত করার প্রকল্প রয়েছে। বিগত কয়েক যুগ ধরে সিঙ্গাপুর সাগরে ভূমি সৃজন তথা ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশটি উত্তর-দক্ষিণে ২৩ কিঃমিঃ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪২ কিঃমিঃ। দেশটির তীরভূমি ১৯৩ কিঃমিঃ যেখানে প্রাকৃতিক বালুকাময় বেলাভূমি নেই। বেশ কটি সৈকত রয়েছে যার প্রায় সবটাই কৃত্রিম। নতুন ভূমি-সৃজন প্রকল্পের আওতায় গড়ে উঠা এসব Beach যারপর নাই মনোরম। এর বালিও বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। খালি পায়ে হাঁটবেন; পা ঝাড়া দিলে পরিষ্কার। চাঙ্গে বিমান বন্দর (বিশ্বের অন্যতম প্রশস্ত ও ব্যস্ত বিমান বন্দর), Marine Parade, East Coast Parkway-এ সবই সাগর থেকে পুনরুদ্ধারকৃত তথা নব সৃজিত জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে। চাঙ্গে বিমান বন্দর ১৯৮০ এর পরে আত্মপ্রকাশ করেছে। সিঙ্গাপুরের স্বাভাবিক পোতাশ্রয় দেশটিকে সমৃদ্ধ করতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশের সমৃদ্ধিতে সিঙ্গাপুরবাসীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে কল্যাণে সরকারী উদ্যোগ-প্রচেষ্টার সাথে সাথে বেসরকারী তৎপরতা বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সিঙ্গাপুরের প্রধান ভূখন্ডের Core গঠিত হয়েছে গ্রানাইট পাথরে। অনেকটা ঢেউ খেলনা (Undulating) এই দেশটির সর্বোচ্চ স্থান Bukit Timah এর উচ্চতা মাত্রই ১৬৬ মিটার বা ৫৪০ ফুট। ওদেশে পর্বতকে Bukit বলে। মূল ভূখন্ডে মাত্রই ১০ বর্গ কিঃমিঃ জলাধার রয়েছে।

দেশটিতে উল্লেখ করার মত কোন প্রাকৃতিক নদী নেই তবে কৃত্রিম আমাজান, মেকং, মারে, মিসিসিপি ও ইয়াংসিকিয়াং সৃষ্টি করা হয়েছে। কৃত্রিম আমাজানে আপনি সুসজ্জিত মনোরম লঞ্চে নৌবিহার করতে পারবেন সময় হিসেবে যার ভাড়া নির্ধারিত।

সিঙ্গাপুর তাঁর প্রয়োজনীয় পানি মালয়িশয়ার Zohor থেকে আমদানি করে। ব্যবহৃত পানিও Recycle করে নতুনভাবে সরবরাহ করা হয়।

সিঙ্গাপুরের অবস্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলে (0-5°) বিধায় এখানকার জলবায়ু নিরক্ষীয় অর্থাৎ সারা বছর প্রায় এখন রকম উচ্চ তাপমাত্রা 23°C - 32°C (সর্বোচ্চ রেকর্ড রয়েছে 36°C সর্বনিম্ন 19°C)। গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৪% - ১০০%। এখানে মাসে ১৮ থেকে ২৩ দিন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুপুরের পর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৩৪৫ মিলিমিটার। তুলনামূলকভাবে পূর্বাংশের চেয়ে পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত কিছু বেশি। এদেশে দু,টি মৌসুমী ঋতু রয়েছে ; (ক) উত্তর-পূর্ব মৌসুমী আর্দ্র ঋতু (ডিসেম্বর থেকে মার্চের প্রথম ভাগ) ; (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতু (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)। বছরের অন্ততঃ ৪০% দিনে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি হয়। তবে বজ্রপাতে কেউ মারা যায় না।

যেভাবে আজকের সিঙ্গাপুরে উপনীতি :

(i) ১৮১৯ সালে Sir Thomas Stamford Raffes এর সিঙ্গাপুর পদার্পণ।

(ii) ১৮১৯ - ১৮৪২ এর মধ্যে বৃটিশ শাসনাধীনে Colony তে রূপান্তরণ, সুলতান Hussein এর সাথে Raffies চুক্তির ফলে East India Company-র বৃটিশ Base হিসেবে ১৮১৯ এর ফেব্রুয়ারী থেকে যাত্রা শুরু হয়।

(iii) ১৯৪২ - ১৯৪৫ সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে আসে এবং সিঙ্গাপুরের নতুন নামকরণ হয় Syonan To এ সময় চরম দূরবস্থা বিরাজ করে।

(iv) ১৯৪৫ - ১৯৫৯ বৃটিশ শাসনে ফিরে আসে। এ সময় জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

(v) ১৯৪৮ - ১৯৬০ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা জারি থাকে।

(vi) ৮ এপ্রিল ১৯৫৫ - David Marshall সিঙ্গাপুরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন।

(vii) ১৯৫৯ - ১৯৬৩ সিঙ্গাপুরের নিজস্ব সরকার গঠিত হয়। Peoples Action পার্টি প্রধান খবব প্রধানমন্ত্রী এবং Yousuf Ishaq প্রেসিডেন্ট হন।

(viii) ১৯৫৯ - ১৯৬৩ মালয় এর সাথে মিশে সাবাহ ও সারাওয়াককে অন্তর্ভুক্ত করে Malayasia গঠিত হয়।

(ix) ৯ আগষ্ট ১৯৬৫ মালেয়িশয়া থেকে বেরিয় এলে সিঙ্গাপুর একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২১ সেপ্টেম্বর UNO এর সদস্য হয়।

(x) ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সিঙ্গাপুরকে Republic ঘোষণা করা হয়।

(xi) ১৯৬৭ সালে ASEAN সংস্থা গঠিত হলে সিঙ্গাপুর এর সদস্য হয়।

(xii) ১৩ এপ্রিল ১৯৬৮ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

(xiii) ৩১ অক্টোবর ১৯৭১ সিঙ্গাপুরস্থ British Military Base রহিত হয়।

(xiv) ৩১ মার্চ ১৯৭৫ - অষ্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের সৈন্যেরা চিরতরে সিঙ্গাপুর ছাড়ে।

(xv) ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮১ - 'চাঙ্গে বিমান বন্দর খুলে দেয়া হয়।

(xvi) ২৮ নভেম্বর ১৯৯০ - দীর্ঘ ৩১ বছর পর অবিসংবাদিত নেতা প্রধানমন্ত্রী Lee Kwan Yew প্রধান মন্ত্রীত্ব Goh Chok Tong এর হাতে ছেড়ে দেন।

(xvii) ২৩ মার্চ - ২০১৫ Lee Kwan Yew শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(xviii) সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খবব Kwan Yew এর জ্যেষ্ঠপুত্র Lee Hsien Lung এবং প্রেসিডেন্ট হালিমা ইয়াকুব।

(xix) ১৯৮১ সালে Vanda Miss Joaquinm সিঙ্গাপুরের জাতীয় ফুলের স্বীকৃতি পায়।

সিঙ্গাপুরের National Symbol হচ্ছে Merlion. রূপকথার প্রাণী Merlion এর মাথা সিংহের আর শরীর Mermaid বা মৎস্যকুমারীর। সিংহ হচ্ছে অমিত শক্তি, সাহস, বিক্রম ও চমৎকারিত্বের প্রতীক। সিঙ্গাপুরের জাতীয় পতাকার উপরের অর্ধাংশ লাল যেখানে সাদা ৫টি তারাসহ সাদা অর্ধচন্দ্র আর নিচের অর্ধাংশ সাদা। লাল হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব আর সাদা চিরন্তন পবিত্রতা ও সৎগুণাবলীর প্রতীক। পতাকায় ৫টি তারা সিঙ্গাপুরের। আদর্শের প্রতীক, যথা (ক) গণতন্ত্র, (খ) শান্তি, (গ) উন্নয়ন, (ঘ) ন্যায়বিচার ও (ঙ) সাম্য।

প্রগতিশীল দেশ সিঙ্গাপুরকে সবার জন্য একটি অধিকতর দয়ালু সমাজে পরিণত করতে ১০টি সরল জিনিস সকলে মনে রাখেন বা মেনে চলেন। এগুলো হচ্ছে-

(১) সবাইকে নম্রতার সাথে সংবর্ধনা জানানো।

(২) সাধারণ শিষ্টাচার বজায় রাখা।

(৩) কথায় বাধা না দিয়ে অন্যদের বক্তব্য শ্রবণ করা।

(৪) নিজের কণ্ঠস্বরকে ভব্যতার গন্ডিতে নামিয়ে রাখা।

(৫) যানবাহনে অন্যান্য যাত্রীদেরকে স্থান করে দেয়া।

(৬) রাস্তাঘাটে সৌজন্যমূলক আচরণ করা।

(৭) সময়ানুবর্তিতা (নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই উপস্থিত হওয়া)।

(৮) প্রয়াজেন হলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া (চষবধংব বীপঁংব সব.)

(৯) অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

(১০) অন্যদের এবং পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখানো (অন্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখানো)।

নব সৃজিত ভূমি ছাড়া দেশের প্রায় সবখানেই লালচে হলুদ মাটি রয়েছে। মাটিতে ছাটে বড় কাকর রয়েছে। নবসৃজিত তথা পুনরুদ্ধারকৃত ভূ-ভাগ প্রথমে বালি দিয়ে ভরাট করা হয় এবং অতঃপর অন্যান্য মাটি, ঘাসের চাপড়া প্রভৃতি দিয়ে উপরের আস্তরণ গড়ে তালো হয়েছে। দেশের টিলাগুলারে

মাটিও লালচে হলুদ। ভূমি ক্ষয়রাধে কল্পে সমগ্র উচু/টিলা এলাকায় সযত্নে ঘাসের চাপড়া লাগানো হয়। এক্ষেত্রে Terrace বা ধাপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দেশটির সবখানেই মাটি আছে তবে তা সবখানেই সহজে দৃশ্যমান নয়। রাস্তায় পায়ে দলে চললে চরণ, ধূলি ধূসরিত হবার সুযাগে নেই বললেই চলে। ফলে পদধূলি দেয়া-নেয়ার উপায় নেই, প্রয়াজেনও পড়ে না। বৃষ্টি বহুল এই দেশটিতে ভূমিক্ষয় তথা মাটি ধূয়ে আসা বা রাস্তায় কাদা জমার কথা ভাবাই যায় না। সবখানেই ঘাসের চাপড়া দিয়ে এমনভাবে সাটানো যে ধূলা-বালির গড়িয়ে চলাকে আটকিয়ে দেয়।

সিঙ্গাপুরে মূলতঃ নিরক্ষীয় চিরসবুজ গাছপালার বনভূমি থাকার কথা থাকলেও তা নেই, রাখা হয়নি, যা আছে তা সংরক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত। হয়নি তার কারণ অসংখ্য ধরণের নির্মাণের জন্য ভূমি দরকার। এদেশে বৃক্ষছেদনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়াজেন। সেক্ষেত্রে আইন আছে আর তার প্রয়াগেও আছে। সিঙ্গাপুরের তীর বরাবর আর্দ্রভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় ৫০০ হেক্টর Mangrove আস্তরণ রয়েছে। City Centre সমূহের সন্নিকটে Botanic Garden স্থানীয় উদ্ভিজ্জের চিত্তাকর্ষক ভান্ডার। এদেশে প্রায় ২,২৮২ প্রজাতির উদ্ভিজ্জ রয়েছে। ওখানে প্রায় আমাদের দেশের মত থানকুনি, জার্মানী লতা, বুনো মানকচু, লজ্জাবতী, পিপুল,কলাগাছ প্রভৃতি রয়েছে। পার্কসমূহে আম, কাঁঠাল, নারকেল, তাল-সুপারী লাগানো হয়েছে। এছাড়া আরও অসংখ্য গাছপালা রয়েছে যার নাম আমার কাছে অজানা। সিঙ্গাপুরে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিলীনের পথে। কিছু বানর, মাকাউ, উড়ন্ত লেমুর, কাঠবিড়াল, সাপ, বাদুড়, গিরগিটি এসবও মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। রাস্তায় বেওয়ারিশ কোন কুকুর নেই। নেই শেয়াল, বেজি, শূকর। হাঁস, মুরগী, ভেড়া এসবের বালাই নেই রাস্তায়। নোংরা ছড়ায় বলে কাক মেরে ফেলা হয়। কাক নেই তবে কোকিল আছে। এদেশে প্রায় ১৪২ প্রজাতির দেশীয় পাখি দেখা যায়। সবচেয়ে সাধারণ পাখি হল জাভান ময়না, স্টার্লিং এবং বুলবুল। আছে চড়াই, ঝুটকুলি, শালিক এবং কবুতর।

সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন। মাটে জনসংখ্যার ৭৬.২% চাইনিজ, ১৩.৮% মালয়ী, ৮.৩% ভারতীয় এবং ১.৭% ইউরেশিয়ান ও অন্যান্য। ধর্মের দিক দিয়ে ৪২.৫% চীনা বৌদ্ধ, ৮.৫% তাওইজম, ১৫% ইসলাম ধর্মী, ১৫% খৃষ্টান, ৪% সনাতন ধর্মী, বাকী প্রায় ১৫% অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। এদেশে পুরুষ-নারীর (M : F) অনুপাত ৯৮৮ : ১০০০। জীবন প্রত্যাশা গড়ে ৭৯.৭ বছর ; M-৭৭.৪ বছর এবং F ৮১.৩ বছর। জনসংখ্যার ৪৩% বিবাহিতের প্রথম বিয়ে পুরুষের (M) ক্ষেত্রে ৩০.৫ বছরে, মেয়েদের ক্ষেত্রে (F) ২৭.৩ বছরে। এদেশের জন্মহার ১৪ক্ক/ধড়। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭২৫৭ (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)। মাথাপিছু আয় ৫৭৬১০ সিঙ্গাপুর ডলার। ১ সিঙ্গাপুর ডলার বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৬০/- টাকা।

সিপুরে প্রতি ৫ বছর পর পর নির্বাচন হয়। প্রধান ৩টি রাজনৈতিক দল PAP, WPS ও SDP. নির্বাচনে যে দল ৫০% সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সে দলই সরকার গঠন করে। সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টারী সরকার Westminster মডেলে পরিচালিত । একটি সুদক্ষ সরকার আর সুনিপুন শ্রম শক্তির দেশ হিসেবে সিঙ্গাপুরের রয়েছে বিশ্বপরিচিতি। দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়মুক্ত দেশ সিঙ্গাপুর বিশ্বের নিরাপদতম ও পরিচ্ছন্নতম বাসযাগ্যে দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ সিঙ্গাপুরে Public School সমূহে ধর্ম শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ। এদেশে দল বেঁধে, সভা করে, মাইক বাজিয়ে, জিগির তুলে ধর্মের পথে আহ্বানের কোন সুযাগে নেই। ইসলামের

অন্যতম আদর্শ- (i) ধর্মের জন্য বল প্রয়াগে নাই এবং

(ii) তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে - এর প্রকৃষ্ট নমুনা সিঙ্গাপুরে দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ধর্মের কয়েকটি উপাসনালয়ের তালিকা দেয়া হল :

উপসনালয়ের নাম	অবস্থান
American Church of St. Gregory	Colonial District
St. Andrew's Cathedral	Colonial District
Wesley Methodist Church	Colonial District
Novena Church	Novena
Central Sikh Temple	Toa Payoh
Shakya Muni Buddha Gaya Temple	Little India
Sri Srinivasa Perumal Temple	Serangon Rd. Little India
Sri Mariamman Temple	China Town
Jamia Chulia Mosque	China Town
Thian Hock Keng Temple	China Town
Sultan Mosque	Kumpong Glam/Arab St.
Al Khair Mosque	Chua Chu Kang

সিঙ্গাপুরে বছরে বেশ কিছু উৎসব পালিত হয়। নিম্নে কয়েকটি উৎসবের নাম উল্লেখ করা হল। (এসব দিবসে সরকারী ছুটি থাকে।)

চীনাদের উৎসবের মধ্যে রয়েছে।

(i) Chinese New Year

(ii) Yu Lan Jie Festival ev Hungry Ghost/Seven Monthis Festival

(iii) Qing Ming Festival, (iv) Mid Autumn Festival /Moon Cake/Lantern Festival.

মুসলিমদের-

(i) Hari Raya Puasa (ঈদুল ফিতর), Hari Raya Haji (ঈদুল আযহা).

হিন্দুদের-

(i) Thaipusam

(ii) Thimithi (জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার অনুষ্ঠান)

(iii) Deepavali (হিন্দু ও শিখদের প্রদীপ প্রজ্বলন)।

এছাড়াও বৌদ্ধদের রয়েছে Vesak Day (গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণ লাভ);

খৃষ্টানদের Christmas (যিশুর জন্মদিন তথা বড়দিন), Good Friday and Easter.

উপরেরগুলোছাড়াও উৎসব পালিত হয়- ৯ আগস্ট জাতীয় দিবস, WOMAD Singapore (সিঙ্গাপুরের সংগীত ও নৃত্যকলার অনুষ্ঠান), Singapore Arts Festival (সিঙ্গাপুর শিল্পকলা অনুষ্ঠান), আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (পহেলা মে) প্রভৃতি।

সিঙ্গাপুরে কাজের সপ্তাহ সোমবার থেকে শুক্রবার, সপ্তাহে কাজের সময় ৪৪ ঘন্টা ; ক্ষেত্রবিশেষে ৪৮ ঘন্টা; বার্ষিক ছুটি পাওনা ১৫ থেকে ১৮ দিন; দীর্ঘ চাকুরীর ক্ষেত্রে ২৫ দিন যা এমনকি ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। প্রমাণিত অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা ; শিক্ষকদের জন্য সকাল ৭.৩০ থেকে বিকাল ৩.০০ টা। অফিসে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় লিখতে হয়। বিলম্বে মাইনে কাটা যায় ।

সিঙ্গাপুরে No Qualification-১৯%, ডিপ্লোমা-৫%, পলিটেকনিক-৬%, প্রাইমারী-১২%, সেকেন্ডারী (নিঃ)-৩৬%, সেকেন্ডারী (উচ্চ)-১০%, বিশ্ববিদ্যালয়-১২% । (N.B. ২০০৭ সালের তথ্যসূত্র)

সিঙ্গাপুরের নিজস্ব নাগরিকদের শিক্ষা গ্রহণের অবাধ সুযাগে রয়েছে যা বসবাসরত বিদেশীদের ক্ষেত্রে নেই বা অত্যন্ত সীমিত এবং ব্যয় বহুল। সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পাওয়া বিদেশীদের মৃত্যুর পর ওদেশেই সমাহিত করতে হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সৎকার পদ্ধতি এবং সরকারের স্থান আলাদা।

সিঙ্গাপুরে ইচ্ছে করলেই আপনি কোন দোকান থেকে ঔষধ কিনতে পারেন না। মোটামুটি Prescription কিংবা Reference প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা সেবা পেতে হলে আপনাকে আগে ভাগে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। চিকিৎসা সুবিধা তথা ডাক্তারী সুবিধা পেতে হলে রেজিস্টার্ড হতে হবে। সরকারী ছাড়া বেসরকারী চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

নিম্নে সিঙ্গাপুরের কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের নাম ও টেলিফোন নম্বর দেয়া হল :

সরকারী হাসপাতাল/টেলিফোন	বেসরকারী হাসপাতাল/টেলিফোন
আলেকজান্দ্রা হাসপাতাল- ৬৪ ৭২-২০০০	গ্লেনিগেলস হাসপাতাল- ৬৪৭৩-৭২২২
চাঙ্গি জেনোরল হাসপাতাল- ৬৭৮৮-৮৮৩৩।	মাউন্ট এলিজাবেথ- ৬৭৩৭-২৬৬৬
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল- ৬৭৭৯-৫৫৫৫	র‍্যাফেলস হাসপাতাল- ৬৩১১-১১১১
সিঙ্গাপুর জেনোরল হাসপাতাল- ৬২২২-৩৩২২	ওয়েস্টপয়েন্ট ফ্যামিলি হাসপাতাল- ৬২৬৮-৭৫৫৫
ইনসটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ- ৬৩৮৯-২০০০	মাউন্ট এলিজাবেথ নোভেনা হাসপাতাল- ৬৯৩৩-০১০০

সিঙ্গাপুরে বহু সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্লিনিক রয়েছে। General Practitioner (GP) অনেক আছেন। বাসা বাড়ী/অফিসের কাছে থাকা এটাকেই অধিকাংশ লোক যোগাযোগ রাখেন। সারাদেশে বহু Poly Clinic আছে যেখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা ও ডাক্তারের হদিস পাওয়া যায়। এদেশের

সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল ও পলি ক্লিনিকগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রাচুর্য রয়েছে। দেশের কতকগুলো Poly Clinic এর নাম, ফোন নম্বরসহ নিম্নে দেয়া হল-বুকিট বাটোক (৬৫৬০৩৪০০), বুকিট মেরাহ (৬২৭১৩৯১১), চোয়া চু কাং (৬৭৬৫৯৬৪১), ক্লিমেন্টি (৬৭০৭৫০৫১), জুরং (৬৫৬২৩০১১), মেরিনা প্যারেড (৬৩৪৫০০৪৯), কুইন্স টাউন (৬৪৭১৯৫৩০)।

সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন মানের অসংখ্য হোটেল রয়েছে। সাধারণতঃ Sky Scrapers/High Rising Buildings হোটেল এর জন্য আদর্শ স্থানীয় । নিম্নে বিভিন্ন মানের কয়েকটি হোটেল এর তালিকা দেয়া হল :

পাঁচ তারা হোটেল:

কনরাড সেন্টেনিয়াল, গ্রান্ড হায়াট সিঙ্গাপুর, হিল্টন সিঙ্গাপুর, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, প্যান প্যাসিফিক হোটেল, র‍্যাফেলস হোটেল, সাংগ্রিলা হোটেল, শেরাটন টাউয়ারস, দি ফুলারটন সিঙ্গাপুর, দি রিজেন্ট .....

চার তারা হোটেল :

অলসন হোটেল, কার্লটন হোটেল, অর্চাড হোটেল, ইয়র্ক হোটেল, দি এলিজাবেথ সিঙ্গাপুর, চাঙ্গী ভিলেজ হোটেল, গ্যালারী হোটেল .....

তিন তারা হোটেল :

চায়না টাউন হোটেল, অক্সফোর্ড হোটেল, রিভার ভিউ হোটেল, রয়াল পিকক হোটেল, সামার ভিউ হোটেল .....

দুই তারা হোটেল:

ডিকসন কোর্ট হোটেল, ফ্রাগ্রান্স হোটেল, হোটেল ৮১ .....

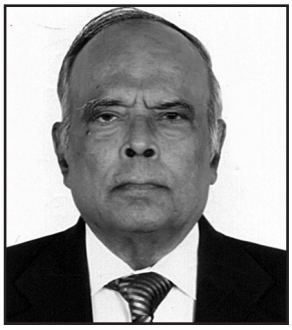

আমার দেখা আমেরিকা

ইঞ্জিনিয়ার বজলুর রহমান
আজীবন সদস্য
কেন্দ্রীয় সমিতি

যাত্রাঃ এর আগে আমেরিকায় বহুবার গিয়েছি। আবার যেতে হবে নাতনি প্রমার Graduation Ceremony তে। সে স্কুল জীবন শেষ করে ইউনিভারসিটিতে (University) ভর্তি হবে। সেই মতোজুন মাসের ৫ তারিখে যাওয়ার জন্য টিকিট কাটলাম। কিন্তু গোল বাধালো চিকনগুনিয়া নামের এক বিচিত্র ব্যাধি, জ্বর অনেক, গায়ে, গিরায় গিরায় অসম্ভব ব্যথা হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। তাই আমেরিকা যাওয়ার প্ল্যান স্থগিত করতে হলো। খুবই খারাপ লাগলো। দুই মাস বিশ্রামের পর জুন মাসের প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে হলো আগষ্টে। টিকিট নিতে হলো অনেক গচ্চা দিয়ে প্রায় ডবল দামে। কাতার এয়ারওয়েজ এ যাওয়ার কথাঃ ঢাকা থেকে দোহা লাগে প্রায় ৫ ১/২ ঘন্টা সহনীয় সময়। কিন্তু তারপরের যাত্রা আমার জন্য ভয়াবহ না হলেও ভীতি পদ প্রায় ১৪ ঘন্টার মতো এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। এই দীর্ঘ সময়ে যেটা প্রায় অনেকেরই হয় তা হচ্ছে দুই পা ফুলে যায়। অনেকের এমন অবস্থা হয় যে খালিপায়ে জুতা হাতে নামতে হয়।

কাষ্টমসঃ ঘড়ির সময় বাংলাদেশের তাই কয় ঘন্টা গেছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল- তাই Air Hostess কে জিজ্ঞাসা করলাম আর কতক্ষণ লাগবে ওয়াশিংটন ডি. সি তে পৌঁছাতে। বললো আরো প্রায় ৭ ঘন্টা সময় লাগবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল কেবলমাত্র আধা পথ পাড়ি দিয়েছি। অবশেষে পৌছালাম সেই গন্তব্য স্থলে। আমাদের Custom Declaration Form দেওয়া হল। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয়, ৮/১০ বছর আগে একবার সিঙ্গাপুর থেকে Los Angeles (LA) গিয়েছিলাম। LA এর কাষ্টমসে খুবই কড়া কড়ি করে কারণ LA একটা Agricultural Country এবং বাইরে থেকে কোন ফলমূল- উদ্ভিদ জাতীয় কিছু আনা যায়না। সিঙ্গাপুরে কিছু ফলমূল কিনেছিলাম আর কিনেছিলাম কয়েকটি লেবু। ভুলবশতঃ গোটা দুই লেবু সঙ্গে ছিল। Form পূরণ করেছি কিছু নেই। বললামও কিছু নেই। কিছুক্ষণ পর দেখি কয়েকটা ছোট ছোট কুকুর লাগেজের পাশে আনা গোনা করছে এবং তাদের তীব্র ঘ্রাণ শক্তির সাহায্যে লেবু গুলো বের করে ফেললো। আমি খুবই লজ্জিত হলাম। Custom Officer আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে লেবু গুলো ছুড়ে ফেলে দিল। এর চেয়েও আশ্চার্য্য ঘটনা ঘটেছিল আমার এক আত্মীয়ের বেলায় এই খাতে। তাঁর কাছে কিছু মিষ্টি ছিল। Custom সেগুলি নিতে দিবে না। ভদ্রমহিলা প্যাকেট খুলে মিষ্টি খাওয়া আরম্ভ করে দিল। আর কাষ্টমস অফিসার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো- কিছু করার নেই। এবারের যাত্রায় লেবু

জাতীয় কোন জিনিষ নেই- আছে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য। এটা নিয়েও কিছু বিভ্রান্তি- কি হয় না হয়। Custom এর ফরমটা কিছুটা গোলমেলে। কয়েকটা জিনিসের নাম লেখা আছে এক লাইনে। এর পাশে লিখতে হবে: Yes/No. যেমন লেখা আছেঃ Fruits, Vegetables, Plants, Seeds, Food, INSECTS:

(খাওয়ার জিনিষের সঙ্গে পোকামাকড়) সঙ্গে আছে কিছু শুকনা মিষ্টি এগুলো Food গোত্রে পড়ে। আমাদের চিন্তায় Food বলতে বড় কিছু মনে হয় যেমন, ভাত, ডাল, মাছ ইত্যাদি। ভাবলাম ঘর লিখি, পাশে এক চাইনীজ যাত্রী ছিল সে দেখি লিখেছে Yes. জিজ্ঞাসা করলাম ভুমি Yes লিখেছ কেন। সে বলল সঙ্গে কিছু DRY FRUITS আছে তাই। আমিও তাই YES লিখলাম। এবারে আসলাম এয়ারপার্টের বিরাট হলরুমে। হাজার হাজার লোক সেখানে ভীড় করেছে দেখে মনে হয় বাংলাদেশের সদর ঘাট। টিকেটে দুই জনার জন্য Wheel Chair এর কথা ছিল। অনেক কষ্ট করে একটা যোগার করে স্ত্রীকে দিলাম। ঠেলে নেওয়ার জন্য একটা লোক পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কি "কাতার এয়ারওয়েজ" এর। সে বললো কোম্পানির লোক কথাটা খোলাসা হলোনা। কথা না বাড়িয়ে যাত্রা শুরু করলাম। হলরুমে দেখি ২০/২৫টা বড় বড় মেসিন- সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা পাসপার্টের ছবি, ভিসার ছবি, চোখের ছবি, আঙ্গুলের ছবি তুলছে নিজে নিজেই। এসব কাজ দেখে আমি অভ্যস্তনই- তাই চিন্তা করছিলাম কি করা যায়। Wheel Chair এর ঠেলাওয়ালা সব কাজগুলি অনায়াসে করে দিলো অল্প সময়ের মাঝে। কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। জানতে পারলাম তাঁর বাড়ি আফগানিস্থান সে আজ থেকে ২০/৩০ বছর আগে এ দেশে এসেছে। তাঁর ঘর বাড়ি, ছেলেমেয়ে সব এখানেই থাকে। তাঁর সাহায্যে Custom Barrier সহজেই পার হলাম। Custom officer শুধু জিজ্ঞেসা করলো Food Staff কি আছে- বললাম Dry Sweets. লবিতে আসলাম ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। ঠেলাওয়ালোক কত Tips দেওয়া যায় চিন্তা করছিলাম। তাকে এক পাশে ডেকে এনে ১০ ডলার দিলাম দেখি সে খুবই অসন্তুষ্ট। বললোঃ Thave wasted my time. ছেলেকে ডেকে বললামঃ ওকে আরো কিছু ডলার দ্যে- বেচারা খুবই অসন্তুষ্ট ছেলের কাছে খুচরা ডলার ছিলনা- ছিল কিছু ইউরো। তাঁর থেকে ১০ ইউরো দেয়া হলো- অর্থাৎ প্রায় ২০ ডলার। মনে হলো কাবলিওয়ালা দেশের লোক এতেও সন্তুষ্ট হলোনা। মনটা খারাপ লাগলো আমেরিকা ঢুকে প্রথম দর্শনের লোকটাকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। এরপর এ বিষয়ে চিন্তা করলাম আলাপও করলাম কয়েকজনের সঙ্গে, আমার এক আত্মীয় বললো আপনারটা তো কথার উপর দিয়ে গিয়েছে- আমার অভিজ্ঞতা আরেক ডিগ্রি উপরের। আমেরিকার হোটেলে উঠেছি মালপত্র রুমে নিতে হবে- বিরাট সাইজের এক নিগ্রো এসে হাজির। মানা করা সত্তেও সে ল্যাগেজ রুমে নিয়ে এলো। তাকে ১০ ডলার দিলাম- সে নোটটী মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ বিষয়ে চিন্তা করে মনে হল Porter বা এই জাতীয় লোকদের শিক্ষা খুব বেশী নয়। সে প্লেনের সব যাত্রীকে খুবই বড়লোক মনে করে। আর আমরাও যখন ডলার Tips দেই তখন বাংলাদেশে টাকার Equivalent চিন্তা করি। অর্থাৎ ১০ ডলার মানে ৮০০ টাকা প্রায়- কিন্তু একজন আমেরিকানের চোখে এটা দশ টাকার সমমান মনে হয়। তাই এই বিপত্তি।

বকভিলঃ ওইয়াশিংটন ডি.সি এর কাছে Mary Land State থাকি। যে শহরে থাকি তাঁর নাম City of Rockville. এই রাজ্যের বিশেষত্ব হচ্ছে সবুজে ভরা গাছপালা- মনে হয় বাংলাদেশের সুন্দর বনের একটা অংশ- বড় বড় বিশালদেহী বৃক্ষ সমূহ- নিচে ছোট ছোট গাছপালা নিরেট জঙ্গল। এই জঙ্গলে হরিণের দল বাস করে। মাঝে মাঝে এই হরিণের দল লোকালয়ে চলে আসে। এই দলে বেশিরভাগ সময় থাকে ৩টি হরিণ- মনে হয় ছোট একটি সুখী পরিবার। স্থনীয় বাসিন্দারা কিন্তু এই হরিণ পছন্দ করে না। বলে এরা এসে ছোট ছোট ফুল ফলের গাছ খেয়ে ফেলে। গোলাপ ফুলের গাছ নাকি হরিণের খুবই প্রিয় খাবার। মনে হল ঢাকায় উত্তরায় যদি এই ধরণের বুনো হরিণের পাল দেখা যেত- তবে বাজারে নিশ্চয় খাসির মাংসের দাম কমে যেতো। এখানে আরো আছে শিয়াল, খরগাসে ও বন্ধুধরণের কাঠবেড়ালি। বাড়ির সামনে একটি বিরাট বুনো বাদামের গাছ। শীতের আগে গাছ থেকে বহু বাদাম পড়ে। এগুলো কাঠবেড়ালির খাদ্যতারা দলে দলে এসে এগুলো খেয়ে যায় এবং মাটিতে পুঁতে রাখে ভবিষ্যতের খাবার হিসেবে।

আশেপাশের প্রতেবেশি সবাই সাদা আমেরিকান। পরিচয় Hye-Hello এর মাঝে সিমিত। সামনের ভদ্রলোক একজন ইটালিয়ান-আমেরিকান। শীতের চার মাস ইটালিতে চলে যায়। তাঁর পাশের ভদ্রলোক একজন আমেরিকান Orthopedic Surgen. ক্যান্সারের জন্য অপারেশন করে একটা পা কেটে ফেলতে হয়েছে। তাই সে একজন পঙ্গু একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে থাকে। তাঁর স্ত্রী বহুদিন আগেই মারা গেছে। তবে Operation এর সময় তাঁর মেয়ে এসে ৪ মাস ছিল। তাঁর ছেলে পার্শ্ববর্তী State এ থাকে মাঝে মাঝে এসে বাড়ির আঙ্গিনায় ঘাস কেটে দিয়ে যায়। ভদ্রলোকর শখ পুরানো দিনের বড় গাড়ি। নিঃসঙ্গ ভদ্রলোক বিশেষ বাইরে যান না - বা তাঁর কাছে কেউ আসেও না। একদিন দেখি তাঁর লনে ৪/৫ জন লোক মেসিন দিযে ঘাস কাটছে। জানতে পারলাম তাঁর ছেলে বহুদিন আসে না- এদিকে ঘাসগুলি বড় হয়ে গেছে তাই প্রতিবেশীরা এসে লনের ঘাস কেটে দিচ্ছে। এই ঘটনায় বোঝা যায় প্রতিবেশীরা সজ্জন- এবং ভদ্রলোক একটু কৃপণ প্রকৃতির। ভদ্রলোকর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সে সহজেই অন্য লোক দিয়ে এই কাজটি করাতে পারে- খরচ খুব বেশী হবেনা। আমার নাতিদের আরবি পড়াতে আসে একজন লেবানীজ মহিলা-নিজের গাড়ি চালিয়ে। তাকে দিতে হয় ঘন্টা প্রতি ৩০ ডলার। পড়ানোর শেষে তাকে নগদ টাকাটি দিতে হয়। এ এক ভালোব্যবস্থা- নগদ বিদায়। মাসের হিসেবে দিলে ২/১ দিন না আসলে টাকা কাটা মুশকিল হয়ে যায়। তাঁর ছেলে থাকে জার্মানীতে- মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যায়।

একজন পরদেশীঃ আমার ছেলের বাসায় একটা কাজের মহিলা আসে সপ্তাহে একদিন। গায়ের রঙ সাদা নাম আনা মারিয়া বাড়ি আমেরিকায় San Salvador. বয়স ৩০/৩৫ হবে- মাঝারি গঠন- সুস্বাস্থ্য দূর থেকে দেখলে মনে হয় একজন নেপালী মহিলা। তাঁর ছেলে মেয়ে দেশে থাকে সে একজন পরদেশী যাকে বলে Illegal Immigrant. কাজ করে ৫/৬ ঘন্টার মতো- দিতে হয়। ৯০/৮০ ডলারের মতো। কাজ করে নিঃশব্দে উপরতলা-নিচতলা বাথরুমে সবজায়গায়। সে একজন বাড়ির লোকের মতো সবজায়গায় অবাধ গতিবিধি। সকালে এসে Break Fast করে একেবারে

Standard type এর ডিম, Toast, ফলের জুস-চা কফি ইত্যাদি। দরকার মতো নিজেই ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে নিয়ে যায়। বেলা ১১ টার দিকে আমরা যখন চা খাই-তখন আমাদেরই একজন বলে উঠলোঃ Anna Do you like to have a cup of Tea? কাজ শেষে যাওয়ার সময় সে Lunch Packet নিয়ে যায় সেটাও Standard type এর Sandwich, নিরামিষ, মাংস- সঙ্গে এক বোতল কোক। তাকে আবার গাড়ি করে Bus stand এ পৌঁছে দিতে হয় সেটা একটু দূরে। আনা মারিয়া ২০০১ সালে আমেরিকা আসে এবং একবার দেশে গিয়েছিল ২০০৪ সালে। অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে পরিবারের জন্য প্রাণপাত করছে। অথচ দেশে তাঁর ছেলে মেয়ে আছে মেয়ে Hotel Management বিষয়ে পড়াশোনা করছে। দুঃখ একটাই সে দেশে যেতে পারে না। চিন্তা করছিলাম আমাদের দেশের কাজের লোক ও আনার মধ্যে তফাতটা কোথায়। কাজের পরিবেশ ও ব্যবহার বিষয়ে। দুজনেই এখন কাজ করে কিন্তু পরিবেশ ও ব্যাবহার একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের দেশের একজন গৃহকর্মী- গৃহকর্তা বা অন্য কারো সঙ্গে এখন টেবিলে বসে এখন জিনিষ খাবে- সেটা চিন্তাও করা যায়না- যদিও দুজনেই একই দেশের একই ধর্মের। দু-জনের সম্পর্কের ভেতর যে No mans land রয়েছে সেটা দূর হবে যখন গৃহকর্মীর আর্থিক সঙ্গতি একটা সম্মান জনক স্তরে পৌঁছাবে।

ট্রাম্পের আমেরিকাঃ ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমেরিকার সামাজিক রীতিনীতি অনেক না হলেও কিছু পরিবর্তন নজরে পড়ে। সাধারন অনেক আমেরিকান ইহুদি, মুসলমান ও বিদেশীদের অন্য চোখে দেখে। মনে করে এরা ভালো বেতনে চাকুরী করে- ব্যবসা করে অনেক উপার্জন করে যা সধারণ আমেরিকানরা করতে পারছে না। এখন অনেকেই মনে করে আমেরিকান ইহুদিদের উপর অনেক হামলা হয়েছে যেটা মুসলমানদের চেয়েও বেশী। যেমন আনা মারিয়ার কথা ধরা যাকঃ একদিন এক কালো আমেরিকান ভদ্র মহিলা তাকে বললোঃ "You go back to your country." আনা খুব তেজী মেযে সে উত্তর দিলঃ You purchase two tickets- One for সব, ও go back to my country- and with the other ticket you go back to Africa." এর উল্টা চিত্রও আছে। আমার ছেলে যে এলাকায় থাকে সেটা মিশ্র এলাকা- আমেরিকান চাইনীজ, জাপানী, ভারতীয় ইত্যাদিকিছু কিছু আমেরিকান তারা যে ভিন জাতের প্রতিবেশীদের ভালবাসে সেটা কথায় ও কাজে প্রকাশ করে। অনেক বাড়ির সামনে একটা Display Board দেখা যায়ঃ- যেখানে লেখা ০০: No matter where you are from, We are glad you are our neighbor" (আপনি যেখান থেকে আসুন, আমরা আনন্দিত যে আপনি আমাদের প্রতিবেশি) Display Board টি ৩ ভাষায় লেখাঃ ইংরেজী, স্প্যানিশ ও আরবি।

White House: একদিন White House দেখতে গেলাম একটা সাদা বড় বিল্ডিং চারিপাশে অনেক খোলামেলা জায়গা- বাড়িটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের বাইরে আবার 2nd Defense লাইন হিসেবে লোহার রেলিং। কালোপোশাকে সশস্ত্র পুলিশ ঘোরা ফিরা করছে- Heavily Armed দেখলেই ভয় করে। গেটের বাইরে খালামেলা জায়গা সেখানেই কিছু সংখ্যক লোক Placard বহন

করছে। জায়গাটা আমার মনে হল ঢাকার প্রেস ক্লাবের মতোছোট ছোট সমাবেশ করা যায়- বক্তৃতা দেওয়া চলে দাবী দাওয়া সম্মিলিত Placard বহন করা যায় ইত্যাদি। সেদিন কিছু প্রতিবাদকারী ছিল- Placard এ তাদের দাবী দাওয়া ছিল নিম্নরূপঃ

• NO BAN

• NO WALL

• WE STAND TOGETHER FOR NEIGHBOUR

• LOVE THY NEIGHBOUR দাবীগুলি সবই ট্রাম্পের কর্ম পরিকত্মনার বিরুদ্ধে যেমনঃ বহিরাগতদের আমেরিকা আগমন (NO BAN)- মেক্সিকোর বর্ডার WALL বানানোরে বিষয় ইত্যাদি।

শীতের আগমনঃ আমেরিকায় প্রায় দেড় মাস কেটে গেছে এখন যাওয়ার সময়। একটু একটু করে শীতের আগমন বার্তা বোঝা যাচ্ছে। চারিদিক গাছপালার রঙ পরিবর্তন হচ্ছে- সবুজ থেকে হলুদ হবে তারপর লাল গাছের পাতার মৃত্যু সংকেত। বরফ পড়া শুরু হলে মনে হয় গাছগুলি সব সদা কাপড়ের কফিন পরে দাঁড়িয়ে থাকবে- বসন্তের অপেক্ষায়। যাওয়ার সময় মনটা খারাপ লাগে মনে হয় আবার কবে দেখা হবে- কে জানে। আরো কিছুদিন থাকলে হয়তো সবারই ভাল লাগতো।

দেশের পথেঃ অক্টোবরের ১ তারিখে রওনা হলাম দেশের পথে- সেই দীর্ঘ একটানা ১২/১৩ ঘন্টার যাত্রা। সময় কাটেনা। হাঁটাহাঁটি করি সিনেমা দেখার চেষ্টা করি। Tourist class এর সিটগুলোঠিক ঢাকা-আরিচা রোডের বাসের মতো ঠাসাঠাসি। দীর্ঘ ভ্রমনে যে কোন যাত্রীর জন্য অসুবিধা জনক। আর Executive class এর সিটগুলাগেব সোফা সেটের মতো- এবং ভাড়া দুইগুণের বেশী। খুবই খরচের ব্যাপার। ঢাকায় এসে পৌছালাম প্রায় ২০ ঘন্টা একটানা ভ্রমন করে। লাগেজে নিতে গিয়ে হলো বিপত্তি। আসে না তো আসেই না। কারণ একসঙ্গে পাঁচটা হজ ফ্লাইট এসেছে- সমস্থ জায়গা জুড়ে হাজি সাহেবদের আনাসোনা- মাথায় সাদা টুপি ও সাদা আলখেলা। প্রায় ৩ ঘন্টা পর লাগেজ পেলাম। আমি নিজেই লাগেজ গুলি ট্রলিতে ওঠানোর চেষ্টা করছি- এমন সময় বিমানের এক কর্মচারি এসে সাহায্য করলো। আমি ট্রলি নিয়ে যাত্রা শুরু করতেই সে আমাকে বললোঃ মুরুব্বী আমি আপনাকে সাহায্য করেছি। আমরা অগ্রসর হচ্ছি ধীরে ধীরে। হঠাৎ সে আমাকে বললোঃ স্যার যদি কিছু বখশিস দিতে চান তবে এখনই দেনু পরে ঝামেলা হবে। অনেক চিন্তা করে পকেট থেকে ১০০ টাকা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। সে একটু ইতস্ততঃ করে বললোঃ স্যার আমেরিকা থেকে আসছেন ১০টা ডলার দিতেন। তাকে ধমক দিয়ে বললামঃ তুমি কি আমাকে আদমজী ইস্পাহানি মনে কর? মনে মনে ভাবলাম এ কি ধরণের মনমানসিকতা কেউ কিছুতেই সন্তু ষ্ট নয়। একজন বিদেশী ২০ ডলার পেযেও সন্তুষ্ট নয় আর একজন দেশী ১০ মিনিটে ১০০ টাকা পেযেও অসন্তুষ্ট। আসলে এই যাত্রায় মনে হয় কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। এটা কি আমার ব্যর্থতা?

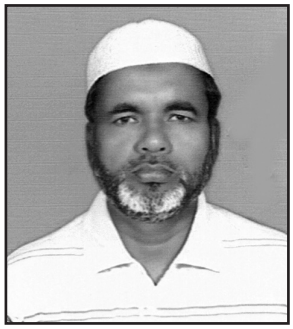

ঘুরে এলাম দিল্লি শহর

মো: আনোয়ার হোসেন
যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা
সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা সমিতি

দিল্লি কত দূর? দিল্লি বহুদূর। কারণ কেউ যদি ট্রেনে যেতে চায় তাহলে প্রায় ২ মাস আগে ইন্টারসিটি ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া এখানে তৎকালীন একটা পদ্ধতি আছে। তাতে প্রতি টিকিটে ১০০ টাকা বেশি এছাড়াও কিছু দিতে হবে দালালদের। যাই হোক ২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী আমি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে যাই কলকাতা মেয়ের মামার বাড়িতে বেড়াতে। তো সেখান থেকেই প্ল্যান করা হয় দিল্লি যাব। প্রথমে খোঁজখবর নেয়া হয় কোন প্যাকেজ প্রোগ্রাম আছে কিনা দিল্লির দিকে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লির দিকে কোন প্রোগ্রাম না থাকায় আমরা নিজেরাই যাওয়ার জন্য মনঃস্থির করলাম। আর সেই মোতারেক ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য ভাতিজা রতনকে দায়িত্ব দেয়া হল। কারণ রতন কলকাতার একটি হোটেলে চাকুরী করে। সেখান থেকে বিভিন্ন সময় তারা প্যাকেজ ভ্রমণকারীদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করে থাকে। তাই কথা মতন কাজ। আর ইচ্ছা থাকলে কোন কিছুই আটকে থাকে না। তার একটি প্রমাণ যে আমরা আমাদের সময় মতনই টিকিট পেয়ে গেলাম। যদিও ভাল কোন ট্রেনের টিকিট তখন পাওয়া যায়নি। তারপরও কথায় আছে না "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এটাও অনেকটা সেরকম ছিল। পূর্বা ট্রেন, স্লিপিং কোচ। ভাড়া ৬০০ + ১০০=৭০০টাকা (প্রতি জন)। সময় সকাল ৮টায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে। টিকিট হয়ে গেল, দিন তারিখ সময় ঠিক হল, এবার দিল্লি যাবার পালা।

'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়'। আর কেউ যদি মন থেকে কিছু চায় তাহলে যে কোন ক্ষেত্রেই আপনাআপনিই সহযোগিতা পেয়ে যায় এই কথাটা আমাদের এই যাত্রায় আরও একবার প্রমাণিত হল। আমরা বাসা থেকে বের হবার আগেই সবার মাঝে চিন্তা ছিল আমরা ঠিক মতন দিল্লি ঘুরে দেখতে পারব কিনা। কিন্তু কথায় আছে না 'যত মুশকিল তত আসান'। এরই মাঝে জানা গেল দিল্লিতে বড়দির ছোট ছেলের শালী তাঁর পরিবার নিয়ে থাকে। এটা শোনো মাত্রই বড়দি তাদের সাথে ফোনে কথা বলে সব ঠিক করে দিলেন। আর পরের দিন সকাল বেলা হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক করে রাখলাম। ভোর ৬টায় আমাদের বাসা থেকে স্টেশনে নিয়ে যাবে। ভাড়া ৫০০ টাকা। এবার শুরু হল বড়দের উপদেশের পালা। টাকা-পয়সা সাবধানে নিতে হবে, ট্রেনে লাগেজগুলি একটা চেইন দিয়ে তালা দিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে ঘুমিয়ে গেলে ব্যাগ কেউ নিয়ে যেতে পারে। আরও অনেক কিছু। বাড়ি থেকে যখন সন্তান দূরে কোথাও একা যায় তখন মা-বাবা তাদের যেমন

করে সব বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমন করে বড়দি আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন।

কথা মতন যথা সময় গাড়ি চলে এলো। **আমরা** সকাল ৭টার মাঝে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। প্রথমে দেখে তো হতবাক হয়ে গেলাম। কারণ বিরাট রেলস্টেশন। ১৭টি লাইন থেকে একসাথে ১৭টি ট্রেন ছেড়ে যেতে পারে। এখন আমাদের ট্রেনটা কোন লাইনে দাঁড়াবে সেটা ভাবতে ভাবতেই দেখি প্রতিটা প্যাটফরমের উপর কম্পিউটারাইজড মনিটর আছে। সেখানে কোন ট্রেন কোন সময়, কত নাম্বার লাইন থেকে ছাড়বে তা ১৫/২০ মিনিট আগেই মনিটরে ভেসে উঠছে। আর সাথে আছে ঘড়ি। কাজেই ট্রেন খুজতে আমাদের আর কোন অসুবিধাই হল না। এক সময় দেখা গেল ১০ নং প্ল্যাটফরম থেকে পূর্বা ট্রেন সকাল ৮টায় ছাড়বে। এটা দেখা মাত্রই আমরা আমাদের টিকিট মোতাবেক নির্ধারিত কোচের নির্ধারিত সিটে গিয়ে বসলাম। ট্রেনও যথা সময়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশন ছেড়ে গেল।

গাড়ি চললো। দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, সিতারামপুর, আসানসোল হয়ে ট্রেন যখন দিল্লির পথে চললো তখন প্রশ্ন দিল্লি কতদূর? উত্তর দিল্লি ১৫২৯ কি.মি মাত্র। ট্রেন চলছে। আমি চাতক পাখির মত জানালা দিয়ে ভারতকে দেখছি আর ভাবছি আল্লাহ বলেছেন "তোমরা রিজিকের চিন্তা করোনা, কারণ রিজিকের মালিক আল্লাহ নিজেই।" আজ তার আরো একটি প্রমাণ পেলাম। ট্রেন যখন হাওড়া থেকে ছেড়ে শহরতলী পেরিয়ে গ্রাম অঞ্চল পার হচ্ছিল আমি শুধু জানালা দিয়ে আল্লাহপাকের এই সুন্দর দুনিয়াটা দেখছিলাম। দু'চোখ যতদূর যায় শুধু ফসলি জমিতে ভরপুর সবুজের সমারোহ। লোকালয় খুব একটা চোখেই পড়েনা। বিশাল বিশাল চক পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা মেলে ছোট্ট একটি গ্রামের। আবার হারিয়ে যায় গম, সরিষা, আলু, কলাই সহ বিভিন্ন রকমের ফসলি জমি এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকমের গাছগাছালির ভিড়। দেখতে দেখতে বাংলা পার হয়ে বিহার প্রদেশে চলে এলোম। এখানেও ফসলী জমি আর জমি। লোকবসতি খুবই সামান্য। বিহার পার হওয়ার আগ মূহুর্ত থেকেই শুরু হলো কালো পাথরের কিছু কিছু পাহাড়। যেটা ঝাড়খন্ড রাজ্যে গিয়ে পূর্নতা পেল। যে পাথরগুলি আমাদের দেশে রেল লাইনের উপর দেখা যায় সেই পাথরেরই টিলা দেখা যায় বিহার রাজ্যে। কিছু দূর পরপর এবং মাঝে মধ্যে কিছু জমিতেও পাথর নজরে পড়ে কিন্তু ঝাড়খন্ডে দেখা যায় পাহাড়কে পাহাড় শুধু এই কালো পাথর এর পাহাড়। যেখানে হাজার হাজার মানুষ এই পাথর সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছে এবং এই পাথরকে কেন্দ্র করে পাথর ভাঙ্গার জন্য প্রচুর মিল-কল কারখানা তৈরি হয়েছে। এখানকার বাড়িঘরগুলিও যা নজরে এসেছে সব পাথর দিয়েই তৈরি করা। এসব দেখতে দেখতে কখন যে বেলা শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো খেয়ালই করিনি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমাদের ট্রেনটিও ঝাড়খন্ড ছেড়ে ইউ.পি-তে প্রবেশ করলো। কিন্তু আফসোস থেকে গেল ইউ.পি-কে ভালো করে দেখতে না পারার। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছিল অনেক দূরে কিছু জোনাকি পোকা অন্ধকারে আলো দান করার জন্য তাঁর ক্ষুদ্রতম প্রয়াস চালাচ্ছে। আসলে সেগুলো কোন জোনাকি পোকা নয়। ঐ গুলো হলো বিরাট বিরাট চকের পর মানুষের বসতি। গ্রামের ঘরগুলির আলোগুলো এই অন্ধকার রাতে দূর থেকে জোনাকির আলোর মত দেখা যাচ্ছে। ট্রেনেই খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সেই খাবার খেয়ে নিজ

নিজ সিটে শুয়ে পড়লাম ঘুমানোর জন্য। অন্যান্য যাত্রীরা সবাই ঘুমে। কিন্তু আমার আর ঘুম আসছে না। বার বার শুধু মনে হচ্ছে আল্লাহপাক উনার এই পৃথিবীটাকে কতই না সুন্দর করে সাজিয়েছেন, আর কত সম্পদ দিয়েই না জানি এই পৃথিবীটাকে মানুষের জন্য বাসযোগ্য করেছেন যেটা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এই জন্য আমাদের নবী করিম (সাঃ) বলেছেন - "তোমরা দেশ ভ্রমন কর।" আমারও মনে হয় আল্লাহর সৃষ্টিকে জানতে এবং বুঝতে হলে আমাদের দেশ থেকে দেশ ভ্রমন করা উচিত, তাহলে বুঝা যাবে আল্লাহপাক মানুষের জন্য কি না করে রেখেছেন। এই ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ট্রেন চলছে তার আপন গতিতে। এক সময় ঘুম ভাঙল। যাত্রীরা বলাবলি করছে দিল্লির কাছাকাছি চলে এসেছি। এবার যে যার মতন করে ফ্রেশ হয়ে যার যার গন্তব্যের দিকে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলো। দেখতে দেখতে যমুনা নদী পার হয়ে দিল্লির শহরতলীতে ট্রেন এসে পড়লো। মনে হলো দিল্লি শহরটি টিলা ঘরের উপর অবস্থিত, সমতল ভূমি নয়। রেললাইনের দুই পাশে অসংখ্য ভোগড়া গাছ। যে গাছের পাতা গুলি উটের খুব প্রিয় খাবার। দেখতে দেখতে ট্রেন সকাল ৭.৩০টায় বহু কাঙ্ক্ষিত দিল্লি স্টেশনে এসে থামল। আমরা ট্রেন থেকে নামার পরপরই বড়দির ছোট ছেলে মুন্নার ভায়রার মেয়ে মুনমুন এসে হাজির। মুনমুন মেয়েটি দেখতে ছোট খাটো, গায়ের রঙ উজ্জল শ্যামলা খুব চটপটে, প্রাণ চঞ্চল মেয়ে। মাস্টার্স করেছে। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন সুন্দর তাঁর আচরণ ও আন্তরিক। বিরাট রেলস্টেশন। যদি মুনমুন না আসতো তবে হয়তো আমাদের এখান থেকে বের হতে বেশ বেগ পেতে হত। যাই হোক, আমাদের জন্য আগেই হোটেল বুকিং করা ছিল। আর ও গাড়ী নিয়েই এসেছিল। আমরা তখন ওর সাথে সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মাঝারি মানের হোটেল। কিন্তু গিজার থেকে শুরু করে আধুনিক সব সুযোগ- সুবিধাই রয়েছে এই হোটেলে।

এত লম্বা একটা জার্নির পর আমরা সবাই ক্লান্ত। তাই ঠিক হল এখন আমরা রেস্ট নিব, এরপর বিকেলের দিকে মুনমুন ওর বাবাকে নিয়ে আসবে। তখন আমরা আমাদের প্ল্যানটা করে নিব কবে, কোথায়, কিভাবে আমরা দিল্লি দেখব।

এরই মাঝে বড়দি কয়েকবার খোঁজ নিয়েছেন আমরা ঠিকভাবে হোটেলে পৌঁছেছি কিনা। সন্ধ্যার পর মুনমুন ওর বাবাকে নিয়ে এলো এবং আলোচনার পর ঠিক হল পরের দিন সকালে আমরা বের হব দিল্লি দেখতে। আর সেই মোতারেক একটি গাড়ীও ঠিক করা হল। সকাল ৯টার মধ্যে গাড়ী হোটেলে চলে আসবে। আর আমরা প্রথম দেখতে যাব কুতুবমিনার।

পরের দিনযথা সময়ে ড্রাইভার দাস তাঁর গাড়ী নিয়ে চলে এলো। আর আমরাও রেডিই ছিলাম, তাই আর দেরি না করে গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী চললো দিল্লির আর.কে ফকরুল স্টেডিয়াম, মোঘল গার্ডেন হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর পাশ দিয়ে রাহুল গান্ধীর বাস ভবনের পাশ দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়ামের কাছ দিয়ে ইন্ডিয়া গেইট হয়ে কুতুবমিনারের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। এরপর গাড়ী পার্ক করে আমরা কুতুবমিনারে প্রবেশ করলাম। টিকিট জন প্রতি ১০ টাকা। মেইন গেইটের সিকিউরিটি চেকিং পার হয়ে আরও একটি গেইট পার হওয়ার পরই দেখা যায় নিপুণ হাতের গড়া দৃষ্টিনন্দন

বাগান যাতে আছে নাম না জানা অনেক বড় বড় গাছ। সামনে বিরাট এক ইন্দারা যার উপরে লোহার নেট দিয়ে ঢাকা। বাম পাশে তাকাতেই দেখা যায় বিরাট এক মিনার। আর এই সেই কুতুবমিনার যার উচ্চতা প্রায় ৭০.৮ মিটার। যার মধ্যে রয়েছে ৩৬২টি সিড়ি। মিনারের পাশে রাজা-রানীদের বসবাসের আবাসস্থল। বাগানের মধ্যে আছে সূর্যে ঘড়ি যেটি দ্বারা আগে সূর্যের আলোছায়ার উপর নির্ভর করে সময় নির্ধারণ করা হত। সেই সময়ের এই সূর্যো ঘড়ির সময় আর এখনকার আমাদের ঘড়ির সময় একদম এক। আছে রাজকর্মচারীদের থাকার জায়গা। আছে সেই আমলের অপরাধীদের জন্য জেলখানা। এখানে আরও একটি অর্ধ নির্মিত মিনার রয়েছে গেইট বরাবর ডান দিকে। কথিত আছে যে, কুতুবুমিনারের মত আরেকটি মিনার করতে চেয়েছিল, কিন্তু এক তলার বেশি এটি আর করতে পারেনি। যত বার এটি নির্মাণ করতে গেছে ততবারই কোন এক অজানা কারণে এর উপরের অংশটি ভেঙ্গে গেছে। আর তাই বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর এটি এই অর্ধনির্মিত অবস্থাতেই রেখে দিয়েছে। সামনের ইঁদারার মত ভেতরের দিকেও একটি ইদারা রয়েছে এবং একটি পুকুরও রয়েছে। যাতে সে সময় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হত। এর সবই পাথরের তৈরি। অবকাঠামোগুলো সাক্ষ্য দেয় তারা প্রজাদের উপর কতটুকু অত্যাচারিত বা প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। এখানে একটি গাছ আছে যে গাছটির ডালগুলি বেশ চিকন কিন্তু পাখির বাসার ন্যায় পুরো গাছটাকে গুছিয়ে মুড়িয়ে আছে। গাছটির নাম কেউ বলতে পারলনা। কিন্তু গাছটি দেখতে এত সুন্দর লাগছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

এখান থেকে বের হয়ে আমরা চললাম লোটাস ট্যাম্পল (বাহাই উপাসনালয়) দেখার জন্য যা সারা বিশ্বে মাত্র ৪টি আছে। এখানে কোন টিকিট কাটতে হয় না। সবার জন্য এটি উন্মুক্ত। মেইন রোডের সাথেই আনুমানিক ৭০/৮০ একর জায়গার মাঝে এটি অবস্থিত। ট্যাম্পলের গেইট পার হবার সাথে সাথেই রয়েছে সিকিউরিটি চেকিং। দূর থেকে এই ট্যাম্পলটি দেখতে ঠিক একটি আধা ফোঁটা সাদা পদ্মের মতই লাগে। সাদা শ্বেত পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে এটি নির্মিত। ট্যাম্পল পর্যন্ত যেতে যে রাস্তাটা রয়েছে তা খুবই সুন্দর পরিষ্কার, গোছানো একটি রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে রয়েছে সুন্দর বাগান যেখানে রয়েছে নানা জাতের ফুল আর রয়েছে কমলালেবুর গাছ। গাছের নিচে অনেক কমলা পড়ে আছে। সুবজ মাঠের উপর গাছ ভর্তি কমলা আর তারই নিচে এই ছোট ছোট কমলা গুলি পড়ে থাকতে দেখে যে কি ভাল লাগছে তা আমার এই লেখনীর মাধ্যমে বুঝানো যাবে না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এত এত মানুষ এখানে কিন্তু কেউ ভুলেও বাগানের ভিতর থেকে একটা কমলাও ধরে দেখছেনা। আস্তে আস্তে আমরা ট্যাম্পলের কাছাকাছি চলে এলাম। এখানে ছোট একটি ব্রীজের মত আছে। ব্রীজের পাশ দিয়ে নিচে নামলেই জুতা রাখার জায়গা। সেখানে জুতা রেখে একটা টোকেন নাম্বার দিয়ে দেয়। এরপর খালি পায়ে আস্তে আস্তে একের পর এক লাইন ধরে ট্যাম্পলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এখানে ওখানকার যে ভলেন্টিয়ার আছে তারা কিছু নির্দেশনা দেন ভিতরের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য। তারা বলেন এখানে যে যার ধর্ম অনুসারে এখানে প্রার্থনা করতে পারবেন। আর এখানে কোন নিয়ত করলে তা পূরণ হয়। এরপর দরজা খুলে দিলে আমরা সবাই একে একে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরটা খুবই সুন্দর সাদা শ্বেত পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি ঠান্ডা, শান্ত একটি পরিবেশ। বসার জন্য যে সিট রয়েছে তা এবং সামনের টেবিলটাও

সাদা পাথরের তৈরি যার ফলে বাহিরের এত গরমের পরও এখানে কোন ফ্যান বা এসি না থাকা সত্বেও বেশ ঠান্ডা। ট্যাম্পলের নিচে চারপাশে অনেকগুলো সুইমিং পুলের মত রয়েছে। যার পানিটাও বেশ ঠান্ডা। আর এই ঠান্ডা পানির জন্যেও এর চারপাশের পরিবেশটা বেশ শীতল একটা অনুভূতি দেয়।

লোটাস ট্যাম্পলের পর এবার আমারা রওনা হলাম হুমায়ূন টম্ব-এর দিকে। যথারীতি কিছু সময় পরই আমরা পৌঁছে গেলাম হুমায়ূন টম্ব। এখানেও জনপ্রতি ১০ টাকা করে টিকিট করে প্রথম গেইট পার হয়ে দ্বিতীয় গেইটে সিকিউরিটি চেকিং এর পর ভিতরে প্রবেশ করলাম। এই গেইটটি পাথরের খচিত এত সুন্দর কারুকার্য সম্পূর্ণ যে নিজ চোখে না দেখলে বুঝানো কঠিন। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এমন কোন জায়গা নেই যে জায়গায় মুসলিম নিদর্শনের কোন ছাপ নেই। এই গেইট পার হওয়ার পরই দেখা যায় দৃষ্টি নন্দন পানির ফোয়ারা। সমান সমান ১৬টি বাগান- যে বাগান গুলির পাশ দিযে এখন সমান রাস্তা করা আছে। বাগানে নানা জাতের ফুল আছে। মাঝখানে খুব সুন্দর ঘাস। ঘাস গুলো এত সুন্দর ভাবে ছাঁটা দেখলে মনে হয় যেন সবুজ রঙ-এর মখমলের চাদর বিছিয়ে রেখেছে। আর বাউন্ডারী ওয়ালের পাশ দিয়ে বৃহৎ বৃহৎ নানা প্রজাতির গাছ। এই রাস্তা ধরেই আমরা পৌঁছে গেলাম মূল ভবনে। টম্বটি বেশ উঁচু জায়গায়সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। এখানে ১৫০টি কবর রয়েছে। আর এর চারদিকে চারটি গেইট রয়েছে। যদিও মাত্র ২টি গেইট খোলা থাকে দর্শনার্থীদের দেখার সুবিধার জন্য। এর একটি দিয়ে প্রবেশ আর একটি দিয়ে বাহির হবার ব্যবস্থা। ভিতরেই রয়েছে সাদা পাথরের হুমায়ূনের কবর। প্রতিটা কক্ষেই রয়েছে নিখুঁত কারুকাজ। মূল ভবনের পশ্চিম পাশে আছে মসজিদ এবং পূর্ব পাশে মেহমানখানা যার প্রতিটি দেয়ালেই রয়েছে মুসলিম নিদর্শনের আদলে নিখুঁত কারুকার্য্য। কথিত আছে যে এই হমায়ূন টম্বের আদলেই শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছেন।

হুমায়ূন টম্ব থেকে বের হয়ে আমরা এবার রওনা হলাম আকশারামদ্দম মন্দির দেখার জন্য। আমাদের ড্রাইভার দাস যখন এই মন্দিরের কথা বলল তখন আমার মনে হচ্ছিল মন্দির দেখার কি আছে? কিন্তু যখন বলল মন্দিরটা খুব নামকরা আর খুব সুন্দর তখন মনে হল গিয়ে দেখিই না কেমন। বিশাল জায়গা নিয়ে মন্দিরটা অবস্থিত। আমাদের গাড়ি প্রথম গেইট পার হতেই ৩০টাকা পার্কিং চার্জ দিয়ে গাড়িটি পার্ক করিয়ে জনপ্রতি ১৫টাকা টিকিট করে ভিতরে প্রবেশ করার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। অনেক বড় লাইন। আর এখানে টাকা পয়সা ছাড়া বাহির থেকে কোন খাবার এমনকি মোবাইলটা পর্যন্ত সাথে নিয়ে ভিতরে যাওয়া যায় না। এই কড়া চেকিং-এর পর অবশেষে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন ঠিক দুপুর বেলা। দুপুরের খাবারের সময়ও হয়ে গেছে। ড্রাইভার দাস জানালোএখানে খুব ভাল মানের খাবারের ব্যবস্থা আছে। তাই আমরা এই মন্দিরেরই ভিতরে যে রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে গেলাম। এখানে ভারতের সব প্রদেশের খাবারই আছে। আর একেকটা প্রদেশের খাবার একেকটা থালি হিসেবে সার্ভ করা হয়। একটি থালে প্রায় ৫-৬ টা পদ থাকে। আমরা সাউথ ইন্ডিয়ান থালা অর্ডার করে এর স্লিপটা নিয়ে ভিতরে গেলাম। প্রতি থালা ১৩৮ টাকা আর সাথে আছে ভ্যাট

১৭ টাকা, মোট ১৫৫ টাকা। এই স্লিপটা নিয়ে কাউন্টারে দিতেই তারা থালি সার্ভ করল। যাতে ছিল জিরা পোলাও, রুটি, পাপড়, ডাল, মটর পনির, চাটনি, মিস্টি, টকদই। দুপুরের খাবারটা সেরে আমরা এবার বের হলাম মন্দিরটা দেখতে। স্বামী নারায়ণ-এর জীবনীর উপর কেন্দ্র করেই মূলত এই মন্দিরটা নির্মিত। ছোট সময় তাঁর নাম, ডাক নাম ছিল গানসাম। স্বামী মহারাজ ৮/১১/২০০০ সালে এই মন্দিরটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মুল মন্দিরটি ২৮৫ ফুট লম্বা, ২২৫ ফুট প্রস্থ এবং ১৫ ফুট গভীরতায়। মন্দিরটা তৈরি করতে ৫ বছর সময় লাগে। ৬/১১/২০০৫ সালে মন্দিরটার কাজ শেষ করে উদ্বোধন করা হয়। ১০০ একর জমি নিয়ে এই মন্দিরটা নির্মিত। মন্দিরের চারদিক সমান। এখানে মোট ১০টি গেইট আছে। এই গেইটগুলো আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন ভক্তি দোয়ার, মরুর দোয়ার, ফুট প্রিন্ট এরকম নানা নামে গেইট গুলোর নামকরণ করা হয়েছে। আর প্রতিটা গেইটের নামের সাথেই প্রতিটা গেইটের মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। মূল মন্দিরটা শ্বেত পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। মন্দিরের এক পাশ দিয়ে শুধু মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা। এই রাস্তা টুকু ছাড়া বাকি জায়গা জুড়ে রয়েছে পানির লেক। এই লেকের দেয়ালের পাশ দিয়ে বড় বড় হাঁস, গরু, মহিষ, সিংহ, বাঘের মাথার প্রতিকৃতি বানানো। এই সব প্রাণির মুখ দিয়ে অনর্গল লেকে পানি পড়ছে। মন্দিরের দেয়ালের ভিতরে এবং বাহিরে শত শত দেব-দেবীর বিভিন্ন সাইজের প্রতিকৃতি পাথরের মধ্যে খোদাই করা। আরো আছে হাতি, বাঘ, সিংহের প্রতিকৃতি। এবার ভিতরে যাবার পালা। ভিতরে গম্বুজটা অনেকটা হুমায়ূন টম্বের আদলে করা। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। কিছু রয়েছে খোদাই করা। আমাদের জানালো যে এ মুর্তি গুলো সোনা দিয়ে তৈরি। এখানে সকল প্রকার ধর্মের লোক প্রবেশ করতে পারে। এতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। এই মন্দির প্রাঙ্গনে বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলী এমন ভাবে তৈরি করা যে আমি আমার লেখনীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারব না। যে দিকে চোখ যায় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। এখানে একটি পুকুর আছে যাতে সন্ধ্যার পর মিউজিকের সাথে সাথে পানির খেলা দেখানো হয় (যদিও সময়ের কারণে আমরা এটি দেখতে পারিনি)। তাঁর ঠিক সামনেই রয়েছে নিলকান বার্নির ২৭ ফুট উচ্চতার একটি পাথরের মূর্তি। এই মূর্তিটি দেখলে মনে হয় যেন এটি এখানে দাঁড়িয়ে পানির এই খেলা দেখছে। মন্দিরের পিছনে একটি ঘর আছে যা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এখানে একটি বিষ্ণু মুর্তি আছে যা প্রায় আড়াই থেকে তিন ফুট উচ্চতার। এটি সোনা দিয়ে তৈরি। আসলে সব মিলে খুব সুন্দর একটি জায়গা যা নিজ চোখে না দেখলে কাউকে বুঝানো কঠিন। এদিকে সময় শেষ হয়ে আসছে। তাই এখানে আর দেরি না করে আমরা রাজঘাটের উদ্দেশ্যে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলাম। যমুনা নদীর পাড়ে এই রাজঘাট অবস্থিত। রাজঘাট কেন নামকরণ করা হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয় যেহেতু এই জায়গায় ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং কিছু বীরযোদ্ধাদের শেষকৃত্য সম্পাদন করা হয়েছে বলেই হয়তো রাজঘাট নামকরণটি করা হয়েছে। বিশাল জায়গা জুড়ে নানা জাতিয় ছোট বড় গাছের সমাহার ঘটিয়ে, দৃষ্টিনন্দন সব ফুলের মাঝে, নয়নাভিরাম সবুজের মাঝে গোল দেয়ালের বেস্টনির মধ্যে সারাক্ষণ অগ্নি প্রজ্বলিত রেখে তার পাশে মহাত্মা গান্ধীর দাহ করার স্থানটিকে প্রতিদিন সুবাসিত তাজা ফুলের ডালা সাজিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। এত সম্মান, এত শ্রদ্ধা যা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এরপর মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ধরে বেশ

কিছুদূর যাওয়ার পর রয়েছে রাজীব গান্ধীর দাহ স্থান এবং এইস্থানের পাশের একটি পাথরের দেয়ালে রাজীব গান্ধীর একটি বাণী লেখা আছে। লেখাটি হল-"আসুন গড়ে তুলি এক ভারত, স্বাধীনতা যার গর্ব, স্বাধীনতা রক্ষায় যে শক্তিশালী, কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তিতে যে সবল স্বনির্ভর অগ্রণী জাতি, ধর্ম, অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ; দারিদ্র এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক আমাদের শৃংখলা মুক্ত, সুশৃংখল ও সুদক্ষ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ পৃথিবীতে শান্তির এক নির্ভিক সৈনিক' -রাজীব গান্ধী। এরপর আরেকটু সামনে গেলে দেখা যাবে ইন্দিরা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু সহ বেশ কিছু ভারতীয় বীর সেনাদের দাহ স্থান। আর দাহ স্থানের চারি দিকে ফুলে, ফলে ও সবুজের সমাহারে এত শান্ত, মনোরম পরিবেশ যে সময় এখানে কিভাবে পার হয়ে যায় তা বুঝাই যায় না। রাজঘাটে রাজহাঁস না থাকলে কি হয়? তাহলে তো এর নামের সাথে মিল থাকলোনা। তাই এই শ্মশান ঘাটে যে লেক আছে তাঁর মধ্যে ধব ধবে সাদা, বড় বড় অনেকগুলি রাজহাঁস দেখতে পাওয়া যায়। লেকের মাঝে বড় বড় পাথর আছে। রাজহাঁস যখন ঐ পানি থেকে পাথরের উপর উঠে ওদের পাখা থেকে পানি ঝারানোর জন্য দুই পায়ে দাঁড়িয়ে বুক টান করে পাখা ঝাপটায় তখনি যে কি সুন্দর লাগে দেখতে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন। এদিকে সময় এর নিয়ম মত বয়ে চলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো তাই আমাদেরও এবার এখান থেকে বের হতে হবে। যদিও মনটা বারবার চাচ্ছিল আরো কিছুটা সময় এই শান্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে কিন্তু সময়ের কাছে আমরা সবাই বাঁধা। তাই আর দেরি না করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম। আর বারবার আমার মনে হচ্ছিল যে ভারতবাসী তাদের নেতাদের যেমন সম্মান করতে জানে ঠিক তেমনি এই নেতারাও আজ মরেও সবার মাঝে অমর হয়ে আছেন এবং এখনও তারা মানুষের সেবায় জড়িয়ে আছেন কারণ এই নেতাদের শ্মশান ঘাট দেখতে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসছে এবং এই সুবাদে এখানে কিছু খাবারের দোকান, কিছু উপহারের দোকান, নেতাদের জীবনী নিয়ে কিছু বইয়ের দোকান গড়ে উঠেছে যার ফলে বহু বেকার লোকের কাজের জায়গা হয়েছে। কাজেই সম্মানিতদের সম্মান করলে যে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এটি তারই একটি প্রমাণ। আমরা দিল্লি গেইট, প্রেসিডেন্ট ভবন, মোঘল গার্ডেনের পাশ দিয়ে আমাদের হোটেলে এসে পৌঁছলাম। এর কিছুক্ষণ পরই মুনমুন তার বাবাকে নিয়ে আমাদের রুমে চলে এলো। আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম কাল একটু রেস্ট নিয়ে পরের দিন আবার বের হব দিল্লি দর্শনে।

পরের দিন আমরা হোটেলেই কাটালাম। শুধু আমি দুপুরের খাবারের পর বেলা ৩টার দিকে একা বের হলাম শহরটা দেখতে। ফুটপাত ধরে হাঁটা শুরু করলাম। এখানের ফুটপাতগুলো বেশ সুন্দর। এখান দিয়ে সারাদিন হাঁটলেও ক্লান্তি আসে না। কারণ ফুটপাতগুলোর পাশ দিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো। যে গাছগুলি যাত্রীদেরকে ডালপালা প্রসারিত করে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে যার ফলে রৌদ্রের প্রখরতা ফুটপাতের উপর দিয়ে হাঁটা যাত্রীদের স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার জন্য পুনরায় সে জায়গায় ফিরে আসা বেশ কষ্টকর। কারণ সব রাস্তাই প্রায় একই রকম। তাই অবশ্যই খেয়াল করে চলতে হবে। তারপরও যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে পুলিশ বা কোন ট্যাক্সি চালকের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া অন্য কেউ এখানে কাউকে সাহায্য

করবেনা। কারণ দিল্লির মানুষ তাদের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্যের জন্য এক মিনিট সময়ও তাদের নেই। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে আমি হোটেলে ফিরে এলোম। এসে দেখি মুনমুন-এর বাবাও এরই মাঝে চলে এসেছেন। উনার সাথে আলোচনা করে অবশেষে ঠিক হলো আমরা আগামী দিন যেসব জায়গা দেখা বাদ আছে সেসব দর্শনীয় স্থান দেখতে যাব। আর এর মাঝে তারা আমাদের কলকাতা ফিরার টিকিটও করে দিয়েছেন ২২/০২/১৪ তারিখে রাজধানী এক্সপ্রেস। আর দিল্লি ছেড়ে যাবার আগে একবার তাদের বাসায় যাবার জন্য দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন কথা মতন সকাল সকাল গাড়ি এসে হাজির। আর আমরাও দেরি না করে বের হয়ে গেলাম। প্রথমে গেলাম ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়্যামে। এখানে উনার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষণ করা আছে। বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রী, ছবি, উনার ব্যবহৃত জিনিস পত্র, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী যে পোশাক পরে মারা গেছেন সে সব ব্যবহৃত জিনিস, ইন্দিরা গান্ধীর বেড রুম, ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম সব যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই রাখা শুধু দর্শনার্থীদের দেখার সুবিধার জন্য। দেয়ালগুলো কাঁচ দিয়ে ঘেরা। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাসার সামনের যে জায়গায় নিহত হয়েছেন সে রাস্তাটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। আজো দুই জন গার্ড এই রাস্তা রুটিন করে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন।

এরপর আমরা গেলাম দিল্লির লাল কেল্লা দেখতে। আমরা যখন ওখানে পৌঁছলাম তখন এর সামনে দিল্লি পুলিশের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল। আমরা টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এটি খুবই সুন্দর একটা কেল্লা। এটি লাল পাথরের তৈরি। এর সুউচ্চ দেয়ালের চারপাশে পানির লেক। প্রথম গেইট থেকে দ্বিতীয় গেইট পর্যন্ত বেশ কিছু জায়গা। এখানে সেই আমলেও বাজার বসতো। আর এই প্রথা অনুসারে এখনো এখানে বাজার বসে। যেখানে নানা রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। কেল্লার ভিতরে একটি মিউজিয়াম ও একটি মসজিদসহ বিভিন্ন রকমের স্থাপনা রয়েছে। তার প্রতিটি স্থাপনাই বিভিন্ন রকমের কারুকার্য করা সাদা পাথরের তৈরি। কেল্লার মাঝখানে খুব সুন্দর সুন্দর বাগান আছে যাতে আছে নানা জাতের গাছ ও ফুলের বাগান। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন কেল্লার বেশির ভাগ জায়গায় চলছিল মেরামতের কাজ তাই ওখানে বেশিক্ষণ সময় না থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এদিকে আছরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে এসেছে, আর জামে মসজিদটাও কাছেই তাই আর দেরি না করে আমরা জামে মসজিদে গিয়ে আছরের নামাজ আদায় করে আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম যে আল্লাহপাক আমাদের দিল্লির এই বিখ্যাত জামে মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন বলে। মসজিদটির এরিয়া অনেক বড়। উঁচু মসজিদের সামনে অনেক বড় মাঠের মত খালি জায়গা। আর তার ঠিক পিছনে রয়েছে একটি পুকুরের মত। যার পানি খুব ঠান্ডা। এই পানি দিয়ে মুসুল্লিরা ওজু করে নামাজ আদায় করেন। খালি জায়গাটার চারপাশে বারান্দা আছে। অনেক মহিলারাও সেই মসজিদে তাদের নামাজ আদায় করে নিচ্ছেন। মাঠের মতন খালি জায়গাটার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি বড় বড় গেইট আছে। সেখান দিয়ে দর্শনার্থী এবং নামাজীরা আসা-যাওয়া করেন। এবার এখান থেকে আমরা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা

হলাম। মাজার পৌছাতেই মাগরিবের আজান হয়ে গেল। তাই এখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করে মাজার জিয়ারত করে পরম করুনাময় আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম এই কারণে যে আজ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই আমি আমার পরিবার নিয়ে এই সুদূর দিল্লি পর্যন্ত আসতে পেরেছি। মাজারের পশ্চিম পাশেই অনেক বড় এবং দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত একটি মসজিদ এবং দক্ষিণ দিকে আছে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গী-সাথী সহ আরো অনেক আউলিয়া দরবেশদের কবর। উত্তর পাশে আছে খুবই গভীর মাঝারি মানের একটি পুকুর। পুর্ব পাশে বিভিন্ন রকমের দোকান। যেখানে হাজার হাজার লোকের রুজি রুটির ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে মূল মাজারের ভিতরে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। গাইড না নেয়াতে আর বেশি কিছু জানার সুযোগ না হওয়ায় মাজার জিয়ারত শেষ করে রাত্রি হয়ে যাওয়ার আর কোন দিক না গিয়ে সোজা হোটেলে চলে এলাম।

পরেরদিন সকাল ১০টার মধ্যে হোটেল ছেড়ে আমরা মুনমুনদের বাসায় গেলাম। বাসাটি সরকারি কোয়ার্টার। সেখানে ওরা সাবলেট থাকে। সারা দিন বিভিন্ন রকমের খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডার পর বিকেলে একটু মার্কেটিং করে বাসায় এসে আমরা আস্তে আস্তে স্টেশনে যাবার জন্য তৈরি হলাম। ওদের বাসা থেকে স্টেশন একটু দূরে তাই ঠিক হলো আমরা মেট্রো রেলে করে স্টেশন যাব। মেট্রো স্টেশনটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পন্ন, বেশ সুন্দর। আমরা টিকিট নিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকলাম। প্রতি ২.৪০ সেকেন্ড পর পর ট্রেন আসছে। ৩০-৪০ সেকেন্ডের মধ্যে যাত্রী উঠা-নামা শেষ করতে হবে। ট্রেনের সব কিছুই অটো। গাড়ী থামার সাথে সাথে অটোমেটিক দরজা খুলে যাবে এবং অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে ট্রেন চলতে শুরু করে। এই অল্প সময়ে উঠা নামা করতে কোন সমস্যা অবশ্য হয় না কারণ এখানে সবাই এই ভাবে অভ্যস্ত। যার যার গন্তব্য আসার আগেই ট্রেনের উপর সেই স্টেশনের নাম লেখা উঠে। তাই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে হয় না। আমরা ৪/৫টা স্টেশন পার হয়ে দিল্লী রেল স্টেশন এরিয়া এসে পৌঁছলাম। যথা নিয়মে দ্রুত নেমে গেলাম। উপরে উঠার জন্য চলন্ত সিঁড়ি আছে। আমরা আমাদের লাগেজ নিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মেট্রো স্টেশন থেকে বের হয়ে এলাম।

রেল স্টেশন এখান থেকে খুব কাছে। আর আমাদের টিকিটও যেহেতু আগে থেকেই কাটা আছে তাই আর কোন আসুবিধা হল না। শুধু আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দেয়ার জন্য যারা এসেছিল তারা প্লাটফর্ম টিকিট করে আমাদের সাথে স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করল। আমরা ট্রেনে গিয়ে উঠলাম, আর অল্প সময়ের মাঝেই ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু এই ট্রেন ছাড়তেই বুঝতে পারলাম এই অল্প দিনের পরিচয়ে তাদের সাথে আমাদের কতটা আন্তরিকতা হয়ে গিয়েছে। আর তাই এই বিদায় বেলায় আমরা কেউই আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। এর থেকেই বুঝা যায় মন কোন জাত-ভেদ মানে না। আমরা দিল্লি ছেড়ে চলে এলাম। হয়তো আর কখনো যাওয়া হবে না। কিন্তু এই স্মৃতিগুলো মনের মণিকোঠায় রয়ে যাবে সারা জীবন।

রম্য রচনা

প্রবীণদেরও রয়েছে সুস্থ,
সুন্দর ও কর্মময় জীবনের অধিকার।

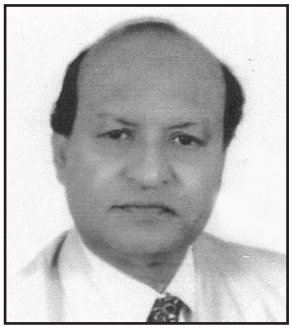

হাসতে মানা

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম
আজীবন সদস্য নং-৯৫৫
কেন্দ্রীয় সমিতি, ঢাকা।

মানুষের জীবনটাই এমন যে বেশীর ভাগ সময়ই দুঃখ কষ্ট, অভাব, অনটন, নানা বিধ দূর্গতির মধ্যেই কেটে যায়। তাঁর মাঝে যদি একটু আনন্দের সময় পাওয়া যায় তাহলে বেশ ভালোই লাগে। তাই আজ আমার প্রয়াস থাকবে যে কয়েকটি চুটকি পরিবেশন করে আপনাদের একটু আনন্দ দেওয়া।

আপনাদের নিশ্চয়ই সেই Absent Minded Professor ওর কথা মনে আছে। ঐ টাইটেলের একটি সিনেমাও হয়েছিলো হয়ত বা অনেকেই দেখে থাববেন। তেমনি এক ভূলো মন অধ্যাপকের কথা শুনুনঃ

১। ঐ অধ্যাপক ক্লাসে জীব বিজ্ঞান পড়ান। যেদিন ব্যঙের Dissection করার কথা। অধ্যাপক ক্লাসে এসেছেন এখনই Dissection আরম্ভ হবে। কাজেই Apron এর পকেট থেকে লম্বা একটা বলপেন এবার আমি একটা ব্যাঙ কেটে দেখাব যে তাঁর হৃৎপিন্ডটা কিভাবে চলে। এই বলে কৌটা খুলে যে বস্তুটা বের করলেন তা দেখে ক্লাসের ছেলে মেয়েরা হৈ চৈ করে উঠল এবং বললো স্যার মতো ব্যাঙ নয় এ তো খাবার। বের করতে ঘামতে ঘামতে অধ্যাপক তাঁর Apron এর অন্য সব পকেট হাতড়ে অন্য আর একটি কৌটা বের করে আনলেন। এবং দেখা গেল তাঁর মধ্যে কিছু নেই একদম ফাঁকা। অধ্যাপক তখন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তাইতো খাবার সময় তখনই কেমন যেন লাগছিলো তাইতো তা হলে টিফিন করলাম কি দিয়ে? তাই তো।"

২। আরেকজন ভুলোমনা অধ্যাপক তাঁর ক্লাসের ছাত্রদেরকে তাঁর লেখা একটা বই পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছাত্ররা অনেক খোঁজ করেও কোন লাইব্রেরীতে বইয়ের দোকানে ঐ নির্দিষ্ট বইটি না পেয়ে অধ্যাপককে বিষয়টি জানোলন- অধ্যাপক অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকিয়ে বললেন, "ও তাইতো ঐ বইটি তো আমার এখনও লেখাই হয়ে উঠেনি"।

৩। অন্য একজন ভুলোমনা অধ্যাপক তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীর পাতা ওলটাচ্ছিলেন যেখানে বহু লোকের নাম, ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি লেখা আছে। হঠাৎ একটা নাম ঠিকানা দেখে তাঁর চেনাচেনা মনে হলো কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলে না লোকটা কে? অধ্যাপকতো মহাসমস্যায় পড়লেন ভাবতে লাগলেন হয়তারো ঐ ভদ্রলোকের তাঁর কাছে কিছু দরকার ছিলো। হয়তবা ভদ্রলোক তাঁর কাছে কিছু চেয়েছিলেন কিন্তু অধ্যাপক কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। অনেক ভেবেচিন্তে

তিনি ঐ নাম ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, "আপনাক আমি ঠিক চিনতে পারছিনা" কিন্তু আমার ডায়েরীতে আপনার নাম, ঠিকানা লেখা আছে। আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি কয়েকদিনের মধ্যে ঐ চিঠির উত্তর এলো যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। ভদ্রলোক উত্তরে লিখেছেন,

"প্রিয় অধ্যাপক, আপনার চিঠি পেয়ে ধন্য হলাম। আমার জন্যে আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব আপনি সবই করেছেন। আপনি আমার প্রাক্তন স্ত্রীর স্বামী। তাকে বিবাহ করে আপনি আমাকে ভারমুক্ত করেছেন। আপনাক অশেষ ধন্যবাদ।"

এখন দুটো চিঠির কথা লিখবো। প্রথমটি এক ভদ্রলোক ধরা যাক মি. এক্স লিখেছেন এক ভদ্রমহিলা মিসঃ ওয়াই এর কাছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির জবাব অর্থাৎ এক্স কে ওয়াই এর উত্তরঃ মিঃ এক্স লিখেছেন "প্রাণের ওয়াই, গতকাল অনেক রাতে Party এর শেষে সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্থাব দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে। কিন্তু আজ সকালে কিছুতেই মনে করতে পারছিনা তুমি আমাকে "হ্যা" বলেছিলে না কি না বলেছিলে? যদি পত্র পাঠ দয়া করে জানাও তাহলে আমার মনের অনেক অস্বস্থি দূর হয়।"

অতঃপর ওয়াই এর জবাব- "প্রিয় এক্স, তোমার চিঠি পেয়ে একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বারবার আমার মনে পড়ছিলো কাল রাতে পার্টির শেষে কে যেন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো এবং আমি সেটা নাকচ করে দিয়েছিলাম। এখন তোমার চিঠি পেয়ে এবং পড়ে খেয়াল হচ্ছে তুমিই প্রস্তাব দিয়েছিলে আর আমি সেটা নাকচ করেছিলাম। আমি কিছুতেই কাকে না বলছিলাম তা স্মরণ করতে পারছিলাম না। তোমার। চিঠির জন্য ধন্যবাদ। ইতি ওয়াই"

৫। একজন ভুলোমনা সার্জন নামজাদা শল্য চিকিৎসক বাড়ীতে বসে বইয়ের পাতা উল্টালিচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে হঠাৎ সার্জন সাহেব ছুরি দিয়ে একটা পাতা কেটে ফেললেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি হলো?" সম্বিত ফিরে পেয়ে সার্জন জবাব দিলেন, "ভুল হয়ে গেলো ঐ পাতায় দেখলাম Appendix লেখা রয়েছে আমি Appendicitis এর case ভেবে ভুল করে ছুড়ি দিয়ে কেটে রাখলাম এতো ভারি গোলমাল হয়ে গেলো।"

৬। স্বামী স্ত্রীর নতুন বিয়ে হয়েছে। মধু চন্দ্রিমায় বাইরে যেয়ে উঠেছেন একটি হোটেলে। ঐ জায়গাটা আবার মশার উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত। রুমে ঢুকতেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তাদের ঘিরে ধরলো। তখন স্বামী পরামর্শ দিলেন এসো আমরা চটপট আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। তাহলে মশাগুলো অন্ধকারে দেখতে পাবে না এবং কামড়াতেও পারবে না। সাথে সাথে ঘর অন্ধকার করে বাতি নিবিয়ে দিয়ে দুজনে শুয়ে পড়লো। বাইরে তখন দলে দলে থোকায় থোকায় জোনাকী জ্বলছে। দুঃখের কথা স্বামী-স্ত্রী কখনই জোনাকি দেখেননি। তাই জোনাকি দেখে অবাক হয়ে স্বামী-স্ত্রীকে বললেন "আলো নিভিয়ে কোন লাভ হলো না- মশাগুলো এখন টর্চলাইট নিয়ে আসছে আমাদের খুজে বের করতে"।

৭। একদিন এক সরল প্রকৃতির মফঃস্বলী ভদ্রলোক শহরের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে এসেছেন। তিনি কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে হলের প্রবেশদ্বারে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার কাউন্টারে

ফিরে এসে নতুন করে একটি টিকিট নিলেন এই ভাবে বেশ কয়েকবার নতুন টিকেট নেওয়া ও হল গেইট থেকে ফিরে আসা- দেখে কাউন্টার এর টিকিট বিক্রির লোকটি বললেন, "দাদা আপনার কয়টা টিকিট দরকার? তা একবারে না কিনে কেন বারবার আসা যাওয়া করছেন? উত্তরে ক্রেতা জানালেন, "আমার তো একটা টিকিটই দরকার কিন্তু কোথাকার এক পাগলা লোক হলে ঢুকবার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেই না আমি টিকিট নিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি ঐ লোকটা টিকিট নিয়ে দু টুকরা করে দিচ্ছে। সেই জন্যে আমি বারবার নতুন করে টিকিট কিনতে আসছি।" এর পর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "এত ঝামেলা জানলে আমি কখনই সিনেমা দেখতে আসতাম না"।

৮। মাইক্রোবাস যোগে কয়েকজন বন্ধু ঢাকা থেকে ময়নামতিতে বেড়াতে যাচ্ছেন। পথে গাড়ী দেখলেই ড্রাইভারকে সাইড দিতে বলছেন। ড্রাইভারও যথারীতি সাইড দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ হৈ চৈ চিৎকার গাড়ী খাদে পড়ে গেছে। ড্রাইভারকে গালাগালী, ড্রাইভার অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করে বললেন, "আপনারা বারে বারে সাইড দিতে বলছেন তা সামনে একটা ব্রিজ দেখে ভাবলাম সাইড না দিলে আবার বকা খেতে হবে ঐ জন্য তো ব্রিজকে সাইড দিতে গিয়েই তো এই বিপত্তি। এখন বলুন স্যার আমার কি অপরাধ?"

৯। একবার হলো কি রানাঘাট ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি জমিদার ও বিখ্যাত একজন মানুষ। তাঁকে দেখামাত্র তাঁর পদধূলি নেয়ার জন্য অনেক লোকের ঝাপিয়ে পড়বার কথা। দূর্ভাগ্য কেউ তাকে চিনতে পারছিলেন না। তখন তিনি একজন লোকের কাধে চোপড় দিয়ে বললেন ওহে আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকটি পাশের একটি লোকের দিকে ফিরে বললেন, "আমাদের অনেকেরই অর্শ আছে। তাই বলে এমন জাহির করে বেড়াই না। "

১০। শয়তানের পেঁচানো বুদ্ধির কাজ মানুষ তো মানুষ স্বয়ং আল্লাহ পর্যন্ত নিরুপায় যা নিচের কৌতুক থেকে বুঝা যায়ঃ

স্বর্গ আর নরকের মাঝখানে একটি পাঁচিল দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু একদিন আল্লাহ লক্ষ করলেন যে ঐ পাঁচিলের একটা অংশ কে যেন ভেঙ্গে ফেলেছে। আল্লাহ বুঝলেন এটা শয়তানের কাজ। কাজেই উনি শয়তানকে ডেকে এনে বললেন, "এবারে আমি পাচিল সারিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ভবিষ্যতে এমনটি আবার হলে তুমিই তা সারিয়ে দিবে।" শয়তান রাজি হয়ে চলে গেলো দুদিন পরে আবার এখন অবস্থা ঐ। পাচিল আবারও ভাঙ্গা। তখন আল্লাহ শয়তানকে আবার বললেন, "এবার পাচিল সারিয়ে দাও।" কিন্তু শয়তান তা করতে অপরাগতা জানোলো। তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবো। শয়তান জবাবে বললো, "পারবেন না।" আল্লাহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেনো পারবোনা? শয়তান জবাবে বললো, "আপনি তো কোনও উকিল পাবেন না। কারণ সব উকিল তো আমার সাথে নরকে আছে।"

11. Congratulating her son in his engagement mother wrote what

glorious news your father and rejoice in your happiness. It has long been our greatest wish that you should marry a good woman because a good woman is heaven s most gracious gift to man.

Then there was a post script in a different hand writing in your mother has gone for a stamp keep single you young fool.

পরিশেষে বলা যায় একটা ছোট্ট চুটকি দিয়ে এবারের মতন লেখা শেষ করছি। বাঁদর ছেলেটা কিছু পড়তে দিলেই পৌছে যায় সেই মিষ্টি সন্দেশে।

তাকে একং দশং পড়তে দেওয়া হয়েছে। সে পড়ছে

একং, দশং, শতং, সহস্র, অয্যুত, নিযুত, লক্ষী, স্বরস্বতী, গণেশ কার্তিক অগ্রহায়নে পৌষ মাঘ ছেলে পিলে জ্বর সর্দি কাশি মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া পুরীসন্দেশ, রসগোল্লা বোঁদে, গজা, লেডিকিণি।

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রমের ছবি

জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সমিতির সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম।

জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর।

কেন্দ্রীয় সমিতির মহাসচিব কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান।

কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা- ২০১৭ এ দর্শকদের একাংশ।

নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষমান সদস্যদের একাংশ।

বার্ষিক সাধারণ সভা- ২০১৭, দর্শক শ্রোতাদের একাংশ

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রমের ছবি

বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে ভোট চলাকালীন সময়ে কর্মরত অফিস স্টাফদের কয়েকজন।

২০১৮ এর নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী পরিচিতি সভা। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. শেলীনা আফরোজা পি.এইচ.ডি ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দ।

২০১৮-এর নির্বাচনকালীন ভোট প্রদানের জন্য লাইনে দাঁড়ানো সদস্যগণ।

কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৭, মঞ্চে উপবিষ্ট সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ।

বার্ষিক সাধারন সভা-২০১৭ দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ।

নির্বাচনের ভোট প্রদানের জন্য লাইনে দাঁড়ানো সদস্যগণ।

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রমের ছবি

নির্বাচনী প্রার্থী পরিচিতি সভায় জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা বক্তব্য রাখছেন।

কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী জনাব ফেরদৌস আরা।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী ফাহামিদা নবী ও বাদশা বুলবুল।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনা করছেন শিল্পী ফাহামিদা নবী।

কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রমের ছবি

জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন নোয়াখালী জেলার চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ রফিক উল্লাহ।

জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্যরত নীলফামারীর চেয়ারম্যান জনাব এ.টি.এম মুজিবুর রহমান।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত উপভোগ করছেন সমিতির সদস্যগণ।

জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্যরত জনৈক জেলা প্রতিনিধি।

জেলা শাখা সমিতির কার্যক্রমের ছবি

কক্সবাজার জেলা শাখার কর্মকর্তাদের সভায় মন্ত্রীপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম। পাশে উপবিষ্ট সাবেক চেয়ারম্যান পাবলিক সার্ভিস কমিশন জনাব ইকরাম আহমেদ।

জেলা ফেনী ঃ শিক্ষাবৃত্তি, অনুদান ও জরুরী চিকিৎসা ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান।

কুমিল্লা জেলা শাখার ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে উপস্থিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বরগুনা জেলা ঃ বার্ষিক সাধারন সভায় ভাষণ দিচ্ছেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান।

শিক্ষা বৃত্তি, অনুদানের অর্থ বিতরণ করছেন জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন, জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ খায়রুল আলম সেখ -এর সাথে পিরোজপুর শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

জেলা শাখা সমিতির কার্যক্রমের ছবি

ফরিদপুর জেলা প্রশাসক জরুরী চিকিৎসা, এককালীন অনুদান ও শিক্ষাবৃত্তির টাকা বিতরন করছেন।

মৌলভীবাজার জেলা শাখার ২০১৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলা কর্মকর্তাবৃন্দসহ জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম।

দিনাজপুর জেলা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন।

নাটোর জেলা শাখার চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার আলী আকতার সাধারণ সভার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন।

জেলা নোয়াখালী ঃ বার্ষিক সাধারন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন জেলা শাখার চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ রফিক উল্লাহ।

কুষ্টিয়া জেলা শাখার ২০১৮-২০১৯ মেয়াদে দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া।

জেলা শাখা সমিতির কার্যক্রমের ছবি

নরসিংদী জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল বক্তব্য পেশ করেন।

নুসরাত রুবাইয়াত এর হাতে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন জেলা প্রশাসক নড়াইল।

বরিশাল জেলা শাখা সমিতিতে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর।

জেলা সিরাজগঞ্জ ঃ শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সমিতির সাবেক যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ জনাব আলী কবির হায়দার।

জেলা প্রশাসক গাজীপুর জনাব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন।

জেলা চুয়াডাঙ্গা ঃ বার্ষিক সাধারন সভা মঞ্চে উপবিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়,অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি- শাখা
www.nof.gov.bd

০১.০২.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩,১৩-০৮ তারিখ ঃ-------------------------
১৯.১০.১৪২২ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

প্রচলিত বিধান মতে সরকারি পেনশন স্কীমের আওতাধীন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ও পারিবারিক পেনশনভাগীণ মাসিক নীট পেনশনের সমপরিমান বছরে ০২ (দুই) টি উৎসব ভাতা প্রাপ্য। ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ ১০০% পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হতেন উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রতি বছরে দুইবার উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্যতা সম্পর্কে অর্থ বিভাগের ০৮/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/বিধি-১চাঃ বিঃ-৩/২০০৪/১০২ সংখ্যক পরিপত্র, ২৪/০৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/বিধি-১চাঃ বিঃ-৩/২০০৪/৯৯ সংখ্যক পরিপত্র ও ২৪/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৪১ সংখ্যক অফিস স্মারকে উল্লেখ রয়েছে।

২। বিষয়টি আরও স্পষ্টীকরণকল্পে উলেখ্য, ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ ১০০% পেনশন সমর্পন না করলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্ত হতেন উক্ত পরিমাণ অর্থ ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ এবং প্রচলিত বিধান মতে পারিবারিক পেনশন ভোগীগণ প্রতি বছরে দুইবার উৎসব ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। কারো ক্ষেত্রে যদি এ ভাতা অনুত্তোলিত/বকেয়া থেকে থাকে তা হলে, প্রথম পরিপত্রে উলিখিত কার্যকারিতার তারিখ অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে পেনশনার/পারিবারিক পেনশনার উক্ত বকেয়া প্রাপ্য হবেন।

২। ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ এবং প্রচলিত বিধান মতে পারিবারিক পেনশনভাগীগণ সাধারণ পেনশনারদের ন্যায় নির্ধারিত হারে মাসিক চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হবেন।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

৪। এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশ সমূহের ধারাবাহিকতায় জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মো. শাহজাহান)
যুগ্ম সচিব
(পরিচিতি নং-৪১৪৪)
ফোন : ৯৫৪৫১৭৪
E-mail : shahijahanmail@yahoo.com

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

শতভাগ পেনশন সমর্পনকারীদের পরিবারের সদস্যবর্গও উৎসব ভাতা সুবিধা পাবেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রবিধি-১ শাখার সহকারী সচিব জনাব মা. সিরাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ১১/০৭/২০১৬ইং তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২ নং স্মারকে উল্লিখিত সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত মতে যারা শতভাগ পেনশন উত্তোলন করে নিয়েছেন তাদের স্ত্রী/স্বামী পারিবারিক ভাবে, সংশিষ্ট পেনশনধারীর মৃত্যু হলে, তাঁর মতই সুযাগে সুবিধা প্রাপ্য হবেন। যদি কারোর প্রাপ্য অর্থ ০১/০৭/২০০৪ইং তারিখ হতে অনুত্তোলিত/বকেয়া থাকে তবে তিনি প্রাপ্যতা মোতাবেক সেই অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। উপরে বর্ণিত স্মারক এবং অর্থ বিভাগের ০১/০২/২০১৬ইং তারিখের প্রজ্ঞাপনটি হুবহু এখানে মুদ্রিত করে দেয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি- শাখা
www.nof.gov.bd

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-৭২

১১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
তারিখ :----------
২৭.০৩.১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বিষয় : ১০০% পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ।

সূত্র : ১। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পত্র নং

৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪৭.০০১.২০১৪-৩৮৬, তারিখ : ১৫/০৬/২০১৬ খ্রিঃ

২। অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপণ নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮ তারিখ : ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ। উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ১০০% পেনশন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

সমর্পণকারীগণ ১০০% পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হতেন উক্ত পরিমাণ অর্থ বছরে ২ বার উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য। এছাড়া ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ সাধারণ পেনশনারদের ন্যায় মাসিক চিকিৎসা ভাতাও প্রাপ্য। প্রচলিত বিধান মতে পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যবর্গ উক্তরূপ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এমতাবস্থায়, ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের ০১/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে অনুত্তোলিত/ বকেয়া উৎসব ভাতা প্রাপ্যতা সম্পর্কে ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত অর্থ। বিভাগের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১৩.১৩-০৮ সংখ্যাক প্রজ্ঞাপন অনুসরণীয়।

স্বাক্ষর
(মো. সিরাজুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪০১৮১

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১
www.mof.gov.bd

০৯.০১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৫.১৬-০৬ তারিখ :---------------
২৬.০৯.১৪২৩ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

সরকার পেনশনারগণের (বেসামরিক/সামরিক) আর্থিক এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চত করার স্বার্থে নিম্নরূপ বিধান প্রবর্তন করিল :

(ক) সরকারি কর্মচারীগণের (বেসামরিক/সামরিক) গ্রস পেনশনের শতকরা ১০০ ভাগ সমর্পণের সুবিধা বাতিল করিয়া শতকরা ৫০ ভাগ বাধ্যতা মূলক সমর্পণ এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগের জন্য নির্ধারিত হারে মাসিক পেনশন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করা হইল। এই বিধান ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। ব্যাখ্যা : ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বা তাহার পর যাহাদের অবসরউত্তর ছুটি শেষ হইবে তাহারা এই সুবিধার আওতায় আসিবেন।

(খ) পেনশনারগণ/পারিবারিক পেনশনারগণ মাসিক পেনশনের উপর ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য হইবেন যাহা ০১লা জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশনের মঞ্জুরী ও পরিশাধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ বিষয়ক স্মারক নংঅম/অবি/বিধি/পেনশন/৩ -পি-২৬/৯৪/১৭, তারিখ : ০১/০৬/১৯৯৪ খ্রিঃ এর পেনশন সমর্পণ সংক্রান্ত ২.১৩ নং অনুচ্ছেদটি ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৪/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেও শতভাগ পেনশন কমুটেশন সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রম/ডি/-১৯/১পেন-৩/৯৭/অংশ-২/৩০৫ নং স্মারকটি এই প্রজ্ঞাপনের আলোকে সংশোধন করিবে।

রাষ্ট্রপতি আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(মো. মনির উদ্দিন)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : ৯৫৭৬৫৫৪

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।
প্রবিধি অনুবিভাগ।
প্রবিধি শাখা-৩ অধিশাখা।
www.mof.gov.bd

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩,৪৪,০৬৬.১৬-৪০

০৬.০১.১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ : ----------
১৯.০৪.২০১৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

সরকার জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ এর আওতাভুক্ত সকল সামরিক/বেসামরিক মাসিক নীট পেনশন গ্রহণকারী ও আজীবন পারিবারিক পেনশন ভোগকারীগণের ন্যায় ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীগণের জন্য "বাংলা নববর্ষ ভাতা" প্রবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নরূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

(১) ১০০% পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীগণ পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ নীট পেনশন প্রাপ্ত হতেন তাঁর ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রাপ্য হবেন; এবং

(২) ১৪২৪ বঙ্গাব্দ থেকে তারা এ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৪৪৮৭
ই-মেইল : gmostofa@finance.gov.bd

অবসর জীবন ম্যাগাজিনে লেখার নীতিমালা

লেখার বিষয়ে সমিতির বৈশিষ্ট্য এবং মূল লক্ষ্য থেকে যাতে আমরা বিচ্যুত না হই সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হতে হবে প্রবীণদের অর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পারিবারিক, পরিবহন, মানসিক সমস্যা ভিত্তিক। ২। কোন রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা বর্জন বাঞ্চনীয়।

৩। চাকুরী জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা, অনুজদের প্রতি উপদেশ, সামাজিক ব্যধি, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা উৎসাহিত করা হবে।

৪। দেশ-বিদেশে প্রবীণদের অবস্থান, মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা, নিজ নিজ কর্মজীবনে বিশেষ বিষয়ে গবেষণামূলক লেখা, মানবিক মূল্যবোধের, পরিবেশ উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক লেখাও গ্রহণীয়।

৫। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের সার্বজনীন চেতনা সংক্রান্ত লেখা বিবেচনা যোগ্যে হবে।

৬। লেখার অধিক্ষেত্র হবে নিম্নরূপ :

(১) প্রবন্ধ/নিবন্ধ
(২) গল্প/ছোট গল্প
(৩) রম্যরচনা
(৪) ভ্রমণ
(৫) স্মৃতিচারণ
(৬) কবিতা

বর্ণিত অধিক্ষেত্রসমূহে উপরের নিয়মাবলী যাতে প্রতিপালিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭। কেন্দ্রীয়, জেলা সমিতির সদস্য/সদস্যা এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা প্রেরণ করতে পারবেন। সমিতির চিকিৎসকগণ ইচ্ছা করলে প্রবীণদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা দিতে পারবেন। সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মান সম্পন্ন লেখা ছাপানো যেতে পারে। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কীয় লেখা জাতীয় পর্যায়ের প্রখ্যাত লেখকদের নিকট হতেও সংগ্রহ করা যাবে। কেবলমাত্র মানসম্পন্ন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা, কবিতা, রম্যরচনা ইত্যাদি লেখা প্রকাশের জন্য সংশিষ্ট প্রকাশনা উপকমিটি কর্তৃক বিবেচিত হবে। যে কোন রচনা নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র কম্পিউটার কম্পোজে, টাইপকৃত লেখার পান্ডুলিপি গ্রহনযোগ্য হবে। যে কোন গদ্য লেখা অন্তত: ২ পৃষ্ঠা এবং অনধিক ৫ পৃষ্ঠা এবং কবিতার পরিসর মোটামুটি ১/২ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয়। কম্পিউটার প্রিন্ট করার পর লেখক/লেখিকাগণ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিবেন। ভূল বা আপত্তিকর লেখা ছাপানো হবে না।

৮। লেখার সংগে লেখক তাঁর একটি পাসপার্টে সাইজের ছবি প্রেরণ করবেন। ছবির পেছনে লেখকের নাম ও সদস্য নম্বর উলেখ করতে হবে। লেখা কি প্রকৃতির (অর্থাৎ প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী,

অবসর জীবন ম্যাগাজিনে লেখার নীতিমালা

কবিতা, রম্যরচনা ইত্যাদি) তা লেখক নিজে উলেখ করে দেবেন। ছবি না পাঠালে নির্বাচিত লেখা লেখকের ছবি ছাড়াই ছাপা হবে।

৯। লেখক তাঁর নামের নিচে অবসর পূর্ব পদবী ও নিজ সমিতির নাম, সদস্য নম্বর এবং নিজের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) উলেখ করতে হবে।

১০। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে লেখা ছাপানোর ব্যাপারে প্রকাশনা উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। শুধুমাত্র প্রকাশনা উপ-কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বাংলা ভাষায় রচিত লেখা ছাপা হবে। প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে মনোনীত লেখার সম্পাদনা করতে পারবেন।

১১। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখকদের সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বছরে শ্রেষ্ঠ লেখার জন্য পুরস্কারের বিধান রাখা হয়েছে। তবে পুনঃ মূদ্রিত কোন লেখার জন্য লেখক/লেখিকাগণ কোন সম্মানী প্রাপ্য হবেন না।

১২। প্রথম ষান্মাসিকে প্রকাশের জন্য লেখা ৩১ মার্চ মাসের মধ্যে এবং ২য় ষান্মাসিকের জন্য লেখা ৩১ আগষ্টের মধ্যে পাঠাতে হবে।

১৩। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না এবং নির্বাচিত না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাবে না। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, কেবলমাত্র মান সম্মত লেখাই ছাপানোর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৪। লেখার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফটোগ্রাফ, চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি সংযুক্ত করলে লেখাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

১৫। লেখায় লেখকের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব থাকা বাঞ্চনীয়। উদ্ধৃতি সমূহ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদ্ধৃতি সমূহ নির্ভূল হওয়া বাঞ্চনীয়।

১৬। অবসর জীবন আপনাদেরই পত্রিকা, তাই এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন করার ক্ষেত্রে আপনাদের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ পত্র মারফত আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অত্র নীতিমালা জারীর মাধ্যমে পূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা/নির্দেশনাবলী বাতিল বলে গণ্য হবে। সংশিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য অনুরাধে করছি।

-সম্পাদনা পরিষদ

স্বাস্থ্যবার্তা

Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity

WHO

(World Health Organization)

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে,

তবে নিজেকেও সতর্ক থাকতে হবে।

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

নতুন সংযোজিত পরীক্ষাসমূহের নির্ধারিত ফি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	সদস্য	সদস্য নন	মন্তব্য
১.	HbAic	টা. ৩০০.০০	টা. ৫০০.০০	ডায়াবেটিসের তিন মাসের গড় পরীক্ষা
২.	Urine for micro albumin	টা. ৩৫০.০০	টা. ৫০০.০০	কিডনী টেষ্ট
৩.	চোখের প্রেসার পরীক্ষা (Tonometer)	টা. ১০০.০০	টা. ২০০.০০	চোখের চাপ নির্ণয়
৪.	ENT	ফ্রি	টা. ১০০.০০	নাক, কান ও গলার চিকিৎসা
৫.	দাঁতের (X-ray) (একক দাঁত)	টা. ৭০.০০	টা. ১০০.০০	
৬.	PSA	টা. ৪০০.০০	টা. ৬০০.০০	পাষ্টেট ঝুঁকি পরীক্ষা
৭.	HBsAg/HCV	টা. ৪০০.০০	টা. ৬০০.০০	হেপাটাইসিস বি পরীক্ষা
৮.	HIV	টা. ৩০০.০০	টা. ৫০০.০০	এইডস পরীক্ষা
৯.	Serum Electrolyte	টা. ৩০০.০০	টা. ৫০০.০০	সাডিয়াম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, লিথিরাম
১০.	Ultrasonogram (4D)	টা. ৭০০.০০	টা. ১,০০০.০০	পেটের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা
১১.	Physiotherapy	টা. ১৫০.০০	টা. ৩০০.০০	জয়েন্ট, মাংশপেশী ইত্যাদির তাপ দেয়া হয়।
১২.	Echo-Cardiography	টা. ১,০০০.০০	টা. ১,৫০০.০০	হৃদরাগের চিকিৎসা
১৩.	ETT	টা. ১,০০০.০০	টা. ১,৫০০.০০	হৃদরাগের চিকিৎসা
১৪.	ECG	টা. ১০০.০০	টা. ২০০.০০	হৃদরাগের চিকিৎসা
১৫.	Micro albumin with ACR	টা. ৪১০.০০	টা. ৬৫০.০০	হৃদরাগের চিকিৎসা

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

নতুন সংযোজিত পরীক্ষাসমূহের নির্ধারিত ফি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	সদস্য	সদস্য নন
১.	T3	350/-	500/-
২.	T4	350/-	500/-
৩.	FT4	400/-	600/-
৪.	TSH	350/-	500/-
৫.	Serum igE	400/-	600/-
৬.	PSA	400/-	600/-
৭.	HBsAg	400/-	600/-

নতুন সংযোজিত পরীক্ষাসমূহের নির্ধারিত ফি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	সদস্য	সদস্য নন
১.	Echocardiography (Colour Doppler)	1000/-	1,500/-
২.	Ultrasonography (4D)	700/-	1,000/-

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

অভিজ্ঞ কনসালট্যান্ট প্যাথলজিস্ট দ্বারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্বল্পমূল্যে নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ করা হয়।

ল্যাবরেটরী টেস্টসমূহের জন্য নির্ধারিত ফি

Test Name	Member Rate	Non-Member Rate
CBC/CP (TC,D,HB,ESR)	100/-	200/-
PBF	80/-	150/-
Platelet Count	40/-	100/-
Eosin Phil Count	40/-	100/-
Malaria Parasite	40/-	100/-
Urine R/E, M/E	40/-	100/-
Blood Group Blood Sugar (FBS/ABF)	40/-	100/-
Urea	50/-	100/-
Creatinine	60/-	150/-
Uric Acid	60/-	150/-
Bilirubin	70/-	150/-
SGPT (ALT)	70/-	150/-
SGOT (AST)	70/-	150/-
Alkaline Phosphate (ALP)	70/-	150/-
Liver Function Test (LTF)	250/-	500/-
Urine Creatinine	60/-	150/-
Cholesterol	70/-	150/-
HDL	70/-	150/-
LDL	70/-	150/-
Triglycerides (TG)	70/-	150/-

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

অভিজ্ঞ কনসালট্যান্ট প্যাথলজিষ্ট দ্বারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্বল্পমূল্যে নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ করা হয়।

ল্যাবরেটরী টেস্টসমূহের জন্য নির্ধারিত ফি

Test Name	Member Rate	Non-Member Rate
Lipid Profile	250/-	500/-
Widal Test	100/-	200/-
ECG	50/-	100/-
Serum Calcium	100/-	200/-
Serum Phosphate (Ps4)	150/-	300/-
Serum Protein	150/-	300/-
Serum Albumin	150/-	300/-
Serum Globulin	150/-	300/-
AG Ratio	300/-	600/-
BUN	50/-	100/-
eGFR	200/-	400/-

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

দন্ত চিকিৎসা : বর্তমান হার

ক্রমিক নং	আইটেম	সমিতির সদস্যদের জন্য	অন্যদের জন্য
১.	আউটডারে টিকেট	ফ্রি	টা. ১০০/
২.	দাঁত উঠানো	টা. ১৫০/- প্রতি দাঁত	টা. ২৫০/- প্রতি দাঁত
৩.	দাঁত উঠানো- মাল্টিপল	টা. ২০০/- প্রতি দাঁত	টা. ৩০০/- প্রতি দাঁত
৪.	অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে দাঁত উঠানো	টা. ৩০০/- প্রতি দাঁত	টা. ৫০০/- প্রতি দাঁত
৫.	আল্ট্রাসানিক স্কেলিং	টা. ২৫০/- প্রতি সিটিং	টা. ৫০০/- প্রতি সিটিং
৬.	পলিশিং	টা. ১৫০/- প্রতি সিটিং	টা. ২৫০/- প্রতি সিটিং
৭.	পেরিওডেন্টাল এবং ড্রাই-সকেট ড্রেসিং	টা. ১০০/- প্রতি দাঁত	টা. ১৫০/- প্রতি দাঁত
৮.	অস্থায়ী ফিলিং	টা. ১০০/- প্রতি দাঁত	টা. ১৫০/- প্রতি দাঁত
৯.	স্থায়ী ফিলিং	টা, ২০০/- প্রতি দাঁত	টা. ৩০০/- প্রতি দাঁত
১০.	রুট ক্যানাল চিকিৎসা-একক রুট	টা. ৫০০/- প্রতি দাঁত	টা. ১,০০০/- প্রতি দাঁত
১১.	রুট ক্যানাল মাল্টিপল রুট	টা. ৮০০/- প্রতি দাঁত	টা. ১,৫০০/- প্রতি দাঁত
১২.	লাইট কিউর ফিলিং	টা. ৩০০/- প্রতি দাঁত	টা. ৫০০/- প্রতি দাঁত টা.
১৩.	জি. আই ফিলিং	টা. ২৫০/- প্রতি দাঁত	টা. ৪০০/- প্রতি দাঁত

অবসর ভবন

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল

চক্ষু বিভাগে রোগী দেখার নির্ধারিত ফি

ক্রমিক নং	আইটেম	সমিতির সদস্যদের জন্য	অন্যদের জন্য
১.	আউটডারে	ফ্রি	টা. ১০০/-
২.	অটোরিফ্রাকটোমিটার	ফ্রি	টা. ৫০/-
৩.	চোখের প্রেসার পরীক্ষা	টা, ১০০/-	টা. ২০০/-

হোমিও

ক্রমিক নং	আইটেম	সমিতির সদস্যদের জন্য	অন্যদের জন্য
১.	আউটডারে	টা. ৫০/-	টা. ১০০/-

রোগী দেখার সময় সূচী

ক) সকাল ৮টা-দুপুর ১২টা : কেবল মাত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের জন্য নির্ধারিত। তবে এই সময় কোন সদস্য উপস্থিত না থাকলে বহিরাগত রোগী দেখা যাবে।

খ) দুপুর ১২টা-অপরাহ্ন ২টা : সমিতির সদস্যগণ অগ্রাধিকার পাবেন ও অন্যদের জন্য সিরিয়াল অনুযায়ী হবে।

চিকিৎসকের নাম ও রোগী দেখার সময়-সূচী (ছুটির দিন ব্যতীত)

ক্র. নং	চিকিৎসকের নাম	চিকিৎসার বিষয়	সময়
১.	**ডা. ফাইজুর রহমান** এমবিবিএস, পিজিটি মেডিসিন, ডি টি এম আর সি পি এস (আয়ারল্যান্ড) এফআর এস এইচ (লন্ডন) মোবাইল : ০১৭১২-০০৮ ৩০৮	মেডিসিন/ সাধারণ চিকিৎসা	৮.০০-২.৩০ মি
২.	**ডা. মো. নাফিসুর রহমান** এমবিবিএস (ঢাকা),ডি কার্ড (ডি ইউ) সি:কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজিস্ট (বাতজ্বর, মেডিসিন ও হৃদরাগে বিশেষজ্ঞ) মোবাইল : ০১৮১৯-৪৩৪ ৯৩৯	হৃদরাগে/ সাধারণ চিকিৎসা (ই.সি. জি সহ)	৮.০০-২.৩০ মি.
৩.	**ডা. মো. নূরুল হুদা** এমবিবিএস, ডি. ও (ঢাকা), চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন মোবাইল : ০১৭১৬-০৮৯ ৮৯৭	চক্ষু বিভাগ।	৮.০০-২.৩০ মি.
৪.	**ডা. মুহাম্মদ কামরুল হাসান** এমবিবিএস, এফসিপিএস (ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিটেশন) বাত-ব্যাথা, প্যারালাইসিস ও স্পোর্টস ইঞ্জুরী বিশেষজ্ঞ এক্স. সহঃ অধ্যাপক, সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ, গুলশান, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮১৬-৩২০৭৩৯	ফিজিক্যাল মেডিসিন	৮.০০-২.৩০ মি.
৫.	**ডা. মেজর মোহাম্মদ হুমায়ুন (অব.)** এমবিবিএস, এমসিপিএস (ক্লিনি-প্যাথ লজিষ্ট) এফসিপিএস (হেমাটলজি) মোবাইল : ০১৯১২-৪৫৬ ৭১৫	প্যাথলজি	১২.৩০-২.৩০ মি.

ক্র. নং	চিকিৎসকের নাম	চিকিৎসার বিষয়	সময়
৬.	**ডা. সুফিয়া খানম** এমবিবিএস, ডিএমইউ (ডি.ইউ) ফ্যামিলি মেডিসিন স্পেশালিষ্ট এফসিজিপি, এমপিএইচ জুনিয়র কনসালটেন্ট মোবাইল : ০১৭১৫-০০৫ ১৯৫	গাইনী ও সাধারণ চিকিৎসা	৮.০০-২.৩০ মি.
৭.	**ডা. ইমাম কৌনাইন ফেরদৌসী** এমবিবিএস, এফসিজিপি, সিসিডি মোবাইল : ০১৭৫৭-০৮২ ৩৭১	ডায়াবেটলজি	৮.০০-২.৩০ মি.
৮.	**ডা. রাশেদুল হাসান** এমবিবিএস, এমএসসি, (থিসিস) মোবাইল : ০১৭১৪-০৯৬ ৬২৮	নাক, কান ও গলা	৮.০০-২.৩০ মি.
৯.	**ডা. মো. সেলিম ইফতিখার** বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল) পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সি.), পিজিটি (অর্থোডন্টিকস)। মোবাইল : ০১৯৭৪-৫৫৬ ৯৫৭, ০১৬৭৪-৫৫৬ ৯৫৭	দন্ত বিভাগ	৮.০০-২.৩০ মি.
১০.	**ডা. শাহিন আরা পারভীন** বিএসসি, বিএড, বি.এইচ.এম এইচ মোবাইল : ০১৮১৭-৫৫০ ৬৯৩	হোমিওপ্যাথি	১০.০০-১.০০ মি.

স্বাস্থ্য কথা

শরীরকে সুস্থ রাখুন ঃ আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে

- দৈনিক কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটুন। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাঁটার কোন বিকল্প নাই। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিমিত খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত হাঁটা সব চেয়ে বড় মহৌষধ।
- খাদ্য তালিকা থেকে অধিক কোলেষ্টরাল যুক্ত খাবার বাদ দিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমান।
- হাড়ের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার গ্রহণ করুন।
- অধিক পরিমাণে তাজা ফলমূল এবং আঁশজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করুন। শাকসবজী বেশী খাবেন।
- উচ্চ রক্তচাপ শুধু হার্ট অ্যাটাক বা ষ্ট্রোক এর ঝুঁকি বাড়ায় না, উচ্চ রক্তচাপ কিডনীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সুতরাং নিয়মিত রক্তচাপ মাপুন এবং সতর্ক থাকুন। লবন ও চর্বিযুক্ত খাবার কম খাবেন। শরীরের ওজন ঠিক রাখার চেষ্টা করুন।
- ধুমপান বর্জন করুন, ধুমপান কিডনীতে রক্তপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায়। কিডনীতে রক্ত প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটলে কিডনীর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তাছাড়া ধুমপান কিডনীতে ক্যানসার হবার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। ধুমপান লিভারের জন্যও ক্ষতিকর।
- নিজেকে কর্মতৎপর রাখুন। কর্মতৎপরতা রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে, ফলে কিডনী রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। "On the move for kidney Health" কিডনী সুস্থতার জন্য নিজেকে সচল রাখুন- বিশ্বব্যাপি এ ধারণাকে অনুসরণ করুন।
- পরিমাণমত বিশুদ্ধ পানি পান করুন। নিয়মিত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুন।
- বিনোদনমূলক কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রফুল্ল রাখুন।
- আত্মার প্রশান্তির জন্য ধর্মীয় নির্দেশগুলো নিয়মিত পালন করুন এবং নিজেকে পবিত্র রাখুন। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

সংগ্রহ ও সংকলনঃ
মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর
মহাসচিব